দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি
ছয়দফা আন্দোলন

কামরুন নাহার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি
ছয়দফা আন্দোলন
কামরুন নাহার

978-984-35-3240-4

978-984-35-3240-4

দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি
ছয়দফা আন্দোলন

কামরুন নাহার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি : ছয়দফা আন্দোলন

প্রকাশক	:	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রথম প্রকাশ	:	জানুয়ারি ২০২৩
প্রচ্ছদ	:	সোহেল আশরাফ খান
কম্পিউটার বিন্যাস	:	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
তথ্য সংগ্রহ	:	ফারুক হোসেন জাকিয়া জাহান মুক্তা মো. রিফাত ইসলাম
কম্পিউটার কম্পোজ	:	মো. ফরিদুল আলম গোলাম সরোয়ার কামাল
বানান সমন্বয়	:	মো. তফাজ্জল হোসেন
মুদ্রণ	:	তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
গ্রন্থস্বত্ব	:	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	:	৫৫০.০০ টাকা

DAINIK ITTEFAQ O SAMOKALEEN RAJNITI : CHHAY DAFHA ANDOLAN
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 550.00 Taka ■ $ 06 Only
ISBN : 978-984-35-3240-4
Phone: 9361424, 9330081-84, Fax: 880-02-48317458
E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা, http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি
ছয়দফা আন্দোলন

গবেষক

কামরুন নাহার
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গবেষণা বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসে এক কিংবদন্তি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্তরণের অভিযাত্রায় তিনি একক নেতৃত্ব দিয়েছেন। ছয়দফা আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা ঘোষণা করেন। বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয়দফা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যবোধের বহিঃপ্রকাশে ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের গতি রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই মামলার বিরুদ্ধে বাঙালির গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। বাঙালির এই গণজাগরণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে। এর ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক ঘটনা সংবাদপত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) 'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি: ছয়দফা আন্দোলন' শীর্ষক এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করেছে।

এই গবেষণাকর্মের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ গুরুত্বের সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রধানত বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বেশিরভাগ প্রতিবেদনেই বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা থেকে শুরু করে ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন ও জনসম্পৃক্ততা তৈরির ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাক জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দৈনিক ইত্তেফাকের জনপ্রিয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়ায় আইয়ুব সরকারের রোষানলে পড়ে দৈনিক ইত্তেফাক। শেষ পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এই গবেষণাকর্মের প্রাপ্ত তথ্যের দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে আমরা দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষা ও বানান অবিকল রেখেছি। বাক্যগঠন কিংবা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি, হুবহু রাখা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পিআইবি'র গবেষক কামরুন নাহারকে। নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গবেষণাকর্মে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হককে। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সবার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই গবেষণাকর্মটি গণমাধ্যম গবেষক, পিআইবির গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সবার কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

গবেষণা বিশেষজ্ঞের কথা

বাংলাদেশের মহান রাজনীতিক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক গর্বিত নাম। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু নাম দুটি আধার ও আধেয়স্বরূপ। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে ছয়দফা আন্দোলন খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্ববহ ঘটনা। সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনেও তেমনি। ছয়দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাই ছয়দফা আন্দোলন নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু যে সময় ছয়দফা কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু করেন তখন এই প্রদেশের অনেক নেতাই স্বায়ত্তশাসন ও সংসদীয় গণতন্ত্র দাবি করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কৃতিত্ব হচ্ছে যে, তিনি এসব দাবিকে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে তা আদায়ের জন্য জনমত তৈরি ও গণআন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের এই উত্তাল সময়ের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক। বাংলাদেশ জন্মের বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই ইত্তেফাক পত্রিকাটি তার বুকের ভেতরে জমা করে রেখেছে নানাবিধ ইতিহাসমালা। বাঙালির জাতির মুক্তির অন্যতম সময় সোপান ছয়দফার নানা ঘটনা তৎকালীন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল। ছয়দফাকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাংলাদেশে এর মাহাত্ম ও তাৎপর্য তুলে ধরেছিলেন। সেই সময়ের নানা খবরাদি ইত্তেফাক পত্রিকা অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রকাশ করেছিলেন। ছয়দফা সংক্রান্ত সেইসব ঘটনাবলী এই গবেষণায় তুলে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। যদিও তা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য।

একজন গবেষক গবেষণাকে সর্বদাই নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকেন। এই গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গবেষক তাঁর কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তবুও তা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়েছে এমন দাবি করা যাবে না।

'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি : ছয়দফা আন্দোলন' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

(পিআইবি) এর মহাপরিচালক জনাব জাফর ওয়াজেদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একইসঙ্গে এই গবেষণাকর্মের গবেষক কামরুন নাহারকেও ধন্যবাদ জানাই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য।

আশাকরি, এই গ্রন্থটি গবেষক ও আগ্রহী পাঠকদের অনুকূল্য পাবে। তাঁরা এই গ্রন্থের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

ড. শেখ আবদুস সালাম
উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	⬇
দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	⬇
প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	২৭
তৃতীয় অধ্যায়	⬇
গবেষণা পদ্ধতি	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়	⬇
তথ্য উপস্থাপন [রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি]	৪১
পঞ্চম অধ্যায়	⬇
গবেষণা প্রশ্ন যাচাই	৩৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	⬇
তথ্য বিশ্লেষণ ও উপসংহার	৩৪৩

প্রথম অধ্যায়

দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি

দৈনিক ইত্তেফাক বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন দৈনিক। পূর্ব-বাংলার স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের মাঝে যাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্নবীজ বপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া অন্যতম। আর তাই বাঙালি জাতিসত্তার স্ফুরণে দৈনিক ইত্তেফাক ও এর সম্পাদক মানিক মিয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ইত্তেফাকের প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট ইয়ার মোহাম্মদ খানকে প্রকাশক এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে সাপ্তাহিক আকারে ইত্তেফাকের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু নেপথ্যে পত্রিকাটির প্রধান কর্মী ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তখন এর লোগোর নিচে লেখা থাকত 'প্রতিষ্ঠাতা: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে চুয়ান্নর 'ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেচারের' নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্ট গঠনের তাগিদ থেকে ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক ইত্তেফাককে দৈনিকে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী '৫৩-এর ২৪ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে আত্মপ্রকাশ করে ইত্তেফাক। এ সময় দৈনিকটি আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদনার দায়িত্ব প্রসঙ্গে সাংবাদিক সোহরাব হোসেন লিখেছেন: ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে সম্পাদক হিসেবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নাম ছাপা হয়। দৈনিক হিসেবে প্রকাশ পায় ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩। দৈনিকের প্রথম সম্পাদকও ছিলেন তিনি। (হাসান : ২০০০ : ৯)। তবে ড. সুব্রত শংকর ধর তাঁর 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র' বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছেন: ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম প্রকাশ। (ধর : ১৯৮৫ : ৫৪)।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাটি একদিকে যেমন বাঙালির আত্মজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছে, তেমনি এর সাহসী ও দূরদর্শী সম্পাদক হিসেবে মানিক মিয়া কারাবরণ ও প্রকাশনা বন্ধ-বাজেয়াপ্তসহ রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপত্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন।

সাংবাদিক মাহফুজ আনাম ডেইলি স্টার এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে

উদ্ধৃত করে লিখেছেন: 'চার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব, শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া 'ইত্তেফাকের আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করেছেন, যার ওপর ভিত্তি করে প্রকাশনা শুরুর প্রথম দিন থেকে পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত থেকেছে'। (আনাম : ২০২১ : দ্য ডেইলি স্টার)।

সমসাময়িক রাজনীতি ও দৈনিক ইত্তেফাক

আত্মপ্রকাশের পর থেকেই গণমানুষের মুখপত্ররূপে ইত্তেফাক সমকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অভিঘাত তৈরি হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে। ওই আন্দোলনে ভাষাশহিদদের স্মরণে ১৯৫৩ সালের প্রথম শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের খবর প্রকাশ, ১৯৫৪ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নতুন রাজনৈতিক শক্তি যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ইত্তেফাক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার দীর্ঘ অভিঘাত ও সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক। ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'মোসাফির' ও 'রাজনৈতিক মঞ্চ' শিরোনামে প্রকাশিত তাঁর নিয়মিত কলাম ছিল গণমুখী। জনসাধারণের ভাষায় লেখা 'মোসাফির' কলামটি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং নবগঠিত দৈনিক হিসেবে ইত্তেফাক জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি ধাপে বাঙালির রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় এবং মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ে সমগ্র পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক শক্তির যে উত্থান সূচিত হয় তাতে ইত্তেফাক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। (আহমেদ : ২০১৬ : ৬)।

বিভিন্ন গণআন্দোলনে ইত্তেফাকের বলিষ্ঠ ভূমিকা সম্পর্কে 'পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সংবাদপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে সাংবাদিক সোহরাব হাসান লিখেছেন, 'ইত্তেফাক যখন দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয় তখন পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরই দলটি বৃহত্তর জনগণের সমর্থন হারায়। মুসলিম লীগবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে ইত্তেফাক সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি জোরালো অবস্থান নেয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের

বিজয়েও ইত্তেফাক বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৯২/ক ধারা জারি এবং শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার প্রতিবাদে ইত্তেফাক সম্পাদকীয় কলামে লিখেছিল, 'অদ্যকার সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হইল না। ষাটের দশকে আইয়ুবের মার্শাল ল এবং তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রবাদী সংবিধানের বিরুদ্ধেও ইত্তেফাক কঠোর অবস্থান নেয়'। (প্রাগুক্ত, হাসান : ২০০০ : ৯)।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয় এবং শাসনতন্ত্রবিরোধী অবস্থান নেয় দৈনিক ইত্তেফাক। এ প্রসঙ্গে ড. সুব্রত শংকর ধর লিখেছেন, '১৯৫৬ সালে প্রণীত হয় পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে এক তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। একযোগে এই শাসনতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে সংবাদ ও ইত্তেফাক। খসড়া শাসনতন্ত্রকে ব্যাপক সমর্থন জানায় 'পাকিস্তান অবজারভার'। কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে 'ইত্তেফাক'। ৬ জানুয়ারি ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় মাঝামাঝি স্থানে বক্স করে ছাপা হয় এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিবাদ সভার বিজ্ঞপ্তি। এছাড়াও প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে প্রতিদিন প্রচুর সংবাদ ছাপা হতো ইত্তেফাকে। ৭ জানুয়ারি পত্রিকাটির প্রথম পাতার প্রথম দু'কলামে একটি নিবন্ধ ছাপা হলো, 'শাসনতন্ত্র ও আমরা কি চাই'। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজস্ব আয়, চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয় বিশদভাবে। এছাড়াও ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের 'মার্শাল ল'-র বিপক্ষে লেখনী ধারণ, ১৯৬২ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুববিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে দৈনিক ইত্তেফাক জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'। (প্রাগুক্ত, ধর : ১৯৮৫ : ৬০)।

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ভয়াবহ দাঙ্গার সময় দৈনিক ইত্তেফাক প্রগতিশীল রাজনীতিক ও জনতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে ড. মো. এমরান জাহান তাঁর 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র' গ্রন্থে লিখেছেন এ সময় দৈনিক ইত্তেফাক দাঙ্গা প্ররোচনায় সরকারের ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচন করে দাঙ্গার বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখি শুরু করে। ১৪ জানুয়ারি পত্রিকাটি এক সংবাদ ভাষ্যে জনগণের নিকট আবেদন জানিয়ে লিখে: 'সীমানাপারের ঘটনা নামে দেশ, জাতি ও মানবতার চির দুশমন এবং সভ্যতার সমাজদ্রোহীরা নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকা ও ঢাকায় যেভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধের জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি'। ১৫ জানুয়ারি ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় কলামে

সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প থেকে জানমাল রক্ষার আবেদন জানিয়ে বলা হয়: 'সীমান্তের অপর পারে যাহাই ঘটুক, আমাদের স্বদেশভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও আত্মঘাতী রক্তপাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এদেশের কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমরা পুনরায় আকুল আবেদন জানাইতেছি' (জাহান : ২০০৮ : ১৫৩)।

দাঙ্গা প্রতিরোধে দৈনিক ইত্তেফাক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করায় দাঙ্গাবাজ দুষ্কৃতকারীরা পত্রিকাটির ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে ড. এমরান জাহান লিখেছেন, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা প্রতিরোধে দৈনিক ইত্তেফাক এবং এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এবং সরকারের পোষ্য দুষ্কৃতকারীদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ১৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক যে আবেদনপত্রটি প্রকাশিত হয়, তাতে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কোনো নাম-ঠিকানা উল্লেখ ছিল না। আবেদনপত্রটির নিচে শুধু 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' লেখা ছিল। উদ্যোক্তাগণ সম্ভবত সরকারের নির্যাতনের ভয়েই নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেনি। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ১৯৬০ সালের প্রেস-অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের ২ ধারায় 'গ' উপধারার ৫০, ৫২ (১) (২) ধারা বলে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীসহ বহু নেতার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করে। মামলাটির কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালিত ছিল বিধায় পত্র-পত্রিকায় 'প্রচারপত্র মামলা' নামে তা ব্যাপক প্রচার ও খ্যাতি লাভ করে। সংবাদপত্রের ওপর দমনপীড়ন এখানেই থেমে থাকেনি। দৈনিক ইত্তেফাকের ১৭ জানুয়ারি (১৯৬৪) সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় 'দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভীষিকা অব্যাহত। মুসলিম দরদীদের আক্রমণে তৃতীয় দিনেও বহু মুসলমান হতাহত।' 'পশুশক্তি রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য সাধারণ নাগরিকদের দৃঢ়মনোভাব' শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদন এবং একই তারিখে পত্রিকাটি 'প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলুন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। উক্ত সংবাদ ভাষ্য এবং সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে ২৮ মার্চ প্রাদেশিক সরকার পূর্বোক্ত অর্ডিন্যান্স বলে সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের নিকট ২৫ হাজার টাকা জামানত তলব করেন। এরূপ সরকারি দমনপীড়ন এবং রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংবাদপত্রগুলো ভয়াবহ দাঙ্গা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলাবাহুল্য সংবাদপত্রের এই তাৎক্ষণিক বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই দাঙ্গাবিরোধী প্রবল জনমত গড়ে ওঠে এবং দাঙ্গার লেলিহান শিখা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারেনি (প্রাগুক্ত, জাহান : ২০০৮ : ১৫৪-১৫৫)।

১৯৬৬ সালে ছয়দফা দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে জোরালো সমর্থন জানায় দৈনিক ইত্তেফাক। ছয়দফার ইতিবাচক ব্যাখ্যা ও খবর প্রচার করে দৈনিক ইত্তেফাক ছয়দফার মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র' গ্রন্থে ড. সুব্রত শংকর ধর লিখেছেন, ২৬ এপ্রিল, ১৯৬৬-তে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে 'মুসাফির' (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) লিখলেন: জনতার কাফেলা চলিবেই। '... আজ দেশবাসী এমন নেতৃত্ব চায় যারা নির্যাতন ও হয়রানিতে হতোদ্যম হইবেন না এবং জনতার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আগাইয়া নিতে পিছপাও হইবেন না। বরং জনদাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেল জুলুম নির্যাতন হয়রানিকে দেশ সেবার সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।' এ সময় ছয়দফা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে একাধিক বার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লেখার কারণে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হন। ১৬ জুন নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ থাকে। একই বছর ২৭ জুলাই পুনরায় এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৬৭ সালের মার্চে অসুস্থতার কারণে মানিক মিয়াকে মুক্তি দেয়া হয় বটে, কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত ইত্তেফাককে আর প্রকাশিত হতে দেয়া হয়নি। (প্রাগুক্ত, ধর : ১৯৮৫ : ৮২-৮৪)।

১৯৫৩ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়টিতে অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সেসবের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলোর তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। এসব ঘটনার মধ্যে ছিল: ১৯৫৩ সালে প্রথম শহীদ দিবস উদ্‌যাপন, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন (যুক্তফ্রন্ট), পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, পূর্ব বাংলায় ৯২ (ক) ধারা জারি: সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৫৭ সালের কাগমারি সম্মেলন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি, ১৯৬১ সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ১৯৬২ সালে ছাত্র (শিক্ষা) আন্দোলন, ১৯৬৩ সালে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অধ্যাদেশ জারি, ১৯৬৪ সালে দাঙ্গা প্রতিরোধ কর্মসূচী, ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণা ও আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন প্রভৃতি। ধারণা করা হয় জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দৈনিক ইত্তেফাক এসব ঘটনাকে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি (perspective)-তে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও দৈনিক ইত্তেফাক

ইত্তেফাক ও সমসাময়িক রাজনীতির সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরি করেছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। গণমুখী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ মানিক মিয়া এদেশের সাংবাদিকতার জগতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। তিনি ছিলেন একজন অকুতোভয়, নির্মোহ, আপসহীন সাংবাদিক।

বরিশালের পিরোজপুর মহকুমার ভাণ্ডারিয়ায় ১৯১১ সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জন্ম। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি. এ পাস করে তিনি পিরোজপুর সিভিল কোর্টে একটি কেরানীর চাকরিতে ঢোকেন। ওই চাকরি করার সময়েই তাঁর সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরিচয় হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তফাজ্জল হোসেনকে জেলার জনসংযোগ অফিসারের চাকরি নিতে অনুরোধ করেন। সরকারি চাকরিতে তফাজ্জল হোসেন বেশি দিন আটকে থাকেননি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশে ১৯৪৫ সালে সরকারী চাকরি ছেড়ে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সম্পাদক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। (হালদার : ২০০৫ : ৪৮)।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানিক মিয়া গণমানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমৃত্যু নিরলসভাবে সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক মানিক ভাই' শিরোনামে এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, মানিক ভাইয়ের কর্মময় জীবনের পরিধি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর সঙ্গে আমার পঁচিশ বছরের পরিচয়ের ইতিহাস এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, আলোড়ন-আন্দোলন, অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মানিক ভাইয়ের আসন দর্শকের গ্যালারিতে ছিল না। দূরত্ব বজায় রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক বলে তিনি আরাম-আয়েশ করেননি; বিপদসংকুল দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন। নিজ জীবনের ঝুঁকি এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের মারগুলো মাথায় পেতে নিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ত্যাগব্রতী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিমূর্ত দেশপ্রেমিকতা, স্বাদেশিকতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। গণশক্তির ওপর ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। নিয়মতান্ত্রিক গণ-অভ্যুত্থানকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবনে খালেদুন ও রুশোর প্রকৃতিপ্রদত্ত মানব স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের জাগ্রত চিন্তাবাহী, লিংকনের "Government of the people, by the people, and for the people"- এর পূজারী, প্রকৃতিপ্রদত্ত

বৈচিত্র্য মেনে নিয়ে "সব মানুষ সমান" এই তত্ত্ববাদে বিশ্বাসী। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। একান্ত কঠিন ও নিতান্ত অনমনীয়। পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় অটল। কায়েমি স্বার্থের নিক্ষিপ্ত শরগুলো তাঁর বক্ষে এসে ভেঙে ভেঙে পড়েছে। 'ইত্তেফাক' বারবার বন্ধ হয়ে গেছে। মানিক ভাই টলেননি। রোগাক্রান্ত হয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছেন। তবু আপস করেননি (শেখ মুজিবুর রহমান : ২০১৩ : ১১-১২)।

ইত্তেফাক এবং মানিক মিয়াকে নিয়ে সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন তাঁর 'নাম নয় ইতিহাস' শিরোনামে এক লেখায় উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া শুধু একটি নাম নয়, ইতিহাস। শুধু একজন ব্যক্তিরূপে তাঁর পরিচয় নয়। একটি সংগঠনের মতই বিরাট ও ব্যাপক ছিল তাঁর ভূমিকা। রাজনীতিক-সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিরল সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাফল্যের মাপকাঠিও ব্যক্তিগত লাভালাভ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সাফল্যই হচ্ছে তাঁর সাফল্যের পরিমাপ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ একটানা সংগ্রামের অধ্যায়ে তাঁর 'ইত্তেফাক' নির্যাতিত মানুষের কাছে আশা-ভরসার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, 'ইত্তেফাক' নামটি পেয়েছিল স্লোগানের ব্যঞ্জনা। বাংলাদেশের রাজনীতি নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের দিকে পথ করে নিয়েছে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন কখনও উত্তাল হয়ে উঠেছে, কখনও তীব্র দমননীতির মুখে স্তিমিত হয়েছে। কিন্তু কখনও মরে যায়নি। সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলোতে 'ইত্তেফাক' যেমন মানুষের পাশে থেকেছে, তেমনি হতাশার দিনগুলোতে ইত্তেফাক দিয়েছে আশা-ভরসা। বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের আত্মবিশ্বাস। মরহুম মানিক মিয়া ইত্তেফাক পত্রিকাটিকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, অনমনীয় মনোভাব, সর্বোপরি বাঙালির মুক্তির জন্য তার সার্বক্ষণিক লড়াই ইত্তেফাক পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে' (হুমায়ুন : ২০০৫ : ২৬)

মানিক মিয়া সম্পর্কে ড. কামরুল হক বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) 'ফিরে দেখা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে গ্রন্থনাকালে লিখেন, ১৯৪৬ সালে হঠাৎ করেই রাজনীতির আঙ্গিনা থেকে সাংবাদিকতার ভুবনে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয় মানিক মিয়ার। ওই বছর কলকাতা থেকে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সংবাদপত্রের নাম: 'দৈনিক ইত্তেহাদ'। এটি ছিল একটি বাংলা দৈনিক। দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক নিয়োগ করা হয় আবুল মনসুর আহমদকে। মানিক মিয়াকে এই সংবাদপত্রের পরিচালনা বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম লীগ

অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দৈনিক ইত্তেহাদে যোগ দেন তিনি। এভাবেই তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার আগমন ঘটে সাংবাদিকতায়। (হক, ফিরে দেখা অনুষ্ঠান, বিটিভি)।

প্রথম জীবনে কলকাতায় 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকলেও অখণ্ড ভারতে তিনি সাংবাদিকতা করেননি। যদি বলা হয় যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই তাঁকে সাংবাদিকের কলম হাতে নিতে বাধ্য করেছিল, তা হলে সম্ভবত ভুল হবে না। ক্রমে তাঁর সেই কলম তরবারির চেয়েও ধারালো হয়ে উঠল। (খান : ২০১৮ : ২৩)।

দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করে জীবনব্যাপী তিনি এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) তার হাত ধরেই সাংবাদিকতা এক নতুন মোড় নিয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। সেজন্য তিনি বাংলার মানুষের কাছে 'নির্ভীক সাংবাদিক' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রজিনৈতিক বৈষম্যের কথা সহজ ভাষায় তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন আধুনিক সংবাদপত্রের রূপকার, বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। 'রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি', 'রাজনৈতিক মঞ্চ', আর 'রঙ্গমঞ্চ' শিরোনামে কলাম লিখে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতাকামী করে তোলেন মানিক মিয়া। 'মোসাফির' শিরোনামে তাঁর রাজনৈতিক মঞ্চ কলামে নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ, অনন্য রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা এবং গণমানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই বাংলার মানুষের হৃদয়ে তিনি অবিনশ্বর হয়ে রয়েছেন (সাগর: ২০২১ : ১)।

ইত্তেফাক এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে বাংলার সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. কামরুল হক লিখেন, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া দৈনিক ইত্তেফাককে শুধু মুসলিম লীগবিরোধী মতাদর্শের পত্রিকা হিসেবেই নয়, সে সময়ের পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের শোষণ-বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তোলেন। একদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হতে থাকে গণমানুষের কথা, অন্যদিকে মানিক মিয়া নিজে 'মোসাফির' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' নামে একটি কলাম লিখতে শুরু করেন। এই কলামে তিনি খুবই সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় মুসলিম লীগ

সরকারের নানা অন্যায় কাজ, শোষণ, অবিচার, অত্যাচার ও বৈষম্যর কথা তীর্যকভাবে লিখতে থাকেন। মানিক মিয়ার এই কলাম মুসলিম লীগ সরকারকে টালমাটাল করে দেয়। আর পাঠকদের কাছে তা হয়ে ওঠে একান্ত আপন। নিজেদের মনের কথাগুলো এই কলামে প্রতিফলিত হতে দেখে তারা অভিভূত হতে থাকেন। এই কলাম লিখে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পূর্ববাংলার সংবাদপত্র পাঠকের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

পূর্ববাংলায় ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মুসলিম লীগবিরোধী জোট হিসেবে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট ছিল পূর্ববাংলার মুসলিম লীগবিরোধী দলগুলোর মোর্চা। দৈনিক ইত্তেফাক যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অবস্থান নেয়। সংবাদপত্রটি এই সময় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করে মুসলিম লীগবিরোধী একটা জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

নির্বাচনে বিপুল বিজয় হয় যুক্তফ্রন্টের। আর মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তি কাজ করেছে বলে মনে করা হয়, তা হলো দৈনিক ইত্তেফাক ও এই সংবাদপত্রে 'মোসাফির' ছদ্মনামে লেখা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কালজয়ী কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানিক মিয়া তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিলেন তার প্রমাণ মেলে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে। নির্বাচনের পর সমস্ত পূর্ববাংলা আনন্দে উদ্বেলিত। বিজয় উল্লাস চলছে সর্বত্র। বিজয় উৎসবের অংশ হিসেবে 'মোসাফির'কে তাঁর অবিস্মরণীয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'-এর জন্য গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় ঢাকার রাজারবাগে। মোসাফির নামের আড়াল থেকে সেদিনই প্রথম ভক্ত পাঠকদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। সমবেত জনতা তাদের প্রিয় 'মোসাফির'কে সরাসরি দেখে অভিভূত হয়েছিল। উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছিল তারা।

মানিক মিয়া তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ'র জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিলেন আজীবন। এই কলামে তিনি অবিরত লিখে গেছেন পূর্ববাংলার মানুষকে কীভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, কীভাবে তারা শোষিত হচ্ছে। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর এই লেখাগুলো দৈনিক ইত্তেফাককে অগণিত মানুষের প্রাণের সংবাদপত্রে পরিণত করেছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের মাধ্যমে মানিক মিয়া পূর্ববাংলার মানুষের নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে উজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভাবেননি মোটেও। সাংবাদিকতাকে তিনি দেশপ্রেম ও দেশের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রথম আক্রমণ আসে ১৯৫৫ সালে। এই বছরই পূর্ববাংলায় ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আইয়ুব খান। সামরিক আইন জারি করেন তিনি। সামরিক আইন লংঘনের অভিযোগে ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। ছাড়া পাওয়ার পর অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তাঁর লেখনী। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের জুলুম-অত্যাচার বেড়েই চলে। রাজনৈতিক নেতাদের দমন করার জন্য ১৯৬২ এক গ্রেফতার অভিযান চালায়। গ্রেফতার হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও এই সময় গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকারের কাছে ছয় দফা দাবি পেশ করে। সমস্ত পূর্ববাংলায় ছয় দফার সমর্থনে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলন দমন করতে আরো হিংস্র হয়ে ওঠে আইয়ুব খানের সরকার। রাজনৈতিক নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার চলতে থাকে। এই সময় ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আবার গ্রেফতার করা হয়। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর নিউ নেশন প্রেস। যে কারণে শুধু দৈনিক ইত্তেফাকই নয়, দৈনিক ইত্তেফাকের সহযোগী প্রকাশনা 'ঢাকা টাইমস' ও 'সাপ্তাহিক পূর্বাণী'র প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রেস বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় বিজয়ী হন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। হাইকোর্টের রায়ের পর আইয়ুব সরকার এই সংক্রান্ত অধ্যাদেশ সংশোধন করে পুনরায় প্রেস বাজেয়াপ্ত করে।

কারাগারে নিক্ষেপ করে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সাময়িকভাবে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে কেন্দ্র করে তাঁর ব্রত থেকে তিনি কখনোই বিচ্যুত হননি। জেল থেকে লেখা এক চিঠিতে তার নজির পাওয়া যায়। তিনি লিখেন: 'সংবাদপত্রের মারফত দেশবাসীর যতটুকু খেদমত করা যায় তাই ছিল আমার লক্ষ্য। এই দিক দিয়া আমি ইত্তেফাককে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ বা অর্থোপার্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করি নাই। যে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই জনগণের অভাব, অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করাই ছিল আমার ব্রত।'

কারাগারে সে সময়ের প্রাদেশিক সরকার মানিক মিয়াকে মানসিক নানা যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছিল। আর মানসিক যন্ত্রণার কারণে শারীরিকভাবেও বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে ১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ মানিক মিয়া

ঢাকার পুলিশ হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান। তখনো তাঁর প্রিন্টিং প্রেসটি বাজেয়াপ্ত। তাই সংবাদপত্র প্রকাশের পথও বন্ধ। তাঁর শারীরিক অবস্থাও এ সময় ভীষণ খরাপ ছিল। প্রিন্টিং প্রেস আর সংবাদপত্র দুটোই বন্ধ থাকায় তখন জীবিকা নির্বাহও কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই সুযোগটি গ্রহণ করতে চেয়েছিল পাকিস্তান সরকার। সরকারের কট্টর সমালোচনা থেকে বিরত রাখার শর্তে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেওয়া হয় মানিক মিয়াকে। কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোনো আপস করেননি তিনি। কারণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশকে তিনি অর্থহীন মনে করতেন। তাঁর এই অবস্থানের জন্য দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা শুরু করতে আরো অপেক্ষা করতে হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা পুনরায় শুরু হয় ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশের অনুমতি দেয়। দীর্ঘ দু'বছর সাত মাস পর আবার যাত্রা শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক।

এই সময় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বেশ অসুস্থ। নানা রকম রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে। মানসিকভাবেও কিছুটা বিপর্যস্ত। তারপরও দৈনিক ইত্তেফাককে পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। সম্পাদনার কাজে মনোযোগী হন। লিখতে শুরু করেন তাঁর জনপ্রিয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'।

দৈনিক ইত্তেফাক আবার পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। দীর্ঘদিন পর দৈনিক ইত্তেফাক হাতে পেয়ে তারা আপনজনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। 'রাজনৈতিক মঞ্চ' -এর মাধ্যমে পূর্ববাংলার মানুষ আবার উজ্জীবিত হতে শুরু করে। অধিকারের চেতনা শানিত হতে থাকে (হক, 'ফিরে দেখা' শীর্ষক অনুষ্ঠান, বিটিভি)।

দৈনিক ইত্তেফাক ও ছয়দফা আন্দোলন

বাঙালি জাতির বহু ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক দৈনিক ইত্তেফাক। বাঙালির অধিকার আদায়সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল পর্যায়ে দৈনিক ইত্তেফাকের সমর্থন ও ভূমিকা ছিল অপরিমেয়। বাঙালি, বাংলাদেশ আর ইত্তেফাক তাই একসূত্রে গাঁথা। দীর্ঘ এই পথ-পরিক্রমায় ইত্তেফাক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। বলা যায়, ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইত্তেফাকের ভূমিকা এবং বাংলাদেশের রাজনীতি একাকার হয়ে জড়িয়ে রয়েছে। মহান ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভূমিকা, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, চৌষট্টির দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা, সত্তরের

নির্বাচন ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক নিরঙ্কুশ বিজয়, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি হতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ইত্তেফাক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে ভূমিকা পালন করেছে ছয়দফা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও।

ছয়দফা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক জাতীয় সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে যোগদান করেন। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের সর্বোচ্চ দাবি হিসেবে ছয়দফা দাবিকে আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই প্রস্তাব পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করার পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যোগদান না করে তাঁর প্রতিনিধি দল নিয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমান বন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে সম্মেলন বর্জন করার কারণ এবং ছয়দফা কর্মসূচির প্রধান প্রধান দিকগুলো তুলে ধরেন।

ছয়দফা দাবির মূল বিষয় ছিল পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র এবং ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা সংবলিত ছয়দফা কর্মসূচির একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

ছয়দফা দাবিসমূহ:

দফা-১ : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

দফা–২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উল্লিখিত দুটি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে;

দফা–৩ : পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে;

দফা–৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে;

দফা–৫ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব–স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক সরকার বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যে কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে;

দফা–৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধা–সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে (বাংলা পিডিয়া : খণ্ড ৪ : ২০১১ : ৪২৭)।

ছয়দফা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. রওনক জাহান বলেন, ৬ দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা বাঙালির রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। বস্তুত, ১৯৬৬ পরবর্তী বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক আন্দোলন, '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় তথা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে উৎসাহ জুগিয়েছিল ছয়দফাভিত্তিক স্পৃহা। (হোসেন, ২০১৮ : ৩২৪)।

অন্যদিকে ছয়দফা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, আমাদের বাঁচার দাবি খ্যাত ৬-দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির মহাসনদ। এটি বাঙালির জাতীয় মুক্তির 'ম্যাগনাকার্টা' নামেও অভিহিত। (রশিদ, ২০১৬ : ৩৫)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির মধ্যে ব্যাপক গণজাগরণ তৈরি করতে সক্ষম হন। এ জন্য তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান। জনসভা-পথসভার মাধ্যমে ছয়দফার মর্মবাণী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। ছয়দফার পক্ষে গণজাগরণ ঠেকাতে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক দিশেহারা হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে এবং অবশেষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার শুরু করে। এ মামলার বিরুদ্ধে সারা পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে এ বিক্ষোভ গণঅভ্যুত্থানে রূপ পরিগ্রহ

করে। গণদাবির মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয়দফা কর্মসূচির সপক্ষে গণরায়ের জন্য নির্বাচনী প্রচার চালায়। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব রাজনীতিতে ছয়দফা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইত্তেফাকের ভূমিকা কেমন ছিল, কতটা জোরালো ছিল সেসব বিষয়ে জানার জন্যই এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে।

তথ্য সূত্রঃ

- আহমেদ, তোফায়েল : *'দৈনিক ইত্তেফাক বাঙালির কণ্ঠস্বর'*। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ডিসেম্বর, ঢাকা।
- আনাম, মাহফুজ : *'দ্য ডেইলি স্টার'*। ১৬ অক্টোবর ২০২১ (অনলাইন বাংলা ভার্সন)।
- হাসান, সোহরাব (২০০০)। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত *'পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সংবাদপত্র'* শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধ।
- ধর, সুব্রত শংকর (১৯৮৫) *'বাংলাদেশের সংবাদপত্র'।* ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
- জাহান, মো. এমরান (২০০৮)। *'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র'*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
- হালদার, নিরঞ্জন (২০০৫)। *'মানিক ভাই ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা'।* অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া। ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল।
- হুমায়ুন, আহমেদ (২০০৫)। *'নাম নয় ইতিহাস'।* অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া। ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল।
- হক, কামরুল, ফিরে দেখা শীর্ষক অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট, বিটিভি।
- খান, সাখাওয়াত আলী। *'লড়াকু সাংবাদিক মানিক মিয়া'*। দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ২০১৮।
- সাগর, আসিফুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ২০২১।
- রহমান, শেখ মুজিবুর, (২০১৩)। *'বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক মানিক ভাই'।* বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম। ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।
- *বাংলা পিডিয়া*: খণ্ড ৪ (২০১১), প্রধান সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
- হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার (২০১৮)। *'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৫০-১৯৭১'*, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।
- রশিদ, হারুন-অর (২০১৬)। *'আমাদের বাঁচার দাবি' ৬ দফা'র ৫০ বছর'*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

■■■

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে কোনো বিষয়-ঘটনা-প্রপঞ্চ কিংবা বাস্তবতার নতুন নতুন মাত্রা উদ্‌ঘাটন করা এবং এসবের বিস্তৃতি ঘটানো ও প্রায়োগিক সম্ভাবনাকে তলিয়ে দেখা। বাংলাদেশে গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণার সংখ্যা ও সুযোগ, আগ্রহ কিংবা অর্থনৈতিক বিচারে খুবই সীমিত। এমন বাস্তবতায় সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে এদেশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি বললেই চলে। তবে সংবাদপত্রে রাজনীতি বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক লেখালেখি নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই। 'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি' ঠিক এই শিরোনামে কোন গবেষণা না পাওয়া গেলেও সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার সঙ্গে রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বই-পত্র আমাদের নজরে এসেছে।

১৯৮৮ সালে ড. সাখাওয়াত আলী খানের পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল : 'সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ১৯৪৫-৫০ : বাংলায় পাকিস্তান-সমর্থক সাংবাদিকতার সঙ্গে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া'। এই অভিসন্দর্ভে মূলত মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে বিভাগপূর্বকালে কলকাতার মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোর এবং পরবর্তী সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান পত্রিকাগুলোর সঙ্গে রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া (interaction) ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interplay) আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আলোচ্য সময়ে মুসলিম লীগ রাজনীতির শক্তি-দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা ও বিভিন্ন প্রবণতাসংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।' ১৯৪৫-৫০ সময়ের রাজনীতিতে মূলত আজাদ পত্রিকার ভূমিকা বিশ্লেষণই এ গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অভিসন্দর্ভের শেষে গবেষক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ধারণাগুলো তুলে ধরেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, '১৯৫০ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান গণপরিষদে পেশকৃত পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আজাদ এবং প্রদেশের অন্যান্য সংবাদপত্র অত্যন্ত জোরালো এবং সফল প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল'। (খান : ১৯৮৮)।

'বাংলাদেশের গণমাধ্যম সাংবাদিকতায় আলোকিতজনেরা' শীর্ষক একটি গ্রন্থে দৈনিক ইত্তেফাক ও এর সম্পাদক মানিক মিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন গ্রন্থের লেখক ড. শেখ আবদুস সালাম। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে যিনি বাংলাদেশের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম জগতের পথিকৃৎ ও বিশিষ্টজনের কর্মপরিচিতি এবং তাঁদের অবদানের জানা-অজানা নানা কথা ও অবদানের স্বীকৃতির কথা তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সময়কার পথিকৃৎজন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্বের যেসব কলমসৈনিক, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এই জগতকে তাঁদের আপন আলোয় আলোকিত করেছেন তাঁদের সম্পর্কে লেখক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অবতারণা ও বর্ণনা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠা থেকে ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনায় উঠে এসেছেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং তাঁর অবদানের নানা কর্ম-পরিচিতি ও স্বীকৃতির কথা। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে এই প্রবন্ধের আলোচনায়। এই প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, দৈনিক ইত্তেফাক জন্মলগ্ন থেকেই এ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আর তাই পত্রিকাটি বারবার পাকিস্তান সরকারের তীব্র রোষানলে পড়েছে। ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা প্রবর্তনের পর প্রথমবারের মতো ইত্তেফাকের প্রকাশনা কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বন্ধ থাকে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করলে ইত্তেফাকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মিথ্যা অভিযোগে সামরিক সরকার তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করে। ১৯৬২ সালে তিনি আইয়ুব সরকার কর্তৃক দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হন। ছয়দফা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে একাধিকবার রাজনৈতিক মঞ্চ শিরোনামে কলাম লেখার কারণে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া শেষবারের মতো গ্রেফতার হন ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন। এ সময় ইত্তেফাকের প্রকাশনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়, (সালাম : ২০১১ : ১৯ : ২২)।

ড. কামরুল হক 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-১৯৯০' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা, সংবাদপত্রে সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন প্রবণতা ও এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন এবং সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর

গবেষণায় ২০টি রাজনৈতিক ইস্যুকে বিশ্লেষণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। সর্বোচ্চ প্রচার সংখ্যার ভিত্তিতে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এই চারটি সংবাদপত্র নির্বাচন করে এগুলোর খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠিপত্র ও মতামত বিশ্লেষণ করা হয়। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বর্ণনাভিত্তিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক এ দুটি কৌশলের মাধ্যমে সম্পাদিত এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, সংবাদপত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বাহন হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে সংবাদপত্র সচল ও প্রাণবন্ত রাখে। রাজনৈতিক ঘটনার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়। কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার খবর দীর্ঘদিন সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন বা প্রতিফলনের ফলে তা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে এবং জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র সম্পাদকীয় ও নিয়মিত বিভিন্ন কলাম প্রকাশের মাধ্যমে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সে সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। এইভাবে সংবাদপত্র নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুতে জনমত গঠনেও ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে পাঠকও সংবাদপত্রে চিঠি লিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদপত্রের মতামতকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেও পাঠকরা চিঠি লিখেন যা চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। আবার চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত চিঠি অনেক সময় খবরের সূত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এসবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা যে দাবি ও আহ্বান জানান এবং পরামর্শ দেন তা রাজনৈতিক বা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে এই ধরনের রাজনৈতিক বা সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াকে ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লিখে সংবাদপত্র ওই বিষয়ে মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করে। এইভাবে সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে। (হক : ২০২১ : ৫৪৭)।

বহু গ্রন্থের লেখক ড. সুনীল কান্তি দে তাঁর লেখা 'বঙ্গবন্ধু-মানিক মিয়া সম্পর্ক' শীর্ষক এক গবেষণাধর্মী গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের আলোকে দৈনিক ইত্তেফাককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের দুই মহান ব্যক্তিত্ব - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির প্রকাশক পাঠক সমাবেশ। মূল গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের উপস্থাপনা শেষে পরিশিষ্ট আকারে পাঁচটি পূর্ব প্রকাশিত নিবন্ধসহ কিছু দুর্লভ ছবিও স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মানিক মিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের নানা প্রসঙ্গ যেমন উঠে এসেছে এই গ্রন্থে,

তেমনি এতে স্থান পেয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক তথ্যচিত্র। গ্রন্থে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা - আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক ও ইস্যুতে বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়ার মধ্যকার রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সরকারি গোপন দলিলপত্র, পত্রিকা, সাময়িকপত্র, স্মৃতিকথা, কারাগারের ডায়েরি প্রভৃতি তথ্য-উৎসের সন্ধান মেলে এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক আলোকপাতে।

মানিক মিয়া সরাসরি রাজনীতিবিদ না হলেও বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ-এর সঙ্গে ছিলো তাঁর একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। লেখক তাঁর বিভিন্ন পর্বের আলোচনা ও উপস্থাপনায় '৫২- এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪- এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২- এর ছাত্র ও সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ঐতিহাসিক ছয়দফা ও '৬৯- এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে দৈনিক ইত্তেফাক, বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়ার ত্রিমাত্রিক সংশ্লিষ্টতা ও অবদানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। লেখকের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, স্বাধীনতা সংগ্রামে মানিক মিয়ার অবদান মূল্যায়ন করে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মানিক ভাইয়ের অবদানের কাহিনি অনেকেরই অজানা। পক্ষান্তরে আমার ব্যক্তিগত জীবনে মানিক ভাইয়ের প্রভাব যে কত গভীর তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। সেই পরিচয়ের পর থেকে সারাটা জীবন আমরা দু'ভাই একসঙ্গে জনগণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম করেছি। সে সংগ্রাম সাধনা পথের বাঁকে বাঁকে একে যে অন্যের প্রতি কোনদিন মান অভিমান করেনি, তা নয়। তবে তা ছিলো ক্ষণিকের বিভ্রমের মতো। একটা বিষয়ে আমরা উভয়ে একমত ছিলাম এবং তা হলো, বাংলার স্বাধীনতা ভিন্ন বাঙালির মুক্তি নেই, এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না।' (ড. সুনীল : ২০২১ : ১০)। জেলে থাকাকালেও বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়ার সঙ্গে পত্র মারফত কীভবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন তার প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে লেখক এই গ্রন্থে 'ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ রিপোর্ট' থেকে পাওয়া কয়েকটি চিঠির বর্ণনা হুবহু তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, মানিক মিয়াও বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর 'খোঁজখবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতেন।' লেখক আলাদা শিরোনামে 'আমাদের মানিক ভাই' এবং 'আমার মানিক ভাই' শীর্ষক দুটি লেখায় বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়ার সংগ্রামী জীবন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা-ত্যাগসহ দেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালোবাসার নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

'আমাদের বাঁচার দাবী : ৬ দফা'র ৫০ বছর' শীর্ষক গ্রন্থটি বর্তমান গবেষণা অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ তাৎপর্যবহ প্রকাশনা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হারুন-অর-রশিদ এই গ্রন্থের প্রণেতা। ঐতিহাসিক ছয়দফার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারাক্রম অনুযায়ী লেখক তাঁর গ্রন্থে ছয়টি অধ্যায়ের বিভাজন

করেছেন। অধ্যায়গুলো যথাক্রমে: 'অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আওয়ামী লীগ', 'আইয়ুব শাসন আমল (১৯৫৮-১৯৬৯): বাঙালির স্বাধীনতা ভাবনা', '৬-দফার ৫০ বছর : পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য', '৬৬ থেকে ৭১', 'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' এবং 'ঐ মহামানব আসে'। এছাড়া গবেষণা অনুসন্ধানের প্রামাণ্য মান অক্ষুণ্ন রেখে পরিশিষ্টাংশে লেখক যুক্ত করেছেন বেশকিছু তাৎপর্যবহ সংযোজন, যেমন: ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন (১৮ মার্চ ১৯৬৬) বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন, চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জনগণের নিকট বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা পেশ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬), আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন (১৮-২০ মার্চ ১৯৬৬) নেতৃবৃন্দের ডাক, সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর নীতিনির্ধারণী বক্তৃতা, পল্টনের জনসভায় (২০ মার্চ ১৯৬৬) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ৬-দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত পল্টনের জনসভা (২০ মার্চ ১৯৬৬) সম্বন্ধে দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ রিপোর্টিং, ৬-দফা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হুঁশিয়ারি এবং ৬-দফা দাবির প্রতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রতিক্রিয়াসহ আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জি।

বইটির প্রাক কথায় লেখক উল্লেখ করেন, '১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান শব্দটি ছিল না, কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়। অপরদিকে, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা কর্মসূচিতে কোথাও সরাসরি বাঙালির স্বাধীনতা বা তাদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়নি। তবে ৬-দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই পরিশেষে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর ৬-দফা কর্মসূচি পেশের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ঘটে বাংলাদেশ বিপ্লব, ১৯৭১। কী করে সেটি সম্ভব হলো? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য যা জানা আবশ্যক তা হচ্ছে, ৬-দফা কোনো দলের রাজনৈতিক 'দরকষাকষি'র বা গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। এর মর্মমূলে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীন রাষ্ট্রিক ধারণা- যা বঙ্গবন্ধু অনেকদিন থেকেই লালন করে আসছিলেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ৬-দফার রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ইত্তেফাকের ভূমিকাকে ৬-দফা আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হিসেবে বর্ণনা করে লেখক বলেন: '৬-দফা বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার মহাসনদ। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬-দফার পথেই '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন ও ম্যান্ডেট লাভ, '৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা' (রশিদ : ২০১৬ : ৭-৮)।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় পূর্ববাংলার আশাহত, ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের হতাশা, বেদনা ও বিক্ষোভের প্রতিধ্বনি উঠে এসেছে। ইত্তেফাক একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা বলেছে, আবার পত্রিকাটির পরিচালনাকারীদের সেসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। এর সম্পাদক ছিলেন এদেশের অন্যতম সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। বস্তুত মানিক মিয়ার নির্ভীক সাংবাদিকতার দিকটি বাদ দিয়ে সম্ভবত এদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো ছিলো বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়া বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন এই বিকাশগামী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিরই প্রতিভু এবং তাঁর পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক ছিল এই শ্রেণিরই অঘোষিত মুখপত্র। তাই দেখা যায়, সাংবাদিকতায় মানিক মিয়ার নিজস্ব ভূমিকা এবং তাঁর সৃষ্ট সাংবাদিকতা ধারার কারণেই দৈনিক ইত্তেফাক জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত (এমনকি মানিক মিয়ার মৃত্যুর পরও) এদেশের প্রতিটি উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। (ধর : ১৯৮৫ : ৫৪-৫৫)।

গোটা পাকিস্তান আমলেই এখানকার উঠতি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি তার নিজের বিকাশের স্বার্থেই এই কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে। সে সময়ের রাজনীতিতে সাধারণ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে এই বিকাশগামী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ সমন্বিত করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত হওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে মানিক মিয়ার সংশ্লিষ্টতা এবং দৈনিক ইত্তেফাকে সেসবের প্রতিফলন ছিল চোখে পড়ার মতো। দৈনিক ইত্তেফাকই মূলত: সে সময় জনআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ধারণা করা হয় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বিতর্ক, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনসহ সকল ঘটনার ব্যাপারে ইত্তেফাকের সাংবাদিকতা ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও জনআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল। কিন্তু এই ধারণা কতটুকু গবেষণানির্ভর তা' আজও আমাদের জানা হয়ে ওঠেনি। সে কারণে এর একটি গবেষণা ভিত্তি থাকা খুবই জরুরী। বর্তমান গবেষণাটি সেই লক্ষ্য নিয়েই হাতে নেয়া হয়েছে। এসব বিবেচনায় এই গবেষণাকর্মটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক।

তথ্য সূত্রঃ

- খান, সাখাওয়াত আলী, (১৯৮৮)। *'সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ১৯৪৫-৫০ : বাংলায় পাকিস্তান-সমর্থক সাংবাদিকতার সঙ্গে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া'*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
- সালাম, শেখ আবদুস, (২০১১)। *'বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় আলোকিতজনেরা'*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।
- হক, কামরুল, (২০২১)। *'বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-১৯৯০'*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
- দে, সুনীল কান্তি, (২০১১)। *'বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়া সম্পর্ক'*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।
- রশিদ, হারুন-অর (২০১৬)। *'আমাদের বাঁচার দাবী : ৬ দফার ৫০ বছর'*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- ধর, সুব্রত শংকর (১৯৮৫)। *'বাংলাদেশের সংবাদপত্র'*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

■■■

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। 'গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ত্রিশের দশক থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম সময়, কম খরচ এবং প্রচুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আধেয় বিশ্লেষণ করা যায় হেতু বর্তমানে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর এবং এ কারণে গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এক ধরনের দলিলনির্ভর পদ্ধতি বলা চলে। কারণ এখানে মূলত যোগাযোগের যাবতীয় লিখিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়' (হাসান : ১৯৯৬ : ২৮৩)। মূলত সংরক্ষিত তথ্যের বা টেক্সটের বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার কৌশলই হলো আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Walizer & Wienir, 1978)। অন্যদিকে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে Joann Keyton তাঁর Communication Research : Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

> Content analysis is the most basic methodology for analyzing message content ; it integrates data collection method and analytical technique in a research design to reveal the occurrence of some identifiable element in a text or set of messages. Content analysis can be used to identify frequencies of occurrence, differences, trends, patterns, and standards; first-order linkages should also be considered in the research design. (Keyton : 2006 : 246)

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। Mass Media Research : An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন:

> Content analysis is a popular technique in mass media research. (Wimmer & Dominick : 1987 :187)

এই গ্রন্থে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick আধেয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন:

> Many definitions of content analysis exist. Walizer and Wienir have defined it as any systematic procedure devised to examine the content of recorded information, Krippendorf defined it as a research technique for making replicable and valid references from data to their context. Kerlinger's definition is fairly typical: content analysis is a method of studying and analyzing communication in a systematic, objective and quantitative manner for the purpose of measuring variables. (Ibid, Wimmer & Dominick : 1987 :166)

P. J Stone তাঁর The General Inquirer : A Computer Approach to Content Analysis গ্রন্থে আধেয় বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন:

> Content analysis is a research technique for making references by systematically and objectively identifying specified characteristics within texts. (Stone : 1966 : 5)

এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুণগত ও সংখ্যাগত দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ খ্যাতিমান গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞগণ আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেছেন। Wimmer এবং Dominick-এর ভাষায় আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সংখ্যাগত ও গুণগত দুই ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয় (Wimmer & Dominick, 1987)। ক্রেসওয়েল-এর ভাষায় (Creswell: 1994) গবেষণায় প্রাধান্যশীল ধারা হলো তথ্যের গুণগত বিশ্লেষণ এবং যেটি করতে গিয়ে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় 'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি : ছয়দফা আন্দোলন' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাই কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিকেই আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা:

স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামাজিক অভিঘাতের সঙ্গে ইত্তেফাক পত্রিকাটির আন্তঃসম্পর্ক অনেক গভীর ও নিবিড়। পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশের রাজনীতির প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে এই পত্রিকাটি যথাযথভাবে তুলে ধরেছিল বলে ধারণা করা হয়। ইত্তেফাক সম্পাদক

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সাংবাদিকতার পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবনে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছয়দফা আন্দোলনের পূর্বাপর বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে এই পত্রিকাটির সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আমাদের আরও তথ্যনির্ভর ধারণা অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে রাজনীতির বাঁক-পরিবর্তনকারী প্রত্যেকটি ঘটনায় ইত্তেফাকের ভূমিকা কী ছিল তা সুনির্দিষ্ট গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোতে ইত্তেফাক পত্রিকার সংশ্লিষ্টতা কেমন ছিল তা এই গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারলে একদিকে যেমন সাংবাদিকতা বিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী ও আগ্রহীজনেরা উপকৃত হবেন, একইভাবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টজনেরাও পুরানো সেই জানা-অজানা তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের সন্ধান পাবেন। সার্বিক বিবেচনায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

উল্লেখিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান গবেষণা অনুসন্ধান অতি সময়োপযোগী একটি গবেষণাক্ষেত্র। সংগত কারণে 'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি : ছয়দফা আন্দোলন' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

পাশাপাশি সে সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের সেই সময়ের রাজনীতির সঙ্গে তাই এই পত্রিকাটির যুক্ততা সম্পর্কে আমাদের আরো বস্তুনিষ্ঠ ও পরিশীলিতভাবে জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে রাজনীতির বাঁক পরিবর্তনকারী প্রত্যেকটি ঘটনায় ইত্তেফাকের ভূমিকা কী ছিল তা সুনির্দিষ্ট গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা উচিত। ছয়দফা আন্দোলনও একটি উল্লেখযোগ্য বাক পরিবর্তনকারী ঘটনা। তাই 'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি : ছয়দফা আন্দোলন' শীর্ষক এই গবেষণাটি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোতে ইত্তেফাক পত্রিকার সংশ্লিষ্টতা কেমন ছিল তা একটি গবেষণার মাধ্যমে (পরিমাণগত ও গুণগত বিশ্লেষণের সাহায্যে) তুলে ধরতে পারলে একদিকে যেমন যোগাযোগ বা সাংবাদিকতা বিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপকৃত হবেন, একইভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও পুরানো সেই জানা-অজানা তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের সন্ধান পাবেন। সার্বিক বিবেচনায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর আলোকে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে:

এক. দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ছয়দফা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা।

দুই. পত্রিকাটিতে ছয়দফা আন্দোলনের খবর উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

তিন. ছয়দফা আন্দোলনের সময় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রাজনীতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন:

গবেষণার উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য সুফল বিবেচনায় নিয়ে নিম্নরূপ গবেষণা প্রশ্নের আলোকে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে :

এক. সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ঐ ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে কি?

দুই. রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয় কি?

তিন. কোনো রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সে বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি প্রকাশিত হয় কি?

নমুনায়ন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

এই গবেষণাকর্মের জন্য 'সম্ভাবনা নমুনায়ন' পদ্ধতির আলোকে স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় প্রথমে শুধু দৈনিক ইত্তেফাককেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে এই গবেষণাকর্মের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের সব দিনের পত্রিকাকে নমুনাভুক্ত করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য -উপাত্তের সামগ্রিক বিশ্লেষিত ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণাকর্মের সময় পরিধি:

এই গবেষণাকর্মের নির্ধারিত সময় ছয় মাস। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়কে এই গবেষণাকর্মের আওতায় আনা হয়েছে। যেহেতু ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ ছিল। পরে এ বছরই ২৭ জুলাই থেকে পুনরায় এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়নি, তাই ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়কে বিশ্লেষণের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

এই গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহের সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলা একাডেমি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার থেকে গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এইসব গ্রন্থাগারে কার্যকর অনুসন্ধান সত্ত্বেও পত্রিকার সকল কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কারণ পত্রিকার কিছু কিছু পৃষ্ঠা ছেঁড়া, নষ্ট ও পৃষ্ঠা কাটা ছিল। আবার কোন কোন মাসের পত্রিকা তারিখ অনুযায়ী সাজানো ছিল না। তাই সব সময় ধারাবাহিকভাবে কাঙ্ক্ষিত তথ্য অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি।

এই গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীন কম্পিউটার ল্যাবের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবে স্ক্যান করা পত্রিকা অস্পষ্ট এবং সফটওয়্যারটি ম্যানুয়াল থাকার কারণে কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেশ ভোগান্তি ও কালক্ষেপণ হয়েছে। পত্রিকার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে স্ক্যান করা পিডিএফ অনুলিপি থেকে এবং তা ডিজিটাল মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহের উপায় ছিল না। স্ক্যান করা পিডিএফ কপি থেকে নমুনার অবস্থান লিপিবদ্ধ করে প্রিন্ট নিতে হয়েছে। তথ্য অনুসন্ধান এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটি ছিল বেশ সময়সাপেক্ষ।

পত্রিকাটি পুরানো হওয়ায় প্রাপ্ত ও সংগৃহীত কপিগুলোর মুদ্রণ কোন কোন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে পড়া সম্ভব হয়নি। মুদ্রণ অবস্থা অস্পষ্ট থাকার কারণে কোন কোন কপি আংশিক নেওয়া গেছে। আবার পড়ার অযোগ্য থাকার কারণে অনেক কপি হাতেও লিখতে হয়েছে।

উপরোক্ত কারণে এই গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করতে পারি না।

তথ্য সূত্রঃ

- ইমাম, মুহাম্মদ হাসান (১৯৯৬), '*সামাজিক গবেষণা : প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি*', ঢাকা : অধুনা প্রকাশনী।
- Creswell, J. W. (1994), *'Research design : Qualitative and quantitative approaches'*. London : Sage.
- Keyton, Joann, *'Communication Research : Asking Question, Finding Answers',* New York: McGraw-Hill.
- Wimmer, D. Roger & Dominick, R. Joseph, *'Mass Media Research : An Introduction (2nd ed.)',* California : Wadsworth Publishing Company.
- Stone, P. J, *'The General Inquirer : A Computer Approach to Content Analysis',* Cambridge, M A: MIT Press.
- Walizer, H. M., & Wienir, P. L., (1978), *'Research Method and Analysis'*. New York : Happer and Row.

■■■

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন
[রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি]

গবেষণাকর্মের এই অধ্যায়ে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ছয়দফা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠিপত্র সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্ট:

১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা এবং ছয়দফা আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলন নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

এক. বঙ্গবন্ধুর লাহোর যাত্রা

পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের খবর দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৬৬ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'বিরোধী শিবিরের উদ্যোগে লাহোরে আসন্ন জাতীয় সম্মেলন : আওয়ামী লীগের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল দেশের বিরোধী শিবিরের উদ্যোগে লাহোরে আয়োজিত আসন্ন জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া গতকল্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম দলও আলোচ্য সম্মেলনে নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পাক-ভারত যুদ্ধোত্তরকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য আগামী ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আলোচ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবিত সভা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সহিত গত দুইদিন ধরিয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও

আসন্ন লাহোর জাতীয় সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গতকল্য (রবিবার) উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক হাফিজ হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক এবং জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্য মেসার্স মিজানুর রহমান চৌধুরী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও এ বি এম নূরুল ইসলাম এই প্রতিনিধিদলে থাকিবেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর সঙ্গে আলোচনাক্রমে ইতিপূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম দল লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গতকল্য পর্যন্ত এনডিএফ জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে। উক্ত সূত্রে আরও জানান হয় যে, এনডিএফ নেতৃবৃন্দ লাহোর সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে এখনও আলোচনা চালাইয়া যাইতেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকল্য লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে উক্ত রিপোর্টারের কাছে তাহার পূর্ব পাকিস্তান সফর সম্পর্কে গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে দেশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হইয়াছে। বিরোধীদলগুলি এই সঙ্কট মুহূর্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতে পারে না। তাই দেশের যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য লাহোর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি এই সম্মেলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করিয়াছেন এবং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে লাহোর প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। তিনি বলেন যে, এইবার তাহার পূর্ব পাকিস্তান সফর সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। গতকল্য অপরাহ্নে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ জাতীয় পরিষদ সদস্য ডক্টর আলীম-আল-রাজীসহ স্বতন্ত্র দলীয় কতিপয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। এই খবরটিতে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীদের যোগদানের কথা বলা হয়েছে। লাহোর সম্মেলনে যোগদানের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ সময় তিনি ছয়দফা কর্মসূচির কথা সরাসরি উল্লেখ না করলেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, '১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশরক্ষামূলক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার দ্বারাই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব'। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে : লাহোর সম্মেলনে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মজিবর রহমান'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকল্য (শুক্রবার) লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান দেশের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ভাবাবেগমুক্ত পরিবেশে বিবেচনা ও বিগত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষ্কলুষ মন লইয়া ভবিষ্যতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
>
> লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে গতকল্য তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক শেখ মুজিবর রহমানকে ঘিরিয়া ধরেন। শেখ মুজিবর সাংবাদিকদের একটি স্বাক্ষরিত ভাষণ দান করেন।
>
> তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, এই মুহূর্তে তাঁহার এর বেশী কিছু বলার নাই। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, আগামীকল্য লাহোরে যে জাতীয় সম্মেলন শুরু হইতেছে, তাহাতে যোগদানের জন্যই তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা লাহোর যাইতেছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের সহিত সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলে দেশ আজ ক্ষতবিক্ষত। তাই সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি আজ ধীরস্থির ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। বিগত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দেনা-পাওনার হিসাব আজ কষিয়া দেখিতে হইবে এবং এই হিসাবের প্রেক্ষিতে দেশ আজ সার্বিকভাবে কি পাইয়াছে, তাহাও বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

> আওয়ামী লীগের নীতি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ সর্বদাই শান্তির পক্ষপাতী। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা শান্তিতে বসবাস করিতে চাই। আওয়ামী লীগ সর্বপ্রকারের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে বিশ্বাসী এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য শক্তির ব্যবহারকে আওয়ামী লীগ নিন্দা করে। শান্তিকে সমুন্নত রাখার সুস্পষ্ট ব্রত লইয়াই আমরা লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিতেছি।
>
> শান্তিকামী মানুষের চাপে বিশেষ করিয়া রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ কসিগিনের প্রচেষ্টায় আজ যে স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইবার জন্যও আমরা জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিতেছি। শান্তির উপর যেকোন ধরনের ভাবী হামলা প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
>
> শেখ মুজিব বলেন যে, সাম্প্রতিককালে উপর্যুপরি পট পরিবর্তনে ইহাই প্রতিভাত হইয়াছে যে, ব্যক্তির খেয়াল-খুশি অনুযায়ী নহে, সমষ্টির বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ীই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত করার জন্য নির্ভেজাল গণতন্ত্র পুনরায় কায়েম করিতে হইবে। বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আজ সকলেই পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশীভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশরক্ষামূলক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার দ্বারাই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব।

দুই. লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলন

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ৭৪০ জন রাজনৈতিক নেতা অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২১ জন নেতা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কিত একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন'। এতে বলা হয়:

> গতকল্য (শনিবার) লাহোরে নেজামে ইসলাম নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে দুই দিনব্যাপী নিখিল পাকিস্তানের জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের

পক্ষ হইতে আমন্ত্রিত ৮ শত ব্যক্তির মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে সর্বমোট ৭৪০ জন সম্মেলনে যোগদান করেন। তন্মধ্যে ১২৪ জন লাহোর, ৫৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য স্থান এবং ২১ জন পূর্ব পাকিস্তান হইতে যোগদান করেন।

সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হইলেন, মওলানা আবুল আলা মওদুদী, নবাবজাদা নসরুল্লা খান, সর্দার শওকত হায়াত খান, শেখ মুজিবর রহমান, মৌলভী ফরিদ আহমদ, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এ,বি,এম, নূরুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল, জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলি, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য জনাব আবদুস সোবহান, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য মওলানা ইউসুফ, মওলানা জান মোহাম্মদ আব্বাস, মওলানা মঈন উদ্দিন, জনাব হামজা এম, পি, এ, চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন ছাত্তা, জনাব আবদুল বাকী বালুচ, জনাব শফিকুল ইসলাম, খাজা মোহাম্মদ রফিক, জনাব এম, আর, খান, মওলানা মোসলেহ উদ্দীন, মওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াজী, সৈয়দ ওয়াহিদ খান এম, পি, এ, পাকিস্তানের সাবেক এটর্নী জেনারেল চৌধুরী নাজির আহমদ খান, চৌধুরী রহমত আলী, মওলানা মোহাম্মদ চিরাগ এবং জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ার।'

পরের দিন অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে লাহোরে বিরোধী দলের নেতাদের অধিবেশন শুরু হয়। এই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত খবর ৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'লাহোর সম্মেলন, প্রাতঃকালীন অধিবেশনের এপিপি পরিবেশিত বিবরণ'। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন অদ্য ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি রহমত বর্ষণ করিয়া পাকিস্তানের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী শত্রুকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

অদ্য নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী যে দুর্জয় সাহস, অবিশ্বাস্য শৌর্য ও ত্যাগের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড রক্ষা করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ নিবেদন করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী তাহাদের বিস্ময়কর সাফল্যের দ্বারা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়

সংযোজন করিয়াছে এবং বিশ্বে তাহাদের নিজেদের ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

দেশমাতৃকার রক্ষাকার্যে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন, সম্মেলন তাঁহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং পরকালে তাঁহাদেরকে শহীদের মর্যাদা দানের জন্য আল্লার কাছে মোনাজাত করা হয়। তাছাড়া সম্মেলন শহীদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ক্ষতি সহ্য করার মত শক্তিদানের জন্যও আল্লাহ তায়ালার দরবারে মোনাজাত করা হয়।

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এবং কাশ্মীর প্রশ্নে যে সমস্ত দেশ পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়াইয়াছে সম্মেলন সেই সমস্ত দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এই প্রসঙ্গে সম্মেলন বিশেষভাবে চীন, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, ইরান, সউদী আরব, জর্দান ও আইভরী কোষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান এবং সমর্থন করেন সরদার শওকত হায়াত খান ও মওলানা সালাহ উদ্দীন।

মওলানা আবুল আলা মওদুদী কর্তৃক উত্থাপিত অপর এক প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, তাসখেন্দ ঘোষণা পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, দেশের সম্ভ্রম ও মর্যাদাহানিকর এবং তাহা কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়ানুগ ও গণতান্ত্রিক সমাধানের পথে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রস্তাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়: 'কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা কোন বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই এই ঘোষণায় সৈন্য অপসারণের তারিখ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।'

'কাশ্মীর যে বিরোধীয় এলাকা এবং জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক ভারত যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই বিরোধ মীমাংসা করিবে, ভারতের পক্ষ হইতে অনুরূপ কোন প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই পাকিস্তান পাক-ভারত বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ না করিতে সম্মত হয়।'

'সম্মেলনের পূর্বে ভারত স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে যে, কাশ্মীরকে তাহারা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এবং কাশ্মীর সমস্যাকে তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই মনে করে এবং সম্মেলনে আলোচনার আগাগোড়াই ভারত এই নীতির পুনরুক্তি করে অথচ এতদসত্ত্বেও পাকিস্তান তাসখেন্দ ঘোষণায় ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার হস্তক্ষেপ না করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত যে তাহাদের নীতিতে পূর্বের ন্যায়ই অটল ও অনড় রহিয়াছে, চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষীয় ভারতীয় মহলের বক্তৃতা-বিবৃতিই তাহার প্রমাণ।

পাকিস্তান ভারত বিরোধী প্রচারণা বন্ধ করিতে সম্মত হইয়াছে। অথচ ভারত বলপ্রয়োগের সাহায্যে কাশ্মীরীদের আজাদী আন্দোলন স্তব্ধ করার নীতি অবিরাম চালাইয়া যাইতেছে। ২৩শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ

হওয়ার পরও ভারত কাশ্মীরে বর্বর অত্যাচার ও অকথ্য নির্যাতন চালাইয়াছে এবং এখনও কারান্তরালে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে। অথচ তাসখেন্দ ঘোষণায় এই নির্যাতন ও অত্যাচার বন্ধের ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই।

এই সমস্ত কারণে, সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, তাসখেন্দ ঘোষণা কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবীর ক্ষতি করিয়াছে এবং যুদ্ধ শুরুর পূর্বে কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সমাধানের যে সম্ভাবনাটুকু ছিল তাহা আরও ম্লান হইয়া গিয়াছে।

সম্মেলন ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানের জনগণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ ছাড়াই ও তাহাদের সুস্পষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাসখেন্দ ঘোষণায় পাকিস্তানের পক্ষ হইতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে বিধায় এই আপোষের ব্যাপারে জাতির কোন দায়িত্ব নাই।

সম্মেলন কাশ্মীরীদের এই আশ্বাস দেয় যে, তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সংগ্রামে পাকিস্তানের জনগণ তাহাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে এবং ভারতের নাগপাশ হইতে জম্মু ও কাশ্মীর মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা (পাকিস্তানবাসী) ভারতের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে পারে না।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী

সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে "জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের বিবেকের নির্দেশমত অবাধে মতামত প্রকাশ করিতে পারে," সেজন্য ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়: "জরুরী অবস্থা জারি করার একমাত্র যুক্তি ছিল যে, ঐ সময় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উপর বিধিনিষেধ ঐ সময় প্রয়োজনীয় ছিল বলিয়া জনসাধারণ আনন্দের সঙ্গেই উহা স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। আমরা যখন সত্যই সুন্দর জীবনের জন্য সংগ্রামের নিয়োজিত ছিলাম, সেই সময়ে মৌলিক অধিকার বাতিল বোধগম্য ছিল।"

প্রস্তাবে আরও বলা হয় ঃ যুদ্ধের সময় আইন মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিনা প্রয়োজনে এক মিনিটকালও জরুরী অবস্থা বজায় রাখা সরকারের অভিপ্রায় নয়।

"গত ১০ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট তাসখেন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর পাক-ভারত যুদ্ধ অবস্থার অবসান হয়। এক্ষণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নেই আমাদের সরকার এবং উহার সকল বিভাগের উদ্যম ব্যয়িত হইতেছে। 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি কার্যতঃ সম্পাদিত হওয়ায় এক্ষণে জরুরী অবস্থা বজায় রাখার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কেননা উহার আবরণে জনসাধারণকে মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করার প্রয়াস চলিতেছে।"

চৌধুরী নাজির আহমদ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং অধ্যাপক গোলাম আজম ও জনাব মাহমুদ উহা সমর্থন করেন।

তিন. ছয়দফা প্রস্তাব পেশ ও সম্মেলন বর্জন

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে 'ছয়দফা' প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে 'ছয়দফা' প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। শুধু তাই নয়, তারা বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী অভিহিত করেন। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ ফেব্রুয়ারির সম্মেলন বর্জন করেন।

১৯৬৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে ১১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'সাম্প্রতিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন আরও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, লাহোরে শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রদেশবাসীর মনোভাব ব্যাখ্যা'। লাহোর থেকে খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা ইউ,পি,পি। এই খবরটিতে বলা হয়:

> লাহোর, ১০ই ফেব্রুয়ারি- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটাকে প্রাদেশিক বলিয়া চিত্রিত করা উচিত নহে। শেখ সাহেব বলেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল এবং পাস্তিানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির রক্ষার ব্যাপারে দেশকে সুসংহত রাখিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসী দেশরক্ষার ব্যাপারে তাহাদের প্রদেশের স্বয়ং সম্পূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে থাকে।
>
> শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হয় তাহা হইলে জাতি তাহাদের মাতৃভূমির সংহতির বিরুদ্ধে পরিচালিত যে-কোন হামলা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে।

তিনি বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতীয় সংহতির কোন ক্ষতি তো করিবেই না, বরং পাকিস্তানকে আরও বেশী শক্তিশালী করিবে। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদ কর্তৃক পুংখানুপুংকরূপে আলোচনার পূর্বে তাসখেন্দ ঘোষণা সম্পর্কে এই মতামত প্রকাশ করিবেন না। তিনি বলেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত দেশের ৪টি বিরোধী দলের সম্মেলন সফল হইয়াছে। সম্মেলনে দেশের উভয় অংশের সাড়ে সাতশত প্রতিনিধির যোগদান একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়।

শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি সম্মেলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছে এবং সম্মেলন সংক্রান্ত যে সামান্য সংবাদ ঐ সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছে তাহাও বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে কারণ, উহা বিরোধী দলীয় কর্মীদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছে।

১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। লাহোর থেকে ফিরে ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গবন্ধু সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, লাহোর সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের প্রভাবশালী একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, শুনতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁর প্রতিনিধি দলসহ সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে অটুট ঐক্য, সংহতি ও বৃহত্তর সমঝোতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছয়দফাকে সমর্থন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। পরের দিন ১৯৬৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে একটি খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নহে, তাই লাহোর সম্মেলনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কারণ বর্ণনা প্রসংগে শেখ মুজিব দেশের উভয় অংশের মধ্যে অটুট ঐক্য ও সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য ৬-দফা কর্তব্য নির্দেশ'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী শিবিরের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদিই নয়, গোটা সম্মেলনের সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয় বলিয়াই এই সম্মেলনের সঙ্গে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মীদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইয়াছে এবং সেইজন্যই সম্মেলনে গৃহীত কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোনরূপ সম্পর্ক বা সংশ্রব নাই। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় একঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন এবং সাংবাদিকদের বহুমুখী প্রশ্নের জবাবদান করেন। যুদ্ধোত্তর দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শেখ মুজিব জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বিবেচনার জন্য দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে অটুট ঐক্য, সুদৃঢ় সংহতি ও বৃহত্তর সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মুখ্যতঃ যে ৬-দফা প্রস্তাব করেন সেই সম্পর্কে তিনি সাংবাদিকদের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। লাহোর সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে তিনি যে-সব সুপারিশ পেশ করেন সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, পাক-ভারতের মধ্যকার বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে প্রশাসনিক দিক দিয়া জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, বিগত অস্বাভাবিক ধরনের জরুরী দিনগুলিতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানীদের ঐক্যবোধই দেশের দুই প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ঘটনাক্রমে নহে।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে তিনি যেসব সুপারিশ করিয়াছেন তাহা পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিশ্বমানচিত্রে কায়েম রাখার জন্যই করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই উদ্দেশ্য নিয়াই তিনি লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে তিনি একটি শাসনতান্ত্রিক ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। সুপারিশকৃত এই শাসনতন্ত্রে বিশ্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েমের এবং আইন পরিষদসমূহের সার্বভৌমত্বের বিধান থাকিতে হইবে।

ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারাধীন যেসব বিষয় থাকিবে বলিয়া শেখ মুজিবর যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা এই যে, ফেডারেল সরকার দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়া আর বাকি যেসব বিষয় থাকিবে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ষ্টেটসমূহের হাতে।

দেশের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব সাবজেক্ট কমিটিতে অবাধে বিনিময়যোগ্য দুইটি পৃথক ধরনের মুদ্রার অথবা শর্তসাপেক্ষের একটি মুদ্রা ব্যবস্থা কায়েম রাখার সুপারিশ করিয়াছেন।

তিনি সুপারিশ করিয়াছেন যে, ফেডারেশনের জন্য যদি একটি মুদ্রা ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

কর ধার্য করা সম্পর্কে শেখ মুজিব যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা হইতেছে যে, সর্বপ্রকারের কর ও শুল্ক ধার্যের একচেটিয়া অধিকার ফেডারেশনের ষ্টেটসমূহের হাতেই থাকিবে। ফেডারেল সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের অধিকার থাকিবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য ষ্টেটসমূহের করের একটি অংশ ফেডারেল সরকার পাইবেন। ষ্টেটসমূহের সকল প্রকার করের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ দ্বারাই ফেডারেল সরকারের তহবিল গঠিত হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে শেখ মুজিব ৫ দফা সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমত:, ফেডারেশনের প্রতিটি ষ্টেটের পৃথকভাবে বিদেশী বাণিজ্যের হিসাব রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত:, বিদেশী বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত বিদেশী মুদ্রা ষ্টেটগুলির অধিকারে থাকিবে। তৃতীয়ত:, ফেডারেল সরকারের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সম্মত কোন একটা হারে ষ্টেটসমূহ মিটাইবে। চতুর্থত:, প্রয়োজনীয় স্বদেশে প্রস্তুত সকল দ্রব্যই বিনা শুল্কে বা টেরিফের বিধিবিধানমুক্ত অবস্থায় ষ্টেটসমূহের মধ্যে যাতায়াত করিবে। শেষত:, শাসনতান্ত্রিক বিধান করিয়া ষ্টেটসমূহকে বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের এবং সংশ্লিষ্ট ষ্টেটের স্বার্থে বিদেশে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দিতে হইবে।

শেখ মুজিব শাসনতন্ত্র মতে ষ্টেটসমূহকে আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 'পেরা-মিলিটারী' বা আঞ্চলিক বাহিনী সংরক্ষণের অধিকার দানেরও সুপারিশ করেন।

শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রভাবশালী একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, শুনিতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁহার প্রতিনিধিদলসহ সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

তাসখেন্দ ঘোষণা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক তাসখেন্দ প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বে এই প্রশ্নে কোন মতামত দেওয়ার কোন এখতিয়ার তাঁহার নাই এবং

সেইজন্যই লাহোর সম্মেলনে এই প্রশ্নে তাঁহার কোন মতামত দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আশা করা গিয়াছিল যে, এই সম্মেলনে জাতীয় সমস্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য জাতির সামনে সঠিক একটা কর্মসূচী তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সম্মেলনের প্রভাবশালী উদ্যোক্তারা সবকিছুই পূর্বাহ্নে সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাদির কিছুই তাঁহারা বিচার-বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে তিনি যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, সেই ৬-দফা অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক কোন সংগ্রামের জন্য কোন প্লাটফরম গঠন করা হইলে তিনি সেই প্লাটফরমের সঙ্গে থাকিবেন।

চার. আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফার অনুমোদন লাভ

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ছয়দফা দাবি উত্থাপিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গৃহীত হয়। উক্ত সভায় ছয়দফার দলীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ পুস্তিকা প্রকাশ করে তা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুস্তিকা প্রকাশ এবং খসড়া তৈরির জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ প্রসঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবীর প্রতি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অকুণ্ঠ সমর্থন'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

পাক-ভারত মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এই সংঘর্ষের অবসান, তাসখেন্দ চুক্তি এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনের পটভূমিকায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত বৈঠক গত রবিবার অধিক রাত্রে সমাপ্ত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির এই বর্ধিত বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন ও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করা হয়। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চুলচেরা পর্যালোচনা করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই বর্ধিত সভা তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কে দলীয় অভিমত ব্যক্ত করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশে জরুরী অবস্থার আশু অবসান ঘটাইয়া দেশবাসীকে তাঁহাদের হৃত মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার,

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন ও তৎসংক্রান্ত বিধিবিধান বাতিল করার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জোর দাবী জানাইয়াছে।

গত রবিবার সকাল ৯টায় শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই বর্ধিত বৈঠক শুরু হয়। যুদ্ধোত্তরকালে দেশে উদ্ভূত সম্পূর্ণ নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সঠিক পথনির্দেশদান করাই এই বৈঠক অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকেরাও বিশেষ দায়িত্ব ও আগ্রহ সহকারে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এই বৈঠকে যোগদান করেন। প্রায় পনের ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ দেশের যাবতীয় প্রশ্নে তাঁহাদের ও সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের মতামত ব্যক্ত করেন। বৈঠকের শুরুতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অসুস্থ সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের আশু রোগমুক্তি কামনা করা হয়। তারপর পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গৃহীত দলীয় ব্যবস্থাদি বিশেষ করিয়া ঢাকায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার এবং সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের যোগদান ও সম্মেলনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানকারীদের অবহিত করান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত বৈঠক শেখ মুজিবের বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ৬-দফাকে অনুমোদন দান করিয়াছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত আওয়ামী লীগের এই ৬-দফার দলীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহকারে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ঐসব পুস্তিকা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। পুস্তিকার খসড়াও প্রকাশের জন্য ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও হাইকোর্ট বার সমিতির সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব জহিরউদ্দীন, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান এই কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন।

তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কে

মতামত দান প্রসঙ্গে গৃহীত প্রস্তাবে দেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখা এবং এই ধরনের ব্যবস্থা কায়েম রাখার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ও বিপদ-আপদ হইতে দেশ ও দেশবাসীকে অব্যাহতি দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ও অপ্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার অবসান করতঃ জনসাধারণের ইচ্ছাকে সার্বিক প্রাধান্য দিয়া দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জোর দাবী জানাইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বহু বিঘোষিত নীতির পুনরোল্লেখ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তি ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করিতে চায়। বিশ্বের সাধারণ মানুষ বিশেষ করিয়া আমাদের মত অনুন্নত দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও প্রগতির স্বার্থে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। তাসখেন্দ ঘোষণাপত্র প্রসঙ্গে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সৎ-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর নাও হইতে পারে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে। পাক-ভারতের মধ্যকার কাশ্মীরসহ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে দুই দেশই তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রকে উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যমতে কার্যকরী করার প্রয়াস পাইবে বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি আশাবাদ প্রকাশ করিয়াছে।

পাঁচ. ছয়দফা কী এবং কেন: বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মাইজদীকোর্ট টাউন হলে আয়োজিত নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালিসহ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নোয়াখালী জেলার ১৬টি থানা থেকে ৩ শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতা-কর্মীদের সভায় ছয়দফার ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কিত একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিন নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে শেখ মুজিবের আহ্বান'। নোয়াখালীর মাইজদীকোর্ট থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধির তারযোগে প্রাপ্ত এই খবরটিতে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন, "আমরা আর নেতাদের ঐক্যে বিশ্বাস করি না। আমরা

জনগণের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং জনগণের ঐক্য কায়েমের প্রত্যাশী। আমরা চাই তথাকথিত প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটুক এবং রাজনীতি সাধারণ মানুষের অধিকারে আসুক। বিবেকের দংশন যিনি অনুভব করেন, আসুন–আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে সমুন্নত করিয়া তুলুন।"

মাইজদীকোর্ট টাউন হলে আয়োজিত নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সম্পাদক উপরোক্ত আহ্বান জানান। হলে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি সহকারে শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। নোয়াখালী জেলার ১৬টি থানা হইতে প্রায় ৩ শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। সম্মেলন দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী প্রদেশের ঘরে ঘরে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং কর্মিগণ যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান কর্মীদের প্রতি ঘরে ঘরে ৬-দফার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রয়োজন হইলে কর্মীদের স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার জন্য তিনি কর্মীদের প্রস্তুত থাকিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, যেদিন এই ছয়-দফার জন্য একজন কর্মীও গ্রেফতার হইবেন, সেইদিন যেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি কারাগার কর্মীদের দ্বারা ভরিয়া যায়।

মাইজদীকোর্ট টাউন হলে জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবিতাবস্থায় দেশের জনগণের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানান। অতীতে যে সমস্ত নেতা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেছেন তাঁদের প্রতি সতর্ক থাকার জন্য তিনি কর্মীদের উপদেশ প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই মুক্তিসনদ নহে, পঃ পাকিস্তানেরও স্বার্থের অনুকূল–শেখ মুজিব'। নোয়াখালীর মাইজদীকোর্ট থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> অদ্য স্থানীয় টাউন হলে জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, (তাহার বক্তৃতার আংশিক বিবরণ গতকল্যকার ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে) পশ্চিম পাকিস্তান হইতে নেতা আমদানীর বন্যা শুরু হইয়াছে- তাঁহারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাইতেছেন।

> তিনি জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু "এই নেতারা কি ধরনের গণতন্ত্র চাহেন?" তাঁহারা এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাহেন যাহাতে ৯২ ধারা জারি করিয়া শেরে বাংলার মত নেতাকেও অন্তরীণাবদ্ধ করা যায়– জনগণের দাবী স্তব্ধ করিয়া দেওয়া যায়। অতীতে যে সমস্ত নেতা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি সতর্ক থাকার জন্য তিনি কর্মীদের উপদেশ দেন।
>
> ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, এই ৬-দফা কেবলমাত্র নির্যাতিত পূর্ব পাকিস্তানেরই মুক্তির সনদ নহে–ইহা পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থেরও অনুকূল। ইহাতে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তাই নহে বরং পশ্চিম পাকিস্তানেরও সম-অধিকারের বিধানও রহিয়াছে। আমি বুঝিনা কেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ তাঁহাদরে অধিকার আদায়ের জন্য আগাইয়া আসিবেন না? মুষ্টিমেয় কোটারীর কবজা হইতে অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে এই সুযোগে আগাইয়া আসার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ও শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও ডেলিগেট সভায় ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯৬৬ সালের ৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন : নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> গত মঙ্গলবার বিকালে নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লা ইন্সটিটিউটে আয়োজিত নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ও শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও ডেলিগেট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সক্রিয় সংগ্রামের মাধ্যম শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে সকল আওয়ামী লীগ কর্মীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি ৬-দফা দাবীকে পূর্ব বাংলার সাড়ে ৫ কোটি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা বলিয়া অভিহিত করেন।
>
> সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। অপরাপর প্রস্তাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারসহ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্তন, সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদান, লেভী প্রত্যাহার, নরসিংদীকে পৌরসভার মর্যাদাদান, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাব অনুসারে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর নামে নারায়ণগঞ্জে একটি টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও একটি রাস্তার নামকরণ, মনোনয়নের

পরিবর্তে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং শহীদনগরে গরীব জনসাধারণকে জমির বন্দোবস্ত দানের দাবী জানানো হয়। এক প্রস্তাবে সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল সদস্য দেশরক্ষায় শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং অন্যান্য সৈনিকদের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যখনই কেহ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তখনই তাহাদের উপর অত্যাচার নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ দিনের যুদ্ধ দেশের সমস্যাদিকে দেশবাসীর কাছে নূতনভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর সমাধানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি ৬-দফা দাবী তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি এক এক করিয়া ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এক শ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা তাঁহার ৬-দফা প্রস্তাবে আঁতকাইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ চিরন্তন শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করিতে পারে- এই ভয়ে এই সব নেতাদের এই কর্মব্যস্ততা। যাহারা অন্য কোন কথা না তুলিয়া আগে গণতন্ত্রের সংগ্রামের কথা বলেন, তাহাদের বক্তব্যের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, এমন গণতন্ত্র নিশ্চয়ই কাম্য নয় -যাহাতে মানুষ মানুষকে শোষণ করিবে এবং সাড়ে ৫ কোটি লোকের সম্পদ লুটিয়া কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোক সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তুলিবে।

শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা আদায়ের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত: ৩ জন করিয়া আওয়ামী লীগ কর্মীকে প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানান।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় ছয়দফা দাবী আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৭ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা দাবী আমাদের জীবন-মরণ প্রশ্ন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

গতকল্য (রবিবার) দ্বিপ্রহরে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবীকে পূর্ব পাকিস্তানের তথা গোটা পাকিস্তানের বঞ্চিত দশ কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, ৬- দফা দাবী বাস্তবায়িত হইলে পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, এমন দিন দূরে নয়, যখন সকল মহল ৬-দফা দাবী মানিয়া লইবেন, শুধু তাহাই নয়, এই দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শরিক হইবেন।

শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আমাদের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ১১ মার্চ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি আদায়ে বৃহত্তর সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন, ছয়দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে ওঠতে পারে। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শক্তিশালী কেন্দ্র আমাদের দুঃসময়ে কোন কাজে আসিবে না –শেখ মুজিব'। ময়মনসিংহ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

আজ জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তাদের সমালোচনাকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত শক্তিশালী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কোন প্রকার কার্যকরী সাহায্য করিতে পারে নাই। তিনি বলেন, যুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট, সেনা, বিমান, ও নৌবাহিনীর প্রধানগণ কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারীগণ পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া এখানকার জনসাধারণের খোঁজখবর লইতে পারেন নাই। কারণ, তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, এই ধরনের শক্তিশালী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের দুঃসময়ে কোন কাজে আসিবেনা। তিনি পুনরায় দৃঢ়তার সাথে বলেন, ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া উঠিতে পারে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম এডভোকেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে জেলা ও মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২ শত কাউন্সিলর যোগদান করেন।

অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় শেখ মুজিবর রহমান দেশে সুস্থ রাজনীতি গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মওলানা মওদুদী সহ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুধাবনের আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব ৬-দফার সমালোচকদের জবাব দান প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যখনই কোন দাবী উঠিয়াছে তখনই উহাকে 'রাষ্ট্র-বিরোধী' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কিন্তু এখন এই ধরনের প্রচারণা বন্ধ করার সময় আসিয়াছে। এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ নেতা মেসার্স খন্দকার মোস্তাক আহমদ, তাজুদ্দিন আহমদ, আবদুল মোমিন এডভোকেট, নূরুল ইসলাম এম, এন, এ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ ঢাকার মতিঝিলস্থ হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। কাউন্সিল অধিবেশন উদ্‌বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট বারের সভাপতি আবদুস সালাম খান। সভাপতিত্ব করেন দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম। উদ্‌বোধনী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের দূর-দূরান্ত থেকে আগত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের সামনে ছয়দফাকে জনগণের দাবি হিসেবে তুলে ধরে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৯ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল : 'দেশের দুই অংশের সত্যিকার মিলন- সেতু রচনার জন্য ৬ দফার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন : আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে নেতৃবৃন্দের ডাক'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পাকিস্তানকে যাহারা ভালবাসেন, পাকিস্তানী জাতীয়তায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, মনে-প্রাণে যাহারা সত্যিকারের জাতীয় ঐক্য কামনা করেন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বা 'শক্তিশালী কেন্দ্র' তাহাদের কাম্য হইতে পারে না– শক্তিশালী পাকিস্তানী জাতিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। পাকিস্তানকে সত্যিকার শক্তিশালী রাষ্ট্র করিয়া গড়িয়া তুলিবার মানসে শক্তিশালী পাকিস্তানী জাতি গঠনের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করিতে করিতে যে সিংহহৃদয় নেতা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সেই দেশবরেণ্য জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্বপ্ন-সাধের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবিই হইল আওয়ামী লীগের আজিকার এই ৬ দফা কর্মসূচী। এই

> ৬-দফার রূপায়ণের মধ্যেই দেশ ও দশের সত্যিকার মুক্তি নিহিত। গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জনাব নজরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট দৃপ্তকণ্ঠে এই ঘোষণা করেন।
>
> প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিসের অসুস্থতা হেতু সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।
>
> পাকিস্তানের রাষ্ট্র জীবনের বিগত ১৯ বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিশেষ করিয়া ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পরবর্তী আমলের মৌলিক গণতন্ত্রের জামানা ও সর্বোপরি পাক-ভারত যুদ্ধের ১৭ দিনের অভিজ্ঞতার পটভূমিতে গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী এই কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট বারের সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান।
>
> ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগের ৬-দফার সমালোচকদের সমালোচনার জবাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে তাঁহার ৬-দফার দফাওয়ারী সহজ, সরল ব্যাখ্যা দিয়া ক্ষমতাসীনদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়া বলেন, "তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।" এক পর্যায়ে শেখ মুজিবের প্রশ্নের জবাবে সমগ্র কাউন্সিলর ও ডেলিগেট মণ্ডলী সমস্বরে হাত তুলিয়া ৬ দফার জন্য সংগ্রাম করিতে গিয়া যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ ঢাকার মতিঝিলস্থ হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এই কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবী' ছয়দফা কর্মসূচি পেশ করেন। এটি পেশ করার সময় বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে এক লিখিত বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য পাঠ করেন। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৯ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'দেশপ্রেমিক কে? ৬-দফার সমালোচকরা? 'ওরাতো বহুরূপী' : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে দেশবাসীর নিকট ৬-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের কৈফিয়ত'। দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তানের আজিকার অবস্থা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের হইত, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা যদি পূর্ব পাকিস্তানের হইত, তাহা হইলে 'আমরা কি করিতাম', দফাওয়ারীভাবে এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে

গতকল্যকার আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবর রহমান বলেন "এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উপর উভয় অঞ্চলের নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায়, তারা পাকিস্তানের দুশমন, যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তারই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবী নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী।"

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার বিরূদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছে। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ- হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি সনদ একুশ দফা দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মাধ্যেই এই শোষকদের দল ও তাহার দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

৬-দফার দাবী জাতীয় দাবী

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম

সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বানত হইয়াছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থ শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

ওরা বহুরূপী

কিন্তু এ-ও আমি জানি, জনগণের দুশমনের ক্ষমতা অসীম, তাঁহাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক। এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এরা আছেন সরকারী দলে; আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনীর বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরির্হাযতা, জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত: আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলীম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে- এ সব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরনো দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁহারা আতঁকাইয়া উঠেন, তাঁহারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীবাদী দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চাহেন।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন আইন সভাই ভাল, এ বিচার ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার-এই দুইটি বিষয়ে থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করত:

ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্তগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা-এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্লান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনে রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই-সেই বিষয়েই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয়ে দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'ষ্টেট' বলিয়াছি। হইাতে কায়েমী স্বার্থ শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'ষ্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেট ষ্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা' সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'ষ্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'ষ্টেট' ও কেন্দ্রকে

ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'ষ্টেট'। এরা যদি ভারত- ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'ষ্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেইবা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?"

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না; আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'ষ্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য এই একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনিদিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে ; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাপে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলিবে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোন অনিষ্টও হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাহাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটি সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ষ্টেট

ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই ; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ড প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ ষ্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থ মন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী ষ্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দুইখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাংকের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফার ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক

লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটাল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটাল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা জনগণের বিশেষত: পাট চাষীদের দুর্দশা- সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

'পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র'?

আমরা এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবে কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিইবা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁহারা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলে সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁহারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁহারা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাহাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তাহার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেইজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সেই টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোন হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎ কাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গেল ট্যাক্সেশনের দিকে

আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গেল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্র্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি-

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে;
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে;
৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা এই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।
৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানী চলিবে;
৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

১৮ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস কি বলে-

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩ নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে-

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই-এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকের কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ

নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালিরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

পাট চাষীদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট চাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরীব পাট চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া আর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে , তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। এ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট- চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ-দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাত করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব

পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ, ই-পি-আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করত: এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ-দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবীও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন? সরকার নিজ হাতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে- এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাহাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন, জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? এসব প্রশ্নের উওর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবী কি অন্যায়? এই দাবী করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে-

এক. তাহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবীও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবে।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য

পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এ-ও জানি যে, আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণ বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুনে শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ-বিজ্ঞানের কথা: সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় এ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইতো তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানের হইতো। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবী করার জন্য আমাদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইতো না।

তিন. আপনারা ঐ সব দাবী করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না।

আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিরে বরং পরকে কিছু দিয়াও দিই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে-

আমরা কি দিয়াছি

১. প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২. পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬ টাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবী করিয়াছিলাম।

৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আমরা কি দিতাম

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-সেখানে আমাদের দান করিবার তাকত ছিল আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চই দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত, তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁয়া দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি. আই. ডি. সি., আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি. আই. টি. আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের

রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যান আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এদের হাতে আমি কোন ছার?

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমরা সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরও অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থবাদীরা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এনজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুববিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে আমাদের নয়ন-মণি শেরে-বাংলা ফজলুর হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞানলাভ করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লার দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন

দান করেন। কাউন্সিল সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে ছয়দফা কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ সময় ছয়দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিলরগণ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে ২০ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন, দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ৬-দফা দাবীকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করিয়া উহাকে দলীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দানের জন্য কাউন্সিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। এই ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য সমগ্র পাকিস্তানে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য কাউন্সিল পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে।
>
> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মনে করে যে, ৬-দফার সত্যিকারের বাস্তবায়নের দ্বারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই মঙ্গল হইবে না, এতে গোটা পাকিস্তানেই বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাউন্সিল বিশ্বাস করে যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়াই সত্যিকারের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিবে এবং এর দ্বারাই দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন সাধিত হইবে।
>
> মতিঝিল ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (শনিবার) উপস্থিত ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দান করেন। কাউন্সিলে অনুমোদন প্রাপ্তির পর ৬-দফাকে আওয়ামী লীগের কার্যসূচীর (ম্যানিফ্যাষ্টো) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিল অধিবেশনে এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতাদান করেন। বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, সমগ্র পাকিস্তানে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা প্রণয়ন করেছে। এ সময় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, ছয়দফা দাবি শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রাণের দাবি, এই দাবি একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। উক্ত সভায় তিনি ছয়দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী

লীগ কর্মীদের চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্যও আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে একটি খবর ২০ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য : সভাপতি পদে নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিবর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে গতকাল (শনিবার) ঘোষণা করেন যে, সমগ্র পাকিস্তানের সার্বিক কল্যাণ সাধন, বিশেষ করিয়া সমগ্র দেশে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রণয়ন করিয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।
>
> নবনির্বাচিত সভাপতি আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে বলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ৬-দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আজ যে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছে, সে পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং এই পথে সাফল্য অর্জন সময় সাপেক্ষ। তবে, ৬-দফার বিরুদ্ধে আজ যেসব মহল দায়িত্বহীন প্রচারণায় লিপ্ত আছেন, একদিন না একদিন তারা তাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব নেতা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, অথচ ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা করিতেছেন, তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার আলোকে ৬-দফার বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, আওয়ামী লীগের ৬-দফায় শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনই দাবী করা হয় নাই, এতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও একই স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হইয়াছে। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ একদিন না একদিন ৬-দফা দাবীকে তাদেরও নিজেদের দাবী বলিয়াই মানিয়া লইবেন।
>
> শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, ৬-দফার প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। রাজনীতিতেও কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই। আওয়ামী লীগ কর্মীদের চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, এদেশে আওয়ামী লীগ সব সংগ্রামেরই বাণী প্রথম বহন করিয়াছে। সংগ্রামে তাহারা নির্যাতন ভোগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সংগ্রাম তাহাদের ব্যর্থ হয় নাই। ৬-দফার সংগ্রামও ব্যর্থ হইবে না। ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা এ সংগ্রামকেও আমরা সার্থক করিয়া তুলিব। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিরপুর রোডে ধানমণ্ডি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। অফিস উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সমবেত আওয়ামী লীগ কর্মীদের ছয়দফা দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি খবর ৩১ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'সাফল্য অর্জনের জন্য কর্মীদেরই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়: ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন প্রসঙ্গে শেখ মুজিব'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (বুধবার) ৯নং মীরপুর রোডে ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। উক্ত অফিস উদ্বোধন প্রসঙ্গে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ কর্মীদের ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। শেখ মুজিবর রহমান সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, যে-কোন সংগ্রামে সাফল্য লাভের জন্য রাজনৈতিক কর্মীদেরকেই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। যে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সব চাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করে, সে রাজনৈতিক দলই সংগ্রামে সব চাইতে বেশী সাফল্য অর্জন করে। নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনীই রাজনৈতিক দলের গৌরব। শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের আজ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রাম গতানুগতিক সংগ্রাম নয়। এ সংগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের বাঁচা-মরার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম দলবিশেষের সংগ্রাম নয়। এ সংগ্রামকে জন্ম ও মৃত্যুর মত সত্য হিসাবে গণ্য করিয়া কর্মীদের সাফল্য অর্জনের পথে আগাইয়া যাইতে হইবে। তিনি বলেন যে, কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিলে সাফল্য অবশ্যই অর্জিত হইবে।

ধানমণ্ডী আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে পূর্বাহ্নে জনাব আনোয়ার চৌধুরী শেখ মুজিবর রহমানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া একটি মানপত্র পাঠ করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহম্মদ দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দান করেন। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রফিকুল হোসেন ও জনাব ওবায়দুর রহমানও বক্তৃতা করেন।

১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল খুলনার রূপসা রেস্ট হাউস প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা বিশ্লেষণ করেন এবং কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৭ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'খুলনায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ : অদ্য অপরাহ্নে জনসভা'। খুলনা থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

আগামীকল্য (রবিবার) অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করিবেন। শেখ মুজিবর রহমানের উত্তর ও দক্ষিণ পক্ষ সফরের শেষ পর্যায়ে খুলনার এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অদ্য (শনিবার) বেলা ১০টায় শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া মোটরযোগে যশোর হইতে খুলনা পৌঁছেন। খুলনা শহর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে খালিশপুরে আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনসাধারণ নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেখ সাহেবের গাড়ী খুলনা পৌঁছিলে লোয়ার যশোর রোডে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার লোক '৬-দফা মানতে হবে, স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। জনতার চাপে শেখ সাহেবের গাড়ী চলা অসম্ভব হইয়া পড়িলে নেতৃবৃন্দকে গাড়ী হইতে নামিতে হয় এবং তাহারা প্রায় ১ মাইল জনতার সঙ্গে পদব্রজে গমন করেন।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা রূপসা রেস্ট হাউস প্রাঙ্গণে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং ৬-দফা আদায়ের সংগ্রামে খুলনা আওয়ামী লীগ কর্মীদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শেখ সাহেব কিছুক্ষণের জন্য উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্মীদের কাছে ৬-দফা বিশ্লেষণ করেন এবং কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সমগ্র শহরে ৬-দফা দাবীর সপক্ষে অসংখ্য পোষ্টার লাগান হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধানের সফর উপলক্ষে খুলনা শ্রমিক এলাকাসমূহেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

ছয়. ছয়দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন

ক. আওয়ামী লীগ

লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে ছয়দফা দাবী উত্থাপন করায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানানো হয় ও ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানানো হয়। লাহোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রশংসা করা হয়। সেই সঙ্গে ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য জনগণকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল

কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ ভূমিকার প্রতি অভিনন্দন'। দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস থেকে প্রেরিত এই রিপোর্টে বলা হয়:

> চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আল হারুণ, দফতর সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান ও কোষাধ্যক্ষ জনাব জানে আলম দোভাষ অদ্য (রবিবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন : সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলন-এ যোগদানকারী আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতিনিধিরা যে সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন–তাহাতে ইহাই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করা বা ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করা আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য নয় অথবা ঘোলা জলে মাছ শিকার করার প্রবণতা আওয়ামী লীগের নাই।
>
> আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, প্রস্তাবিত লাহোর সম্মেলন 'যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন' ও যুদ্ধোত্তরকালের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাদি সত্যের কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেশকে বাস্তবানুগ নেতৃত্বদানের কর্মপন্থা নির্ধারিত করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লাহোর সম্মেলন যে সাম্প্রতিক তাসখেন্দ চুক্তির বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই আহূত হইয়াছিল– ইহাই প্রমাণ হইল। আমরা মনে করি, তাসখেন্দ চুক্তি সাম্প্রতিক পাক-ভারত ভয়াবহ যুদ্ধেরই ফলশ্রুতি। পাক-ভারত শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগ দলের বহু-আকাংখিত বিলম্বে হইলেও তাসখেন্দ চুক্তি পাক-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইবে। সুখের বিষয়, ভারতের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উঠিলে যাঁহারা তাহা বাঁকা চোখে দেখিতেন ও উহার প্রস্তাবকদের নিন্দা করিতেন, আজ তাঁহারাও তাসখেন্দ চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা। বিলম্বে হইলেও বাস্তবতার চাপে তাহাদের যে চক্ষু খুলিয়াছে ইহাই আশার কথা। আজ দেশের আপামর জনসাধারণ ইহাই বুঝিতে পারিয়াছে যে, কোন গুরুতর সমস্যারই (কাশ্মীর সহ) সমাধানের পথ বল প্রয়োগ নয়। আর পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধের বিলাসিতাও করিতে পারে না।
>
> লাহোর সম্মেলন এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিয়া তাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহাই প্রমাণ করিল যে, পূর্ব বাংলার সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব সঠিক পথেই পরিচালিত হইতেছে। তাই আমরা জনাব মুজিবর রহমান সাহেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করিব, লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক দাবীকৃত ছয় দফা, যথা পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন,

> আঞ্চলিক রক্ষাব্যবস্থা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি কায়েম করার জন্য দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

১৯৬৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ছয়দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিকভাবে একটি ফেডারেশন পদ্ধতির সরকার গঠন করে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন, আইন পরিষদের সার্বভৌমত্ব দান এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করে একটি নোটিস দেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিস'। রিপোর্টটি পরিবেশন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার। খবরটিতে বলা হয়:

> ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিকভাবে একটি ফেডারেশন পদ্ধতির সরকার কায়েম করিয়া পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন, আইন পরিষদের সার্বভৌমত্ব দান এবং বিশ্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবী জানাইয়া জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিস দিয়াছেন।
>
> আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সম্প্রতি ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এই নোটিস দিয়াছেন। প্রদত্ত নোটিসে জনাব চৌধুরী দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া অপরাপর সকল বিষয় ফেডারেশনের ইউনিটসমূহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছেন। তিনি ফেডারেশনের দুইটি ইউনিটের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুইটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানাইয়াছেন। পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে তিনি একমুদ্রা ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রস্তাবও করিয়াছেন। তবে, সেই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক বিধান করিয়া ইউনিটসমূহের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা দাবী করিয়াছেন। জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি প্রবর্তন করার দাবী জানাইয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, সকল প্রকার শুল্ক ও কর ধার্য করার একচেটিয়া অধিকার ফেডারেশনের ষ্টেটসমূহের হাতে থাকিবে এবং ফেডারেল সরকারের সরাসরি কোন শুল্ক বা কর ধার্য করার

অধিকার থাকিবে না। ফেডারেল সরকারে ব্যয় নির্বাহের জন্য ফেডারেল সরকার ষ্টেট সমূহের শুল্ক ও করের একটি অংশ লাভ করিবে বলিয়া তিনি প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ষ্টেটসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি সঙ্গত হিসাব মতে ফেডারেল সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য এই অর্থ যোগান দিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য প্রশ্নে ফেডারেশনের ষ্টেট সমূহের জন্য পৃথকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব রক্ষণ এবং আহরিত বিদেশী মুদ্রা আহরণকারী ষ্টেটের এখতেয়ারে দান করার জন্য তিনি তাঁর প্রস্তাবে দাবী জানাইয়াছেন। ফেডারেল সরকারের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা আপোষে স্থিরীকৃত কোন হারে ষ্টেটসমূহ মিটাইবে বলিয়া তিনি প্রস্তাবে উল্লেখ করেন।

দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি শুল্ক ও টেরিফের বিধি-নিষেধ মুক্ত অবস্থায় ফেডারেশনের ইউনিটগুলির মধ্যে অবাধে যাতায়াতে বিধান করার জন্যও তিনি প্রস্তাব করিয়াছন। ষ্টেটসমূহের স্বার্থে বাণিজ্যিক আলাপ-আলোচনা করার জন্য বিদেশে নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণের শাসনতান্ত্রিক এখতিয়ার ষ্টেটসমূহকে দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন।

আঞ্চলিক অখণ্ডতার নিরাপত্তা বিধান এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিরক্ষার জন্য ষ্টেটসমূহকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রক্ষণের শাসনতান্ত্রিক এখতিয়ার দানের জন্যও তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে একটি সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানা, বিমান বাহিনী কলেজ, সামরিক কলেজ এবং নৌ-একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া তিনি অপর একটি প্রস্তাব উত্থাপনেরও নোটিস দিয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এ,এইচ,এম কামরুজ্জামান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, শেখ মুজিব যে ছয়দফা সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা দেশের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তির সুস্থিরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত। তিনি ধীরস্থিরভাবে প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে ২৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবের ৬-দফা জাতীয় পরিষদ সদস্যের পূর্ণ সমর্থন'। রাজশাহী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান শেখ মুজিবের ৬ দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া ধীরস্থিরভাবে প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।
>
> এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব যে ছয় দফা সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা দেশের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তির সুস্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে ঐক্য ও সংহতি আরও মজবুত করিতে হইলে উভয় অঞ্চলকেই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্যই দেশে প্রকৃত ফেডারেল ধরনের সরকার গঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। উপরন্তু পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের সুষম উন্নয়নের মধ্যেই জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার আদর্শ বিদ্যমান।
>
> কোন কোন মহল পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবের ৬-দফা প্রস্তাবের অপব্যাখ্যা করলে বরিশালের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও গণমানসে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। স্থানীয় রাজনীতিকগণ বলেন যে, এই ৬-দফা প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রাণের দাবী এবং এই দাবী অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।

পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সভায় ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সভায় বক্তাগণ ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য গণতন্ত্রের সাধক মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ ভূমিকার ওপরও আলোচনা করেন। ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পাবনা আঃ লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প'। সিরাজগঞ্জ থেকে টেলিগ্রামে প্রাপ্ত এই খবরটিতে বলা হয়:

> এখানে জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের এক সভায় শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া উহা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়।
>
> সভায় জনাব আমজাদ হোসেন, আলহাজ সৈয়দ আকবর আলী, জনাব মনসুর আলী এবং অন্যান্য বক্তা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ দেশের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য গণতন্ত্রের সাধক মরহুম জনাব হোসেন সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ ভূমিকার উপরও আলোচনা করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, লেভী প্রত্যাহার ও বিভিন্ন কর রহিতকরণের জোর দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ মাহমুদকে প্রহারের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদানের দাবী জানান হয়।

রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলারদের এক সভায় ছয়দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প: রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভায় প্রস্তাব গ্রহণ'। রংপুর থেকে টেলিগ্রামে প্রাপ্ত এই খবরটিতে বলা হয়:

গতকল্য স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টার হলে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। সভায় জরুরী অবস্থা ও লেভী প্রত্যাহার এবং নওয়াবজাদা নসরুল্লাহসহ ধৃত অন্যান্য নেতার আশু মুক্তি দানের দাবীতে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে উহাদের শাস্তিদানের দাবী জানান হয়।

সভায় রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। নিম্নে নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম প্রদত্ত হইল : শাহ আবদুল হামিদ–সভাপতি, ডাঃ আবদুল হামিদ, জনাব রফিকুল ইসলাম উকিল, জনাব আফসার আলী, জনাব রিয়াত উদ্দীন আহমদ ও ডাঃ এস, রহমান–সহ সভাপতি; জনাব নূরুল হক এডভোকেট– সাধারণ সম্পাদক। জনাব লুৎফর রহমান, জনাব শামসুল হক, জনাব আবুল হোসেন ও গাজী রহমান উকিল–সহ সম্পাদক, শেখ আমজাদ হোসেন–দফতর সম্পাদক; জনাব মজিবর রহমান–সাংগঠনিক সম্পাদক; জনাব আউয়াল কোষাধ্যক্ষ। কার্যকরী পরিষদে আরও ১৮ জন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে'।

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় ছয়দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৫ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার প্রতি : সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সমর্থন'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় শেখ মজিবুর রহমানের ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এবং উক্ত ৬-দফা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ এবং উক্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী করা হয়। সভার অপর এক প্রস্তাবে অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়।

সভার অন্যান্য প্রস্তাবে আগামী ১৩ ও ১৪ই মার্চ জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও সিলেট শহরের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহে দুইদফা ক্লাস চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

ছয়দফা প্রস্তাবের প্রতি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ৯ মার্চ এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার প্রতি ছাত্রলীগের অকুণ্ঠ সমর্থন'। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ ১৯ বৎসর পরেও ইহার সুফল হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, অবহেলিত প্রদেশবাসী সাম্প্রতিক যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬-দফা প্রস্তাবের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাইয়াছে, তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এক বিবৃতির মারফতে এই ৬-দফা মুক্তি সনদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়া দেশবাসীর নিকট ইহাকে কামিয়াবী করার আহ্বান জানাইয়াছে।

এই সম্পর্কে ছাত্রলীগের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেই লাহোর প্রস্তাবের প্রতীক ক্ষমতাসীন মহলের দুরভিসন্ধিমূলক অবহেলা ও উপেক্ষা পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনকে নিদারুণ বিপর্যয় ও নির্মম বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়াছে। হাজার মাইলের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন দুইটি অঞ্চলের সমন্বয়ে সৃষ্টি দেশ পাকিস্তানের অসাধারণ ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপরেখা হিসাবেই ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাব সুচিন্তিতভাবে প্রণীত ও গৃহীত হইয়াছিল।

লাহোর প্রস্তাব উপেক্ষার পরিণতি

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেই লাহোর প্রস্তাবের প্রতি ক্ষমতাসীন মহলের অবহেলা ও উপেক্ষা পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনে এক নিদারুণ বিপর্যয় ও নির্মম বিড়ম্বনার সূত্রপাত করে। লাহোর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া শক্তিশালী এক কেন্দ্রীক শাসন চাপানোর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পাকিস্তানের শুরুতেই দেশের দুই অঞ্চল ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের যে বিষবৃক্ষের অংকুরোদগম ঘটিয়াছিল, স্বাধীনতার ১৭ বৎসর অতিক্রম না হইতেই জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া দুঃসাধ্য সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক জীবনে যে বৈষম্য রহিয়াছে, উহাও দুই অঞ্চলের মধ্যে ইতিমধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছে।

এই ভুল বুঝাবুঝি ও তিক্ততা দেশের অনুন্নত ও জাতীয় ঐক্যের প্রতি মারাত্মক বিপদ হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই ইহার প্রতি উদাসীন থাকা কোন দেশপ্রেমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই দুরবস্থার অবসান দেশপ্রেমিক মাত্রেরই কাম্য।

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়াই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পৃথক অর্থনৈতিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশরক্ষা ব্যবস্থার দাবী তুলিয়াছে। কারণ ছাত্রলীগ মনে করে, দেশ ও জাতির ঐক্য ও সংহতির স্বার্থেই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উন্নয়ন আবশ্যক।

খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজীজের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় ছয়দফা দাবীর ব্যাখ্যা করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : '৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন: খুলনা সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভার প্রস্তাব'। এতে বলা হয়:

> গতকাল বিকাল ৪টায় খুলনা শহরের বাবু খান রোডে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজীজের সভাপতিত্বে সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা হয়। সভাপতির ভাষণে শেখ আবদুল আজীজ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ভূমিকা ও ৬-দফা দাবীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন। সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর হামলার নিন্দা ও সাজাপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

> ঘটনাবলী সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত, লেভী প্রথার প্রত্যাহার ও কৃষিঋণ মওকুফের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৬৬ সালের ১৪ মার্চ সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন এবং জনসভা উপলক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ১৫ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সিলেটে মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা'। এতে বলা হয়:

> সিলেট, ১৪ই মার্চ- জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন এবং জনসভা উপলক্ষে আজ সকালে শেখ মুজিবর রহমান এখানে আসিয়া পৌঁছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। শেখ মুজিবের সঙ্গে এডভোকেট আবদুল মোমিনও এখানে আগমন করেন।
>
> শেখ মুজিবকে সঙ্গে করিয়া পরে এক শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রীরা ৬ দফার সমর্থনে আওয়াজ তোলে।
>
> আজ জেলা আওয়ামী লীগের তৃতীয় অধিবেশনে ঢাকা হইতে আগত নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ৬ দফা আদায়ের জন্য এডভোকেট আবদুল মোমিন কাউন্সিলারদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

নেত্রকোনা পাবলিক হলে জনাব খালেক দাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনে ছয়দফা কর্মসূচী ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। ১৫ মার্চ ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার দাবী'। এতে বলা হয়:

> সম্প্রতি স্থানীয় পাবলিক হলে জনাব খালেক দাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে নেত্রকোণা মহকুমা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল খালেক ৬-দফা কর্মসূচী ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন জনাব নূরুল ইসলাম খান। সভার প্রস্তাবাবলীতে ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, দেশের জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। এক প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৬৬-৬৮ সালের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়। সভাপতি এডভোকেট জনাব আবদুল মোমেন, সহ-

সভাপতিবৃন্দ জনাব নূরুল ইসলাম খান, জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ এম,বি-বি,এস, জনাব আবদুল জব্বার আন্‌সারী; সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক; সহসাধারণ সম্পাদকবৃন্দ মৌলানা ফজলুর রহমান খান, জনাব হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী, জনাব সেকান্দার আলী খান; সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব আবুল হাশেম খান; কোষাধ্যক্ষ জনাব খালেক দাদ চৌধুরী। ইহাছাড়া ১৮ ব্যক্তিকে লইয়া এই কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজীজের সভাপতিত্বে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ শতাধিক কাউন্সিলর সদস্য ও প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৫ মার্চ ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ছয়দফা কর্মসূচীর মধ্যেই মুক্তি নিহিত, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের ঘোষণা'। খুলনা থেকে টেলিফোনে প্রাপ্ত এ খবরটিতে বলা হয়:

আজ কাল ১১টায় স্থানীয় পৌরসভা মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজীজের সভাপতিত্বে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন এলাকা হউতে পাঁচ শতাধিক কাউন্সিল সদস্য যোগদান করেন্ সভাপতির ভাষণে শেখ আবদুল আজীজ দেশে সামরিক শাসন কায়েম ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পটভূমি তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর মধ্যে নির্যাতিত পূর্ববঙ্গবাসীর মুক্তি নিহিত। সভায় বিদায়ী জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, খুলনা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মমিনউদ্দিন আহমদ নবনির্বাচিত জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মনসুর আহমদ এডভোকেট ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ আবদুল আজীজকে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি, জনাব আলী হাফিজ, ডঃ মজিবর রহমান এম-বি-বি-এস ও জনাব আফসার উদ্দিন আহমদকে সহ-সভাপতি, জনাব মনসুর আহমদ এডভোকেটকে সম্পাদক জনাব এনায়েত আলীকে (উকিল) সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব একরামূল হককে (উকিল) প্রচার সম্পাদক, জনাব মনসুর আহমদ বি-একে দফতর সম্পাদক, জনাব মোশাররফ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম ও শেখ ওয়াজেদ আলীকে সহ-সম্পাদক, শেখ শাহাবুদ্দিনকে কোষাধ্যক্ষ ও ১৮ জন কার্যকরী সংসদ সদস্য এবং আসন্ন পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্য ৪৫ জন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন সকল রাজবন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার সকল সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর হামলার নিন্দা ও সাজাপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলরের অপসারণ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও লেভী প্রত্যাহার দাবী করিয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে খুলনা শহর ও পল্লী অঞ্চলে মহামারী আকারে কলেরা ও বসন্ত রোগ দেখা দেওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হয়।

১৯৬৬ সালের ১৫ মার্চ কুষ্টিয়ায় জনাব কফিলউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৭ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফা আদায়ের সংগ্রাম তীব্রতর করার সংকল্প, প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ'। কুষ্টিয়া থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

সম্প্রতি জনাব কফিলউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অত্র জেলা লীগের সভাপতি জনাব কফিলউদ্দীন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব সা'দ আহমদসহ বিভিন্ন বক্তা শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার দাবী জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রণীত এবং আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, জরুরী অবস্থার আশু প্রত্যাহার, রাজবন্দীর মুক্তি, লেভীর হাত হইতে কুষ্টিয়াকে মুক্তি দান, লেভী সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরীহ জনসাধারণের উপরে যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা ও ওয়ারেন্ট চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অধিবেশনে ডাঃ আহসানুল হককে সভাপতি, জনাব স'াদ আহমদকে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব ইব্রাহিম হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া নূতন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

ডবলমুরিং (চট্টগ্রাম)

গত রবিবার চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এমআর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ডবলমুরিং থানা আওয়ামী লীগ কর্মী

সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ জনাব আবুল কাশেম, জেলা লীগ সভাপতি ও সম্পাদক শেখ মজিবের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী আদায়ের জন্য সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মী সম্মেলনে জনাব জামশেদ আহমদ চৌধুরীকে সভাপতি জনাব আমিনুল হককে সম্পাদক এবং জনাব মোহাম্মদ শফিকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া ডবলমুরিং থানা আওয়ামী লীগের নূতন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

ইউ সি সদস্যের আওয়ামী লীগে যোগদান

পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবী ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া মুক্তাগাছা থানার মানকোন ইউ,সি-এর সদস্য জনাব মোঃ আবদুল করিম আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদান প্রসংগে এক বিবৃতিতে তিনি সকল দেশপ্রেমিক কর্মীকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানাইয়া পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদ ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করার আকুল আবেদন জানান।

১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ খুলনা শহর আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ছয়দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং ছয়দফা বাস্তবায়নে সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের প্রতিশ্রুতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯ মার্চ ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক ৬-দফার মধ্যেই বঞ্চিত মানুষের মুক্তি নিহিত, খুলনা শহর আওয়ামী লীগ সম্মেলনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব'। ইত্তেফাকের খুলনা অফিস থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

গতকল্য ইকবাল নগর কমিউনিটি সেন্টার হলে খুলনা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোমিনউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে খুলনা শহর আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ আবদুল আজিজ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং গণতান্ত্রিক ভূমিকার উপর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব মনসুর আলী, প্রাক্তন সম্পাদক জনাব সালাহউদ্দিন, ডাঃ আশরাফ হোসেন খান, জনাব শেখ ইউনুস আলী, জনাব আবদুল গফ্ফার ও শহর আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম, এ বারী প্রমুখ ভাষণ দান করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব মোমিন উদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ ভূমিকার বিশদ বিবরণ

দেন। তিনি বলেন, বিগত ১৮ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই বঞ্চিত মানুষের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। সভায় মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সমস্ত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব আবদুল খালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাসখেন্দ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী, আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও উহার বাস্তবায়নের সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের প্রতিশ্রুতি, বিনাবিচারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর আশু মুক্তি ও তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মামলা প্রত্যাহার, চালনা বন্দরকে একটি পূর্ণ বন্দরের মর্যাদাদান, লেভী প্রথা প্রত্যাহার ও কৃষি ঋণ মওকুফ, খুলনা পৌর এলাকার কবরখানার আশু সংস্কার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওসমান গণির অপসারণ, শহরে কলেরা মহামারী রোধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, খুলনা পৌর এলাকার শহরবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি পৌর-কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার চরম নিন্দা, হুকুম দখলের ফলে গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ দান, খুলনা পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহরবাসীগণের উপর ধার্য বঞ্চিত কর হ্রাসের দাবী এবং শহরবাসীর প্রতি স্থানীয় পৌর-কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার ঘোর নিন্দা করিয়া তাহাদের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই সভা খুলনা পৌর হলে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল এবং যথারীতি অনুমতিও লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পৌর কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রত্যাহার করেন। সভার বিভিন্ন বক্তাগণ পৌর কর্তৃপক্ষের এহেন মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবেও ইহার দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করা হয়।

সভায় জনাব মোমিন উদ্দিন আহমদকে সভাপতি; মেসার্স এমএ ওহাব, ডাঃ আশরাফ হোসেন, আবু তালেব ইমদাদুল ইসলামকে দফতর সম্পাদক; মেসার্স মোঃ ইলিয়াস, আবুল হাশেম এবং মাসুদুর রহমানকে সহকারী সম্পাদক এবং জনাব এমদাদুল হককে কোষাধ্যক্ষ করিয়া আগামী দুই বৎসরের জন্য মোট ৩২ জন সদস্য সমন্বয়ে খুলনা শহর আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি খুলনা শহরের অনুমান চারিশত কাউন্সিলার ও ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ পাবনা টাউন হলে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় ছয়দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে শপথ গ্রহণ করা হয়। এ

সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা'। পাবনা থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতার পরিবেশিত এই রিপোর্টে বলা হয়:

> গত ১৩ই মার্চ বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে পাবনা টাউন হলে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আমজাদ হোসেন। জেলার দূর-দূরান্ত হইতে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি ও কাউন্সিলর সভায় যোগদান করেন।
>
> কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখপূর্বক জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্ট পেশ করা হয়। সভায় ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থনের বিষয় পুনরুল্লেখ এবং উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৬ সালের ২৫ মার্চ সিরাজগঞ্জ কলেজ ময়দানে ছয়দফার দাবীতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার। জনসভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, ছয়দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ম্যাগনাকার্টা স্বরূপ। নেতৃবৃন্দ মহকুমার প্রতিটি দূরতম এলাকায় ছয়দফার বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৭ মার্চ ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানীদের ম্যাগনাকার্টা স্বরূপ, সিরাজগঞ্জের জনসভার রায়'। সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিগ্রামে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> অদ্য এখানে কলেজ ময়দানে ৬-দফার দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার।
>
> সভায় ৬-দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দান করেন মেসার্স গোলাম রসুল, দবির উদ্দীন আহমদ, আবদুল মোমেন তালুকদার ও ডাঃ জসিম উদ্দীন প্রমুখ নেতা।
>
> সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব আবদুল মোমেন তালুকদার ৬-দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন এবং ৬-দফা আদায়ে জনসাধারণকে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানান। ৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এতদঞ্চলের জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

> জনাব দবির উদ্দীন আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতির বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করেন।
>
> ডাঃ জসিম উদ্দীন আহমদ বক্তৃতা দানকালে ৬-দফার প্রতি সমর্থন জানাইয়া বলেন যে, ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মেগনাকার্টা স্বরূপ। তিনি মহকুমার প্রতিটি দূরতম এলাকায় ৬-দফার বাণী বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।
>
> জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার সভাপতির ভাষণে ২১-দফা বাস্তবায়ন না করা সম্পর্কিত মওলানা ভাসানীর বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করিয়া এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন।
>
> সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। অপর প্রস্তাবে ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয় ও বিড়ি শ্রমিক অর্ডিন্যান্সের সমালোচনা করা হয়। সভায় টেণ্ডুপাতা ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও সিরাজগঞ্জে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান হয়। সভায় বর্ধিত কর হ্রাসেরও দাবী জানান হয়। বেকার বিড়ি শ্রমিক সহ সকল বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের জন্য সভায় দাবী করা হয়।

১৯৬৬ সালের ২৮ মার্চ জগন্নাথ কলেজ শাখার ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি মতিউর রহমান। সভায় ছয়দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি আদায়ে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান হয়। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ২৯ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী ছাত্রলীগের জগন্নাথ কলেজ শাখার বার্ষিক সম্মেলনে ৬-দফার প্রতি সমর্থন'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> জগন্নাথ কলেজে গতকাল (সোমবার) অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের জগন্নাথ কলেজ শাখার বার্ষিক সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি মতিউর রহমান। সভায় প্রদেশে ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় বক্তাগণ পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর, ৬-দফার প্রতি সমর্থন-ছাত্র সমাজের উপর শোষণের অবসান ও বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পূরণ করার আহ্বান জানান। কলেজ ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি রাজিউদ্দিন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের

সাধারণ সম্পাদক সোলেমান মণ্ডল, কায়েদে আজম কলেজের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সুলতান আহমদ, শহর ছাত্রলীগের সভাপতি ওহিদুর রশিদ মুরাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, জিয়াউল হক, কলিমুর রহমান প্রমুখ ছাত্রনেতা সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি মজহারুল হক বাকী।

দশ সহস্রাধিক ছাত্র বিশিষ্ট জগন্নাথ কলেজের বিভিন্ন ছাত্রী বাসের ৭টি শাখার কয়েকশত প্রতিনিধি ও বহু অতিথি সম্মেলনে যোগদান করেন। ছাত্র সমাজ ও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্বলিত অসংখ্য পোষ্টার দ্বারা সম্মেলন কক্ষ ও কলেজ প্রাঙ্গণ মনোরম ভাবে সজ্জিত করা হয়।

সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানীদের অগ্রাধিকার দান, পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তর, ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক দণ্ডিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিসের গুলী বর্ষণের নিন্দা, কুষ্টিয়া ও পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদ, জগন্নাথ কলেজে নৈশ এম, এ, ক্লাস প্রবর্তন দাবী এবং কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি আল মোজাহেদীর পিতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

কলেজ ছাত্রলীগ শাখার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সন্ধ্যায় "সূর্য সৈনিক" নামে একটি গীতি নক্শার আয়োজন করা হয়। সুখেন্দু চক্রবর্তী, মোরাদ আলী, আইয়ুব আলী, কণা প্রমুখ শিল্পী গীতি নক্শায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় এম, এ রেজাকে সভাপতি, সিরাজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক ও নাজিমুদ্দিন আহমদকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করিয়া কলেজ শাখার নয়া কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়।

১৯৬৬ সালের ২৮ মার্চ ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন মোল্লা ছয়দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেন। ছয়দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য নেতা কর্মীদের তিনি আহ্বান জানান। ৩০ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: ৬-দফার সমর্থনে বিপুল সাড়া: যেকোন ত্যাগ স্বীকারের সঙ্কল্প'। ফরিদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকল্য এখানে জনাব আদেল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা

> আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা সভায় শেখ মুজিবের ছয় দফা বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তান তথা সারা পাকিস্তানের জনগণের ম্যাগনা কার্টা বা বড় সনদ নামে অভিহিত করেন।
>
> তিনি বলেন যে, ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের জীবন মরণ সমস্যা। তাই ইহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানের জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।
>
> যাহারা জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধিতা করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে ঐক্যজোট গঠনের জন্যও তিনি আবেদন জানান।
>
> মেসার্স সৈয়দ হায়দার হোসেন, গাজী আবদুল হাকিম, বাবু চন্দ্রবালা, মজিবর রহমান খান, কাজী খলিলুর রহমান, আলীমুজ্জামান চৌধুরী, মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। তাহারা সকলেই ছয় দফার ভিত্তিতে গণআন্দোলন শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
>
> তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাম্প্রতিক উক্তির সমালোচনা করেন।
>
> সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিবরের নির্বাচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।
>
> সভায় নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান সহ সকল আটক বন্দীর মুক্তি এবং লেভী প্রথা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

১৯৬৬ সালের ৩০ মার্চ বাগমনিরাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন দরগাহ ময়দানে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে ছয়দফা প্রস্তাবের মধ্যে ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা বিধানের দাবি জানানো হয়। উক্ত সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক ও শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ ছয়দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের 'গৃহযুদ্ধ', 'অস্ত্রের ভাষা', বৃহত্তর বাংলা' প্রভৃতি ধরনের উক্তির তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে অনুরূপ বক্তৃতা-বিবৃতি বন্ধেরও দাবি জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'শক্তিশালী কেন্দ্র নয়- শক্তিশালী পাকিস্তান চাই' আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে জহুর চৌধুরী'। ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস থেকে প্রাপ্ত এই খবরে বলা হয়:

> '৬-দফা সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর জীবন-মরণের প্রশ্ন। এ দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে।

অতীতের সমস্ত সরকারই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া চরমভাবে উপেক্ষা করিয়াছে। আজ তাই ৬-দফা প্রস্তাবের মধ্যে আমাদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানাইতেছি। শক্তিশালী কেন্দ্র নহে–শক্তিশালী পাকিস্তান আমরা এবং ইহা পাকিস্তানের উভয় আঞ্চলকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই সম্ভব। গত বুধবার বাগমনিরাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন দরগাহ ময়দানে আয়োজিত বিরাট কর্মী সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওযামী লীগের শ্রম সম্পাদক ও শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। যোগদান উপলক্ষে সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছয়দফা জাতির কল্যাণের পথপ্রদর্শক, তাই তিনি জাতির দুর্দিনে চুপ করে না থেকে জনতার কাফেলায় যোগ দেয়ার জন্যই আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। ১৯৬৬ সালের ১ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা জাতির পথ প্রদর্শক, আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে আমিনুল হক'। দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বরিশালের জনাব আমিনুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদানকালে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব চৌধুরী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত এবং পরে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা প্রস্তাবই পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণের পথ নির্দেশক। তিনি বলেন যে, বিগত যুদ্ধকালীন অবস্থা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, একমাত্র ৬-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রই দেশের দুইটি অংশকে অবিচ্ছিন্ন জাতি হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম। তিনি বলেন যে, জাতির দুর্দিনে চুপ করিয়া না থাকিয়া জনতার কাফেলায় যোগ দেওয়ার জন্যই তিনি আওয়ামী লীগের যোগদান করিয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল ছয়দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিহ হয়। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ৭ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের পথ-সভা'। রিপোর্টটি পরিবেশন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার। এতে বলা হয়:

বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল (বুধবার) বিকালে ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সব পথ-সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ কর্মিগণ আওয়ামী লীগের পুরানা পল্টনস্থ দফতরে সমবেত হন। অতঃপর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোষ্টার সহকারে মিছিল করিয়া তাহারা প্রথমে বায়তুল মোকাররমে এক পথ-সভায় মিলিত হন। হাজার হাজার লোক কর্মীদের বক্তৃতা শোনার জন্য এই সভায় যোগদান করেন। কর্মিগণ এই সভায় ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এই পর্যায়ে জনসাধারণও কর্মীদের সহিত মিছিলে শামিল হয়। ফলে ক্ষুদ্র কর্মী মিছিল শেষ পর্যন্ত এক বিরাট গণ-মিছিলের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৬৬ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রংপুর থেকে মোটরযোগে দিনাজপুর পৌঁছেন। দিনাজপুরে এসে পৌঁছলে এখানকার হাজার হাজার জনতা ৬-দফার সমর্থনে স্লোগান দেয় এবং উপস্থিত জনসাধারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নজিরবিহীন বীরের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ছয় দফা প্রসঙ্গে দিনাজপুরবাসী বলেন, এই জেলার জনসাধারণ ৬-দফাকে যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণভাবে আজ তারা ৬-দফার প্রণেতাদের সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১১ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'উদ্বেল জনতা'। এতে বলা হয়:

নির্যাতিত মানুষের মুক্তি-সনদ ৬-দফার প্রণেতাদের সফরকে কেন্দ্র করিয়া দিনাজপুর জেলার গ্রামে-গঞ্জে-নগরে-প্রান্তরে যে অভূতপূর্ব স্পন্দন জাগিয়াছিল–নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আজ তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শেখ মুজিব ও তাঁহার দলবল আজ রংপুর হইতে মোটরযোগে দিনাজপুর আগমন করিলে জনসাধারণ তাঁহাদের বীরের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের অভিনবত্বে ও সমবেত জনতার সংগ্রামী আন্তরিকতায় এই সম্বর্ধনা দিনাজপুরে এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

দিনাজপুরের উপকণ্ঠে শহরের দ্বারপ্রান্তে নেতাদের প্রথম সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রংপুর হইতে দিনাজপুরের পথে এখানে পৌঁছিলে হাজার হাজার নাগরিক ৬-দফার সমর্থনে গগন বিদারী স্লোগান দিতে থাকে। ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিব ও অপরাপর আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দের সম্মানার্থ এখানে তাঁহারা ৬-দফার প্রতীক ৬টি তোপধ্বনি করেন। পরে দিনাজপুর হইতে দুই মাইল দূরে সুইহারীতে তাঁহাদের পুনর্বার সম্বর্ধনা জানান হয়। এখানে জনসাধারণ জাতীয় নেতা মরহুম

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, গণতন্ত্র ও আওয়ামী লীগের নামে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করেন।

এখান হইতে দিনাজপুর শহর পর্যন্ত দুই মাইল পথের কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। পথ তো নয় যেন জনস্রোত। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য উত্তরসূরীদের এক নজর দেখার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের যেন অন্ত নাই। আর এই জনস্রোতের মধ্যে নেতৃবৃন্দের মোটর মিছিলও একাকার।

কেবলমাত্র কৃষক-শ্রমিক নয়; সুশৃংখল যুবক কর্মীরাও আসিয়াছেন নেতাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য। আর তাঁহাদের সম্বর্ধনার ধরনও অভিনব। তাঁহারা অসিয়াছেন সুসজ্জিত ব্যাণ্ড লইয়া। আর তাঁহাদের সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে সংগ্রামের বাণী।

সুইহারী হইতে দিনাজপুর শহর পর্যন্ত পথে পথে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের মিছিলের উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেন। এইভাবে স্থানীয় ডাকবাংলোয় পৌঁছিলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এখানে ব্যাণ্ড পার্টির কর্মীদের সহিত নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। শেখ সাহেব তাঁহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া কিছু অর্থ পুরস্কার দেন।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিলে তাঁহারা বলেন, আওয়ামী লীগ নেতাদের যে নজীরবিহীন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে–তাহা পাকিস্তানের গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য লেফটেন্যান্টদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধেরই অভিব্যক্তি। তাঁহারা বলেন, এই জেলার জনসাধারণ ৬-দফাকে যেমন আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন–তেমনই আন্তরিকতাপূর্ণভাবে আজ তাঁহারা ৬-দফার প্রণেতাদের সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ১২ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক পরিষদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের ছয়দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং ছয়দফার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নানারকম উস্কানিমূলক বক্তব্যের নিন্দা করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৪ এপ্রিল ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিন, কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভায় কর্মীদের প্রতি আহ্বান'। কিশোরগঞ্জ থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় :

> গত শুক্রবার অত্র মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক পরিষদের এক বর্ধিত

> সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ইহা ছাড়া কার্যনির্বাহক পরিষদ আগামী ২৯ শে এপ্রিল এখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠানের এবং সভায় বক্তৃতা করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানসহ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া কর্তৃপক্ষের উস্কানিমূলক বক্তৃতা বিবৃতির নিন্দা করা হয়।

১৯৬৬ সালের ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের মিরশ্বরাই থানা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। ২২ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মিরশ্বরাই কর্মী সম্মেলনে ৬-দফা বাস্তবায়নের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ'। এতে বলা হয়:

> সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে মিরশ্বরাই থানা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫ শতাধিক কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এম, এ, আজিজ, সহ-সভাপতি সৈয়দ ফজলুল হক, অফিস সম্পাদক জনাব এম,এ হান্নান, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রহমতউল্লাহ চৌধুরী ও জনাব মুনীর হোসেন। সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক অবস্থাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় এবং ছয় দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সংকল্প প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে বিশিষ্ট ন্যাপ নেতা জনাব মুনীর হোসেন তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁহার আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। জনাব নিজামউদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে সভাপতি, জনাব আবুল খায়ের এল, এল, বিকে সহ-সভাপতি, জনাব আলতাফ হোসেনকে সম্পাদক, জনাব মুনীর হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও জনাব আমিনুল হককে কোষাধ্যক্ষ করিয়া মিরশ্বরাই থানা আওয়ামী লীগ কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

১৯৬৬ সালের ২৫ এপ্রিল আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভায় ছয়দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ ও নিরঙ্কুশ সমর্থন জ্ঞাপন করে ছয়দফা প্রস্তাবকে পাকিস্তানের গণশক্তির 'মুক্তি সনদ' বলে অভিহিত করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৬ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পল্টনের প্রস্তাবাবলী'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

গতকাল (রবিবার) আউটার ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিরাট জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রণীত এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ৬-দফা প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ ও নিরঙ্কুশ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং ৬-দফা প্রস্তাবকে পাকিস্তানের গণশক্তির 'মুক্তি সনদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ছয় দফার রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিবর্তে শেখ মুজিবর রহমানকে অযথা হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর হইতে সর্বপ্রকার মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া জনসভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৬ সালের ৬ মে লালবাগ ইউনিয়ন ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকসহ ৪ জন বিশিষ্ট ন্যাপ কর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং খুলনার এন,ডি,এফ কর্মী শেখ তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা দিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, ৬-দফা দাবী আদায়ের দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েই তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৭ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগে যোগদান'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

লালবাগ (নবাবগঞ্জ) ইউনিয়ন ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম আরও ৪ জন বিশিষ্ট ন্যাপ কর্মীসহ আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদান প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, ৬-দফা দাবী আদায়ের দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহারা আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। আওয়ামী লীগে যোগদানকারী ৪ জন ন্যাপ সদস্য হইলেন: মেসার্স মোঃ হানিফ, আবদুর রশিদ; মোঃ আলাউদ্দীন এবং মোঃ সিদ্দিক।

এন,ডি,এফ কর্মীর আওয়ামী লীগে যোগদান

খুলনার এন, ডি, এফ কর্মী শেখ তাজউদ্দীন সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এন, ডি, এফ হইতে পদত্যাগ করিয়া আওয়ামী লীগের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত এবং পরে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভার অনুমোদিত ৬-দফা প্রস্তাবই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণের পথনির্দেশক। বিবৃতিতে তিনি বলেন: বিগত যুদ্ধকালীন অবস্থা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, একমাত্র ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রই দেশের দুই অংশকে একজাতি হিসেবে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম।

বিবৃতিতে শেখ তাজউদ্দিন আরও বলেন যে, দীর্ঘদিন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঘরে বসিয়া পত্রিকা মারফত বিবৃতি দিয়া রাজনীতি করার দিন শেষ হইয়াছে। জাতির দুর্দিনে চুপ করিয়া না থাকিয়া জনতার কাফেলায় যোগ দেওয়ার জন্যই তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করিতেছেন। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া দেশের এই দুর্দিনে কাজ করিয়া যাইবার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

খ. অন্যান্য সংগঠন

রাজনৈতিক দল ছাড়াও সারা দেশের বিভিন্ন সংগঠন ছয়দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট নিচে তুলে ধরা হলো।

লাহোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতি ১৯৬৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছয়দফা পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ছয়দফা দাবি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই কেবল ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ১৯৬৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষারই প্রতীক, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতির বিবৃতি'। এতে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র সংসদের সভাপতি জনাব আবু সোলায়মান মণ্ডল এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সাম্প্রতিক ৬-দফা সুপারিশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলন উপলক্ষে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান উদারভিত্তিক ফেডারেশন গঠনের দাবীতে যে সুস্পষ্ট ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, উহার প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ এই ছয়দফা প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার সত্যিকার প্রতিচ্ছবি বিধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রস্তাবের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্য ও সংহতি আরও মজবুত করিতে হইলে উভয় অঞ্চলকেই সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই জন্যই দেশে প্রকৃত ফেডারেল ধরনের সরকার গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। উপরন্তু পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের সুষম উন্নয়নের মধ্যেই জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাবাবেগের দ্বারা কখনই জাতীয় সংহতি বা অখণ্ডতা অর্জন করা যাইবে না।

তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন, এই প্রসঙ্গে কাউন্সিল মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব সফিকুল ইসলাম ও জামাত-ই-ইসলাম প্রধান যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহারা নিজেদেরই প্রকৃত পরিচয় তুলিয়া ধরিয়া দেশবাসীর একটি পরম উপকারই করিয়াছেন।

খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির ৩২জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানান। বিবৃতিতে তারা দেশের স্বার্থে ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে চান তাদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'খুলনার আইনজীবীদের মতে, ছয়-দফায় জনগণের প্রাণের দাবী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে'। এতে বলা হয়:

> সম্প্রতি লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান যে ৬-দফা প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের প্রাণের দাবীই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই এই অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতিটি স্তরে এই দাবীর বাস্তবতা তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে।
>
> খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির ৩২ জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন: বিগত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ছিল মুখ্য ও প্রধান এবং নির্বাচনের ফলাফল ২১-দফা দাবীর প্রতি এই অঞ্চলের জনসাধারণের সমর্থন সমস্ত বিতর্কের সমাধা করিয়াছিল। নির্বাচনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র ও কুচক্রান্ত পূর্ব পাকিস্তানীদের ঐক্য বানচাল করিবার ব্যাপক চেষ্টা পায়। প্রদেশে ৯২-ক ধারা জারি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘোলাটে ও কলুষিত করিবার প্রচেষ্টারই নামান্তর ভিন্ন আর কিছু নয়। ইহা প্রদেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। পরিশেষে সামরিক আইন জারি করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এদেশের গণসচেতনতাকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবী উত্থাপনে যাহাদের গাত্রদাহ হইয়াছে তাহাদের এদেশের জনসাধারণ ভাল করিয়াই চিনে। দেশের রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে যাহারা নূতনরূপে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ

> হইয়া আজিকার গণচেতনাকে পুরাতন ও মরিচাধরা জিকির তুলিয়া বা ফতোয়া জারি করিয়া বিভ্রান্ত করিতে চায়, তাদের প্রতি দেয়ালের লিখন পড়িবার আবেদন জানাই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিভিন্নমুখী প্রবঞ্চনার ইতিহাস বর্তমান সরকার এখন সরকারীভাবে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হইয়াছেন। যাহারা পূর্ব পাকিস্তানীদের ভয় দেখাইয়া পাকিস্তানের এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের উপনিবেশ রূপে দেখিতে চায়, তাঁহাদের বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। যদিও আজ দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হইয়াছে, রাজনীতি ক্ষেত্রে জনগণের মতামত মূল্যহীন হইয়াছে, তবুও দেশের স্বার্থে ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিতে চান, তাঁহাদের প্রতি আমাদের আবেদন, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার সংগ্রামে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। অন্যথায় সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিষ্যতেই চরম দুর্যোগপূর্ণ জটিলতার সৃষ্টি হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান সাহেবও এক জনসভায় এই দাবীর মূল নীতির উপর সমর্থন দান করিয়াছেন। আমরা মনে করি, শেখ মুজিবরের পূর্ব পাকিস্তানীদের ৬-দফা দাবীর মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীদের আশা-আকাঙ্খা মূর্ত হইয়াছে এবং শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই দাবী বিকশিত হওয়ায় প্রদেশবাসীর মধ্যে উজ্জ্বল আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমরা উক্ত ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছি।

১৯৬৬ সালের ৬ মে নাটোরের চলনবিলে এক কৃষক সমাবেশে ছয়দফা দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৮ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'নাটোরে কৃষক সমাবেশে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন'। নাটোর থেকে প্রাপ্ত এই খবরটিতে বলা হয়:

> অদ্য এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে সিংড়া নামক স্থানে চলনবিল এলাকার এক বিরাট কৃষক সমাবেশে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

গ. পশ্চিম পাকিস্তানি বিভিন্ন দল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচীর প্রতি শুধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও সমর্থন জানায়। সংগঠনগুলোর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখাও রয়েছে। করাচী আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬ দফা সমর্থন'। করাচি থেকে বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি এক প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শেখ মন্‌জুরুল হকের সভাপতিত্বে গতকাল কমিটির তিন দিনব্যাপী বৈঠক শেষ হয়। কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়: ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিচারে ৬-দফা দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই সুবিধাজনক।
>
> প্রস্তাবে বলা হয়: ৬-দফা নূতন কিছু নয়। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব, '৪৬ সালের দিল্লী প্রস্তাব, '৫০ সালের নিখিল পাকিস্তান রাজনৈতিক সম্মেলন এবং ১৯৫৪ সালে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার মধ্যে ইহার ভিত্তি রহিয়াছে।
>
> কমিটি শেখ মুজিবের ৬-দফা পুরাপুরি গ্রহণের জন্য এবং তাহার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।
>
> এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের ৬-দফা সম্পর্কে কিছুসংখ্যক লোকের দায়িত্বহীন ও বিভেদাত্মক বক্তৃতা-বিবৃতির নিন্দা করা হয়। যুক্তি ও সততার খাতিরে ৬-দফা কর্মসূচীর বাস্তবতা স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তাবে আহ্বান জ্ঞাপন করা হয় এবং বলা হয় যে, ৬-দফার মধ্যে সারা দেশের মুক্তি ও সংহতি নির্ভরশীল।

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরিমিজী ১৯৬৬ সালের ২৪ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন। সভায় জনাব খলিল আহমদ তিরিমিজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে ছয়দফার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও প্রতিরক্ষার স্বার্থেই ছয়দফা কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফা সম্পর্কে জনাব তিরিমিজি'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় যোগদানকারী পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরিমিজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক এবং দেশরক্ষার কারণেই পূর্ব

> পাকিস্তানের নেতৃবর্গ সমগ্র দেশের জন্য ৬-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ ৬-দফার কার্যকারিতা বুঝিতে পারিবেন এবং উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু দেশের অগণিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য ৬-দফা গৃহীত হইয়াছে সেইহেতু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল-বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি ইহার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করিয়াছে। তিনি বলেন যে, ইহারা সব সময়েই জনগণের কল্যাণের প্রচেষ্টাকে ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ৬-দফার ক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। বিবৃতির উপসংহারে জনাব তিরমিজি বলেন: আমি নিশ্চিত যে, জনসাধারণ এই সকল তথাকথিত দেশপ্রেমিকের কার্যক্রম দেখিবেন এবং এই কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করিবেন।

১৯৬৬ সালের ১১ এপ্রিল করাচী আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানান হয়। ১২ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফার প্রতি সমর্থন, করাচী আওয়ামী কর্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত'। করাচি থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল করাচী শহরতলীর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।
>
> আজ শহর আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত এক ইশতাহারে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবী করা হয়। ইশতাহারে বলা হয় যে, কর্মী সম্মেলনে রাজবন্দীদের মুক্তি ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিভিন্ন কলোনীতে বসবাসকারী মোহাজেরদের গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ার নোটিশ প্রত্যাহারেরও দাবী জানানো হয়।

১৯৬৬ সালের ১৫ মে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে ছয়দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়। সম্মেলনে উপস্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীরা মত প্রকাশ করেন যে, দেশের সব সমস্যা সমাধানের জন্য ছয়দফা একটি আদর্শ সমাধান। ছয়দফা শুধু দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনই মিটাবে না, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথেও সহায়ক হবে। এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে ২১ মে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সুদূর সিন্ধু অঞ্চলে ৬-দফার সমর্থনে অকুণ্ঠ সাড়া: নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য কর্মী সম্মেলনে

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ'। হায়দরাবাদ থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে লেখা হয়:

সাবেক সিন্ধু প্রদেশের আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিন্ধু আওয়ামী লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। পশ্চিম পাক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব খলিল আহমদ তিরিমিজি এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

বিগত সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ফলে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার যেসব নূতনতর দিক উদঘাটিত হইয়াছে, সিন্ধু আওয়ামী কর্মীদের সম্মেলনে তা বিবেচনা করা হয়। সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি সমাধানের জন্য যেসব পরিকল্পনা বা প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে, সেইসব এই সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। সম্মেলনে উপস্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীরা মনে করে যে, বর্তমানে দেশ যেসব সমস্যার সম্মুখীন রহিয়াছে, সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য ৬-দফা একটি আদর্শ সমাধান। ৬-দফা শুধু দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনই মিটায় না কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষা বাস্তবায়নের পথেও সহায়ক হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেম, দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত বলিয়া সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক দিক দিয়া দেশের উন্নয়ন ও সকল অঞ্চলের মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য কর্মীরা প্রস্তুত আছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সম্মেলনের পক্ষ হইতে সাংগঠনিক কমিটিকে নির্দেশ দান করা হয়। কায়েমী স্বার্থবাদের ক্ষমতা আঁকড়াইয়া রাখার এবং কায়েমী স্বার্থকে জোরদার করার প্রয়াসকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার জন্যও সম্মেলন সাংগঠনিক কমিটিকে নির্দেশ দেয়।

সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সিন্ধুর আওয়ামী লীগ কর্মীদের এই সম্মেলন এক ইউনিট প্রথা লোপ করিয়া সাবেক প্রদেশসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়। স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশটি বাতিল করার জন্য সরকারের চাপ সৃষ্টি করার জন্য কর্মীরা সাংগঠনিক কমিটিকে নির্দেশ দেয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, এক ইউনিট ব্যবস্থা, ব্যর্থ হইয়াছে। এতে সমস্যা সমাধানে সাফল্য অর্জন হয় নাই, নূতনতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। সাবেক সিন্ধু,

বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশের ক্ষুদ্রাঞ্চলসমূহে আমলাতান্ত্রিক ও তার স্বাভাবিক দোষত্রুটি দেখা দিয়া সাধারণ মানুষের জন্য অসীম দুর্ভোগের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাবে এবং ১৯৪৬ সালের দিল্লী লেজিসলেটর কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য সুস্পষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কায়েদে আজম নিজেও বিভিন্ন প্রদেশকে তাদের নিজ নিজ সত্তা বজায় রাখিতে দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রতর অঞ্চলসমূহের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের খাতিরে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলবাসীদের দুর্ভোগ মোচনের জন্য এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এক ইউনিট ব্যবস্থা আশু বাতিল করা প্রয়োজন।

সম্মেলনের তরফ হইতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি চর্চা এবং সংবাদ পরিবেশনে সংবাদপত্রের চিরন্তন স্বাধীনতার নানাবিধ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদপত্রকেই সঠিক সংবাদদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমানসহ অপরাপর যেসব নেতাকে অনাহূত হয়রানির শিকারে পরিণত করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি সম্মেলনের তরফ হইতে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অবিলম্বে মহান নেতা শেখ মুজিবর রহমানের উপর হইতে সকল হয়রানির অবসান ঘটাইয়া সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সাবেক সিন্ধু আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য সৈয়দ জি এ খান আহমদ বোখারীকে আহ্বায়ক করিয়া ৯-সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির অন্যান্য সদস্য হইতেছেন : মেসার্স সৈয়দ শাকীর বোখারী, ডক্টর মজিদ নিজামী, শফি মোহাম্মদ মেনন (এডভোকেট, সাধারণ সম্পাদক), মুরিদ হোসেন খান কামরানী, সালাহউদ্দিন আব্বাসী, রাইস তাজিয়া খান, মীর মোহাম্মদ মর্তুজা এবং রাজা আকবর আলী।-সংবাদদাতা প্রেরিত

১৯৬৬ সালের ১৮ মে করাচির কোরাঙ্গি ও গান্ধী কলোনির আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ছয়দফাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ছয়দফা প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই লক্ষ্যে একটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৩ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'করাচীতে ৬-দফার পক্ষে প্রচার অভিযান'। করাচি থেকে ইত্তেফাকের সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

করাচীর কোরাঙ্গী ও লান্ধী কলোনীর আওয়ামী লীগ কর্মীরা গত ১৮ই মে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ৬-দফাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ৬-দফা প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রচারকার্য চালানর জন্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব এম, এন, খানকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের সভায় শেখ মুজিবসহ আটক অপরাপর নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব খলিল আহমেদ তিরমিজি কর্মীদের মধ্যে ৬-দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। ৬-দফার পক্ষে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ লাহোরের নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক কমিটির সেক্রেটারি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রতি মালিক সরফরাজের পূর্ণ সমর্থন'। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই রিপোর্টে বলা হয়:

নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল মালিক হামিদ সরফরাজ পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তোলার ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি বিরোধী দলের পক্ষ হইতে অদ্য পূর্ণ সমর্থন জানান।

এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা দাবীর সহিত বিরোধী দলের মতদ্বৈততার পরিষ্কার ব্যাখ্যাদান করেন এবং প্রসঙ্গতঃ ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রের প্রতি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৃঢ় সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্যমূলক বক্তৃতার বক্তব্য তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন।

সাত. ছয়দফার সমালোচনা

ক. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

১৯৬৬ সালের ১৪ মার্চ চট্টগ্রামের নিয়াজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক জনসভায় আইয়ুব খান ছয়দফার তীব্র সমালোচনা করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৫ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আইয়ুব কর্তৃক বিরোধী দলের সমালোচনা'। চট্টগ্রাম থেকে বার্তা সংস্থা পিপিএ ও এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

চট্টগ্রামের নিয়াজ ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান আজ বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, দেশের স্বার্থবিরোধী কথা বলার জন্য তাঁহারা কোন কোন মহল হইতে অর্থ কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছেন।

দুইদিনের সফরে তিনি আজ এখানে আগমন করেন। জনসভায় প্রেসিডেন্ট বলেন যে, বিরোধী দলসমূহ সর্বদাই সরকার ও বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনা করে। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য কি করা উচিত–কখনই তাহা বলে না।

ছাত্রসমাজকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করিয়া তিনি বলেন যে, বিরোধী দল সর্বদা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথা বলে এবং ইহার ফলে দেশে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান কি পাইল না–বিরোধীদল সর্বদা কেবল সেই অভিযোগ করে, কিন্তু তাহারা দেশের জন্য কি করিয়াছে?

৬ দফা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট

৬-দফার তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন যে, এইসব দফা পাকিস্তানের কোন মঙ্গল সাধন করিবে না। তিনি বলেন যে, কোন মহল নিশ্চয়ই বিরোধী দলকে পরিচালিত করিতেছে। অন্যথায় নিজ দেশের স্বার্থবিরোধী কথা বলায় তাহারা এত উৎসাহী হইবে কেন? কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ না করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র যাহারা কোন মহল হইতে ঘুষ কিংবা আনুকূল্য লাভ করিয়া থাকে, তাহারাই নিজ দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলার মত বিবেকশূন্য হয়।

যদি পৃথক হইয়া যায়

সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চল যদি পৃথক হইয়া যায় তাহা হইলে উভয় অঞ্চলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, ঐক্যের উপর পাকিস্তানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

প্রেসিডেন্ট জনগণকে বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাইয়া ইহাকে বিকাশলাভ করিতে সাহায্য করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র স্বর্গীয় অবদান নয়। কিন্তু শুধুমাত্র প্রয়োজন হইলেই ইহার পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা উচিত। শুধু মাত্র পরিবর্তনের খাতিরে পরিবর্তন করার কোন অর্থ থাকিতে পারে না।

আমার চেয়ে ভাল লোক পাওয়া গেলে

তিনি বলেন, "আমি চিরকাল প্রেসিডেন্ট থাকিতে চাই না। বরং প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আমার অপেক্ষাও ভাল লোক পাওয়া গেলে আমি সুখীই হইব।"

তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে উহা অর্জনের নিয়মতান্ত্রিক পথ আছে। বিশ্বের অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে ইহা পৃথক কেবল মাত্র এই জন্যই হইহা ব্যর্থ হইবে মনে করা উচিত নয়।

প্রেসিডেন্টের বিপুল সম্বর্ধনা লাভ

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান আজ (সোমবার) চট্টগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইলে ছাত্রবৃন্দ, বন্দর ও মিলসমূহের শ্রমিকগণসহ সকল স্তরের নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

প্রেসিডেন্টের বিমান ভূমিস্পর্শ করিলে প্রথম তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব সুলতান আহমদ। প্রাদেশিক পূর্তমন্ত্রী মিঃ মং স প্রু, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিভিন্ন সদস্য, নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীও বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্টকে তরবারি উপহার দান

অদ্য চট্টগ্রাম বেসামরিক প্রতিরক্ষার চীফ ওয়ার্ডেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে একখানি তরবারি উপহার দেন। প্রেসিডেন্টকে শহীদ মেজর ভাট্টির একটি আবক্ষ মূর্তিও উপহার দেওয়া হয়।

গভর্নরের বক্তৃতা

প্রাদেশিক গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খান এই জনসভায় বক্তৃতাকালে বিশেষ এক শ্রেণীর 'হতাশ' রাজনীতিকের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেয়। তিনি বলেন যে, এই সব 'হতাশ' রাজনীতিকগণ অতীতে 'যুক্ত বাংলা'র পক্ষে ধ্বনি তুলিয়াছিলেন।

গভর্নর বলেন যে, ক্ষমতালিপসু এই সব রাজনীতিকের জনগণের প্রতি কোন দরদ নাই। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ধুয়া তুলিয়া পুনরায় ইহারা মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মৌলিক গণতন্ত্রী সমাবেশে

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব চট্টগ্রামে মৌলিক গণতন্ত্রী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হইলে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও পাকিস্তান শক্তিশালী হইতে পারে।

কক্সবাজারে প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আজ কক্সবাজারে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, বিগত ঘূর্ণিবাত্যার ধকল কাটাইয়া কক্সবাজারবাসীরা আবার যে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী

হইয়াছেন। আজ বিকালেই তিনি স্বল্প কালীন সফরে চট্টগ্রাম হইতে কক্সবাজার আসিয়া পৌছান।

১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ রাজশাহীতে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিভাগীয় সম্মেলনে ছয়দফার বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। তিনি ছয়দফা দাবিকে বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেন এবং 'রাজনৈতিক দস্যুবাদ' বলেও অভিহিত করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৭ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা' গঠনেরই পরিকল্পনা, ৬-দফা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হুঁশিয়ারি'। রাজশাহী থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অদ্য জাতিকে ৬-দফার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলেন যে, 'ইহা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা।'

আজ রাজশাহীতে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিভাগীয় সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পাকিস্তানের জন্মের সময় হইতে কোন কোন নেতা 'বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার' যে অভিলাস পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, বর্তমান পরিকল্পনা তাহার সহিত সম্পর্কিত।

তিনি বলেন যে, এই 'জঘন্য স্বপ্ন' বাস্তবায়িত হইলে তাহা দেশের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী গোলামে পরিণত হইবে।

তবে, প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাধীন অঞ্চল গঠনের জন্য একটা বৃহৎ সশস্ত্র বাহিনীর অধিকারী ভারত পশ্চিমবঙ্গকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দিবে না।'

প্রেসিডেন্ট মৌলিক গণতন্ত্রিগণকে বৃটিশ আমলে বর্ণ হিন্দুদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, ঐসময় মুসলমানগণকে বর্ণ হিন্দুদের সামনে জুতা পরিতে অথবা চেয়ারে বসিতে দেওয়া হইত না।

দেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে

প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকার বিরোধীরা ফেডারেশনের ইউনিটসমূহের জন্য অধিকতর ক্ষমতার নামে পাকিস্তানকেই দুর্বল করিতে চাহিতেছে এবং ইহা পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিপন্ন করিবে।

তিনি জোরের সহিত বলেন যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী না রাখিলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না এবং আমরা জঞ্জালমুক্ত হইতে সক্ষম হইব না।

পার্লামেন্টারী সরকার ভাল, তবে–

পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী সরকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পার্লামেন্টারী সরকার ভাল। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন যে, সফলতার সহিত পার্লামেন্টারী সরকার পরিচালনার জন্য দুইটা বিষয় অত্যাবশ্যক। তার একটা হইল : দেশে দুইটি সুষ্ঠু ও সুশৃংখল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবং অপরটা হইল শিক্ষিত দেশবাসী ও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা।

পরিষদসমূহে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সদস্য নির্বাচনের দাবী প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, দেশের সমস্ত মানুষ শিক্ষিত হইলেই ইহা সম্ভব।

রাজনৈতিক দস্যুবাদ

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীদলের অস্তিত্ব আবশ্যক। তিনি বলেন, বিরোধী দলের সমালোচনা সুষ্ঠু ও গঠনমূলক হইতে হইবে। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাহারা তৎপরিবর্তে দেশের ভিত্তিরই উৎপাটন করিতে চায়। প্রেসিডেন্ট ইহাকে 'রাজনৈতিক দস্যুবাদ' বলিয়া অভিহিত করেন।

বি ডি সদস্যদের প্রতি গভর্নরের উপদেশ

মৌলিক গণতন্ত্রী সমাবেশে বক্তৃতাকালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য প্রাদেশিক গভর্নর জনাব আবদুল মোমেন খান, বি ডি সদস্যদের সাবধান করিয়া দেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ খুলনার এক জনসভায় ছয়দফার কঠোর সমালোচনা করে ভাষণদান করেন। উক্ত জনসভায় ছয়দফা আন্দোলনের পেছনে ভারতের সম্ভাব্য কোন প্রকার সহানুভূতি না থাকার জন্য তিনি বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য মৌলিক গণতন্ত্রীদের আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'যুক্ত বাংলা গঠনের দাবী আমরা মানিলেও ভারত মানিবে না –প্রেসিডেন্ট আইয়ুব'। ইত্তেফাকের খুলনা অফিস থেকে প্রাপ্ত এবং এপিপি'র পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> অদ্য এখানে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান তাঁহার ভাষণে বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, ৬-দফার দাবী স্বাধীন সার্বভৌম যুক্ত বাংলা গঠনের প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি বলেন, স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা গঠনের দাবী আমরা মানিয়া লইলেও ভারত উহাতে সম্মত হইবে না। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, স্বাধীন

> যুক্ত বাংলা গঠিত হইলে এখানকার মুসলমানেরা আবার হিন্দুদের দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা পড়িবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের দাবী নূতন কিছু নয়, পাকিস্তান সৃষ্টির সময় হইতেই অনেকেই এই অভিসন্ধি পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন, আজ আবার সেই দাবী মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে।
>
> পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমাবেশে বলেন, দেশকে সুসংহত ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে শক্তিশালী সরকার, শক্তিশালী অর্থনীতি ও শক্তিশালী দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। এখন দেশে উপরোক্ত তিন প্রকার ব্যবস্থাই বর্তমান রহিয়াছে। মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় ভোট আদায়ের উদ্দেশ্যে বিরোধী দল মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু আবার তাঁহারা মৌলিক গণতন্ত্রীদের গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছেন। তিনি বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপদেশ দেন।

গভর্নর বলেন–

এপিপি'র খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পর সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নেতৃত্বে গত যুদ্ধের সময় সৃষ্ট ঐক্য দুর্বল করার প্রয়াসী শক্তিসমূহের উপর দেশবাসী 'চরম আঘাত' হানিবে বলিয়া জোর আশা প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্টের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গতকাল সন্ধ্যায় খুলনা হইতে যশোর হইয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ঢাকার মুসলিম লীগ (কনভেনশন) কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয়দফাকে রাষ্ট্রীয় শত্রুতা বলে চিহ্নিত করেন। তিনি ছয়দফাকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেন এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ইত্তেফাকে ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'কনভেনশন লীগই প্রকৃত জাতীয়তাবাদী' –প্রেসিডেন্ট আইয়ুব। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গতকল্য (শনিবার) ঢাকার মুসলিম লীগ (কনভেনশন) কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, এই লীগই দেশে একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল। যাহারা দেশের ঐক্য বিনষ্ট ও অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তিনি

কনভেনশন মুসলিম লীগে প্রাণ সঞ্চারের আহ্বান জানান। বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিলে মুসলমানদের এককালের রক্ত শোষক হিন্দু মারোয়াড়ীরা আবার প্রভু বনিবে।" তিনি আরও বলেন, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের চীৎকার বাস্তবে এই প্রদেশের অধিবাসীদের কবর রচনাই করিবে।'

পাকিস্তানীবাসী কখনও আওয়ামী লীগের ৬-দফা কখনো বাস্তবায়িত হইতে দিবে না। কারণ, উহা বৃহত্তর বঙ্গেরই পুরাতন দাবী। খোদা না করুন, পাকিস্তান বিরোধীদের তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহা হইলে পরিণামে পূর্ব পাকিস্তানবাসী ভারতের বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু সমাজের গোলামে পরিণত হইবে'।

খ. মন্ত্রী

পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ছয়দফার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। ১৯৬৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারি বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী এক বিবৃতিতে ছয়দফা প্রস্তাবের নিন্দা করেন এবং একে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করেন। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'দেশদ্রোহিতার নামান্তর! : শেখ মুজিবের বিবৃতি সম্পর্কে আবদুল হাই চৌধুরী'। করাচি থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী জনাব আবদুল হাই চৌধুরী গতকল্য এখানে এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে লইয়া কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের নিন্দা করেন। জনাব হাই চৌধুরী বলেন যে, অনুরূপ প্রস্তাব "দেশদ্রোহিতার নামান্তর"। তিনি বলেন, দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করার ইহা প্রথম পদক্ষেপ হইবে। মনে হয়, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি যাহারা মানিয়া লইতে পারে নাই তাহাদের সমর্থনেই শেখ মুজিবের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং পাকিস্তানকে নস্যাৎ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আবদুল হাই ছয়দফা দাবীকে 'দেশদ্রোহিতামূলক' বলে আখ্যায়িত করায় ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং স্বার্থবিরোধী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এ প্রসঙ্গে

একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবের বিবৃতির অপব্যাখ্যায় চট্টগ্রামে অসন্তোষ; নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আইন মন্ত্রীর উক্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ'। চট্টগ্রামের ইত্তেফাক অফিস থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী কর্তৃক শেখ মুজিবের বিবৃতির "অপব্যাখ্যা"তে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ বলেন : "পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার দাবী নিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সংগ্রামী নেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমান যে ছয়দফা দাবী কার্যকরী করার প্রস্তাব দিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি অধিকারসচেতন মানুষ ইহার সমর্থন করিয়াছে। নির্বাচন, যুদ্ধ ইত্যাদি সমস্যা-সংকুল ঘটনা-প্রবাহের চাপে দেশের মৌলিক সমস্যাগুলি প্রায় ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছিল। শেখ সাহেবের বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী প্রদানে পূর্ব বাংলার গণমনে আবার ক্ষীণ আশার আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।
>
> কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী ইহার অপব্যাখ্যা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি শেখ সাহেবের বিবৃতিকে 'দেশদ্রোহিতামূলক' আখ্যা দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা জনাব আবদুল হাই ও তার পৃষ্ঠপোষকদের জানাইয়া দিতে চাই যে, পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে আর ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। আমরা জানি যখনই পূর্ব বাংলার দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রশ্ন উঠে তখনই একটি বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট চক্র পূর্ব পাকিস্তানের শত্রু ও সর্বত্র দেশদ্রোহিতার গন্ধে বেসামাল হইয়া উঠে। কিন্তু আইন মন্ত্রী সাহেব অদ্য রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাই বহু পুরানা সুরে তিনি রাগের মূর্চ্ছনা তুলিতে চাহিলেও তাহা পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে এতটুকু চঞ্চল করিতে পারিবে না। পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী আদায়ের প্রশ্ন উঠিলে বাঘ আসিয়াছে বাঘ আসিয়াছে বলিয়া চিৎকার করা একটি বিশেষ মহলের পুরানো অভ্যাস। তাই দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, সময় থাকিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া এইসব পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী গণধিকৃত চক্রান্তকারীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দিন। অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ ও এডভোকেট জনাব আবুল কাসেম, প্রাক্তন এম,পি,এ জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব এম, এ আজিজ, ইউনিয়ন কমিটি সদস্য জনাব আবদুল্লাহ আল হারুন, এম, এ হান্নান প্রমুখ যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদের সরকারী দলের নেতা খান আবদুস সবুর খান ১৯৬৬ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার

পথে লাহোর বিমানবন্দরে ছয়দফা দাবির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয়দফাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তিনি এটাও মনে করেন যে, দেশের ঐক্য ও সংহতির প্রতি জনগণের আস্থার জায়গাটি ছয়দফা কর্মসূচি কখনই বিনষ্ট করতে পারবে না। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৫ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ছয় দফার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিব –সবুর'। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> এখানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদের সরকারী দলের নেতা খান আবদুস সবুর খান বলেন যে, জাতীয় পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা শীঘ্রই শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত ঘৃণ্য মতলব উদঘাটনের জন্য এক অভিযান শুরু করিবেন।
>
> ঢাকা হইতে রাওয়ালপিণ্ডি গমনের পথে লাহোর বিমান বন্দর স্বল্পক্ষণ অবস্থানকালে যোগাযোগ মন্ত্রী সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, কোন কোন মহল কর্তৃক দেশে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা হিসাবে এই কর্মসূচী আনা হইয়াছে। তবে তিনি বলেন যে, পূর্বেও বহুবার জনসাধারণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং তাহাদের আর প্রতারিত করা যাইবে না। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই প্রচেষ্টার প্রতি উদাসীন রহিয়াছে। কারণ, তাহারা ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান আবদুস সবুর খান ছয়দফার বিরোধিতা করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৩১ মার্চ ইত্তেফাকের শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এপিপি পরিবেশিত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা সম্পর্কে খান সবুর'। এতে বলা হয়:

> কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান আবদুস সবুর গতকাল (বুধবার) ঢাকায় বলেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলসমূহের এক বিশেষ অংশের ৬-দফা কর্মসূচী দেশে বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "৬ দফা কর্মসূচী উর্বর মস্তিষ্কের একটি অসার আবিষ্কার" এবং তিনি বলেন, তথাকথিত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উক্ত ঘৃণ্য প্রচার অভিযান শুরুর দ্বারা তাহারা "কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিই ব্যাহত করিতেছেন।

১৯৬৬ সালের ৩০ মার্চ যশোর টাউন হল ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় গবর্নর আবদুল মোনেম খান ছয়দফাকে উপহাস করে বক্তৃতাদান করেন। বক্তৃতায় গবর্নর বলেন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফার ধুয়া তুলেছিল সেই ২১ দফাই ভেঙ্গে-চুরে তারা আজ ছয়দফায় দাঁড়

করেছে। যুক্তফ্রন্টকে ব্যঙ্গ করে তিনি 'মুক্ত ফ্রন্ট' বলে অভিহিত করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: গভর্নর বলেন: 'পিতা-মাতার মৃত্যুর পর পুত্র কন্যারাই ওয়ারিশ হয় অতএব লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে কথা বলিবার অধিকার একমাত্র মুসলিম লীগের, অন্য কাহারও নাই'। যশোর থেকে প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> গভর্নর জনাব আবদুল মোমেন খান গতকল্য বৈকালে যশোর টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আজ বিরোধী দলেরা চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে যদি কিছু বলিবার থাকে তবে তাহা একমাত্র মুসলিম লীগই বলিতে পারে। কেননা ১৯৪০ সালে লাহোর মুসলিম লীগের সভায় উক্ত প্রস্তাব পাস করা হয়। তিনি বলেন যে, পিতা বা মাতা মরিয়া গেলে তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ একমাত্র তাহাদের পুত্র-কন্যাগণই হয়। অতএব লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে অন্য কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই।"
>
> আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্পর্কে গভর্নর উপহাস করিয়া বলেন যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফার ধুয়া তুলিয়াছিল সেই ২১ দফাই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহারা আজ ৬ দফা দাঁড় করাইয়াছে। যুক্তফ্রন্টকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি 'মুক্ত ফ্রন্ট' বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, ২১ দফা লইয়া পুনরায় জনতার সম্মুখে দাঁড়াইলে ভাঁওতা ধরা পড়িয়া যাইবে, তাই এবার ৬ দফা লইয়া "বিপ্লবী বীর" শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ৪ বৎসর ক্ষমতায় থাকিয়া তাঁহারা ২১ দফার একে একে রফা করিতে মাঠে নামিয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ৪ এপ্রিল করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ছয়দফা কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ছয়দফাকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'গোলামীর কর্মসূচি' বলে অভিহিত করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৫ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন বলেন: মুজিবের ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের দাসত্বেরই কর্মসূচী'। করাচি থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'গোলামীর

কর্মসূচী' বলিয়া অভিহিত করেন। অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগ নেতার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় আক্রমণ চালাইয়া জনাব আলতাফ হোসেন বলেন, "ইহা (৬-দফা কর্মসূচী) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুজিবের জাল জিনিস ক্রয় করিতেছে না।"

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় সরকার যে দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা প্রমাণের জন্য পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেন।

এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, এইগুলী (পরিসংখ্যান) কি মুজিবকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে আপনি যথেষ্ট মনে করেন না? জবাবে জনাব আলতাফ হোসেন বলেন যে, কোন কিছুই মুজিবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

১৯৬৬ সালের ৯ এপ্রিল লাহোরে পূর্ব পাকিস্তানের কনভেনশন লীগের জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী জনাব ফজলুল বারী ছয়দফা কর্মসূচিকে অর্থহীন বলে মন্তব্য করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১০ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তানীরা ছয় দফায় কানও দেয় নাই! লাহোরে দুইজন পূঃ পাকিস্তানী মন্ত্রীর অভিমত'। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তানের কনভেনশন লীগের জেনারেল সেক্রেটারী এবং প্রাদেশিক রাজস্ব মন্ত্রী জনাব ফজলুল বারী অদ্য এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানে 'কান দেওয়ার মত বস্তু' বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।
>
> তথায় উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত জনাব বারীর উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এ ধরনের বাজে ও অর্থহীন কথায় কখনও কান দিবে না।

১৯৬৬ সালের ১০ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত লাহোরে এক সংবর্ধনা সভায় ছয়দফা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তীব্র সমালোচনা করেন। সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয়দফা সমর্থন করেন না। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবর ১১ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'মুজিবকে জেলে যাইতেই হইবে'। এই খবরে লেখা হয়:

> জনাব মুজিবর রহমানকে জেলে যাইতেই হইবে; কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে কয়েক দফা ফৌজদারী মামলা চলিতেছে, তবে জেলে যাওয়ার পূর্বে তিনি রাজনৈতিক বীর বনিতে চাহেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগের বৈঠকে যোগদানের জন্য এখানে আগত পূর্ব পাকিস্তানী মন্ত্রীদের সম্মানার্থ লাহোর কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলর মালিক মোহাম্মদ শফী কর্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত গতকল্য উপরোক্ত মন্তব্য করেন। দেওয়ান বাসেত আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জনাব মুজিবর রহমানের ছয়-দফা সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, জনগণের স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ নহে। আদমজী জুট মিলের দাঙ্গা ও পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের স্পীকারের হত্যার কথা আজও তাহাদের স্মরণ আছে।

গ. আবুল আলা মওদুদী

ছয়দফার সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি মওলানা আবুল আলা মওদুদী। তিনি বেশ কয়েকবার ছয়দফার কঠোর সমালোচনা করেন। মওলানা আবুল আলা মওদুদী ছয়দফা সম্পর্কে প্রথম সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন ১৯৬৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। এই দিন করাচি থেকে ঢাকা এসে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ছয়দফার ঘোরবিরোধী। কারণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয়দফায় যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা থেকে আর একটু অগ্রসর হলেই দেশের অখণ্ডতা নষ্ট হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'মওলানা মওদুদী বলেন–'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি মওলানা আবুল আলা মওদুদী গতকল্য (বুধবার) ঢাকায় বলেন যে, দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া প্রদেশসমূহকে যতখানি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্ভব, তিনি ততখানি স্বায়ত্তশাসনই প্রদেশসমূহকে দেওয়ার পক্ষপাতী।
>
> গতকল্য করাচী হইতে ঢাকা আসিয়া মওলানা মওদুদী বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আর 'একপদ' আগাইলেই দেশের অখণ্ডত্ব নষ্ট হইবে এবং এই জন্যই তিনি শেখ মুজিবরের ৬-দফার ঘোর বিরোধী। এই পর্যায়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি যে ধরনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করেন, তাহাতে কি কি বিষয় কেন্দ্রের হাতে, আর কি কি প্রদেশের হাতে থাকিবে, সেই সম্পর্কে তিনি এই মুহূর্তে চূড়ান্ত পর্যায়ে কিছু বলিতে

পারেন না। তবে তিনি বলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র 'ভালই কাজ করিতেছিল' এবং প্রয়োজনবোধে সেই শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধনও সম্ভব।

মওলানা মওদুদী বিরোধী দলীয় শিবিরে ঐক্যসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ঐক্যসাধনের শর্ত হিসাবে তিনি বলেন যে, বিরোধী দলীয় শিবিরকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করিতে হইবে এবং এই সুসংহত বিরোধিতার মধ্য দিয়াই বিরোধী দলীয় শিবিরে ঐক্য সাধন সম্ভব। বিরোধী শিবিরের একটি প্রভাবশালী মহল তাসখেন্দ ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করিতে প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বিরোধী দলীয় শিবিরে ঐক্য সাধন সম্ভব, জানিতে চাহিলে মওলানা মওদুদী বলেন যে, উক্ত মহলটি তাসখেন্দ ঘোষণার আসল 'গোমর' ধরিতে পারে নাই বলিয়াই তাসখেন্দ ঘোষণার বিরোধিতা করিতে তাহারা প্রস্তুত নয়।

তিনি বলেন যে, এই মহলকে তাসখেন্দ ঘোষণার 'আসল গোমর' সমঝাইবার জন্য তিনি কোশেশ করিবেন। পাক-ভারতের মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে মওলানা মওদুদী বলেন যে, তিনি মনে করেন, এ যুদ্ধ আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিরোধী দলীয় যেসব নেতা এই মতে বিশ্বাসী নন, তিনি তাঁহাদের মতামতের সঙ্গে একমত নন। তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, তাসখেন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য শীঘ্রই চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খাজা রফিক প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসিবেন।

ঘ. গোলাম আযম

১৯৬৬ সালের ১০ জুন জামাতে ইসলামীর উদ্যোগে খুলনা মিউনিসিপ্যাল ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও ছয়দফার সমালোচনা করতে শুরু করলে, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী গোলাম আযমের মন্তব্যের প্রতিবাদে জনসভায় স্লোগান দিতে শুরু করে এবং মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এ সংক্রান্ত খবর ১৯৬৬ সালের ১২ জুন দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ছয় দফার জনপ্রিয়তা'। ইত্তেফাকের খুলনা অফিস থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> ৬-দফা যে একটি বিশেষ জনপ্রিয় দাবী এবং জনসাধারণ যে ইহাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে-জামাতে ইসলামীর উদ্যোগে আজ খুলনায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল।
>
> খুলনা মিউনিসিপ্যাল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সভায় জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আজম শেখ মুজিবর রহমান ও পূর্ব

> পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বিশেষতঃ ৬-দফার সমালোচনা করিতে শুরু করিলে, শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। উপস্থিত জনতা অধ্যাপক আজমের মন্তব্যের প্রতিবাদে সভাময় শ্লোগান দিতে শুরু করে এবং তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবী জানায়। এই পর্য্যায়ে সভায় গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং জনতা দলে দলে সভা ত্যাগ করিতে শুরু করে।
>
> অতঃপর যাহারা সভায় উপস্থিত ছিল তাহারাও অধ্যাপক আজমের মন্তব্যের প্রতিবাদে শ্লোগান দান অব্যাহত রাখে। এই সময় মাওলানা ইউসুফ আলী প্রতিশ্রুতি দেন যে, বক্তাগণ আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব ও ৬-দফার বিরুদ্ধে আর কোন মন্তব্য করিবে না। ইহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী শান্ত হইলেও কিছু কিছু লোক দাবী করে যে, গোলাম আজম সাহেবকে অবশ্যই তাঁহার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। অবশেষে জনৈক প্রবীণ লোক মঞ্চে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হন। মাত্র কয়েকশত লোকের উপস্থিতিতে উদ্যোক্তাগণ কোনক্রমে সভায় প্রস্তাবাবলী পাস করাইয়া লইতে সক্ষম হন।

ঙ. খান গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জনাব লুন্দখোর জানান, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে তারা ছয়দফা কর্মসূচিসহ বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ১ মার্চ ঢাকার উদ্দেশে করাচি ত্যাগ করবেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা সম্পর্কে আলোচনা, শীঘ্রই পশ্চিম পাক আওয়ামী নেতাদের ঢাকা সফর'। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মালিক হামিদ সরফরাজ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে দলীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১লা মার্চ ঢাকা রওয়ানা হইবেন।
>
> এই আলাপ-আলোচনায় শরীক হওয়ার জন্য বেগম আখতার সোলায়মান ২রা মার্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করিবেন। জনাব লুন্দখোর অদ্য বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে তাঁহারা ঢাকা সফরে যাইতেছেন। তিনি ইহাও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহারা এক সপ্তাহ অবস্থানকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীসহ বিবিধ বিষয় আলোচনা করিবেন।

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর ছয়দফার বিরুদ্ধে সমলোচনামুখর ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ৫ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছয়দফা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয়, ছয়দফার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অকার্যকর হয়ে পড়বে। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবর ৬ মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা প্রশ্নে জনাব লুন্দখোর'। এতে লেখা হয়:

> পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান মোহাম্মদ লুন্দখোর গতকল্য (শনিবার) ঢাকায় বলেন যে, শেখ মুজিবের ৬-দফার যে দফায় পাকিস্তানের ইউনিটসমূহের জন্য অধিকতর ক্ষমতা দাবী করা হইয়াছে, তিনি সেই দফার বিরোধী। গতকল্য এক বিবৃতিতে জনাব লুন্দখোর বলেন যে, শেখ মুজিবের দাবী মতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে বৃহত্তর ক্ষমতা দিলে পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অকার্যকরী হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের প্রস্তাব দেশকে কনফেডারেশনে পরিণত করার প্রস্তাব এবং ইহাতে জাতীয় সংহতির প্রশ্নে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুই নেতা জনাব হামিদ সরফরাজ এবং বেগম আবাদ আহমদও ৬-দফা প্রশ্নে তাঁহার সঙ্গে একমত বলিয়া জনাব লুন্দখোর দাবী করেন। শেখ মুজিব ৬-দফায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার যে দাবী জানাইয়াছেন তিনি তাহা সমর্থন করেন বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করেন ।

খান গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর ১৯৬৬ সালের ১ মে পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগে ছয়দফা প্রশ্নে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় জীবনে নানারকম বঞ্চনা এবং বিভিন্ন সরকারের ভ্রান্তনীতির জন্যই ছয়দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ৪ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ছয়দফা কেন–লুন্দখোর'। পেশোয়ার থেকে বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর গতকাল এখানে স্বীকার করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মহলের মধ্যে কিছুটা মতান্তর আছে। তবে তিনি বলেন, "শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচীর জন্য

> আমরা তাহার বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত থাকার" অভিযোগ করা যাইতে পারে না। এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সরকারের ভ্রান্তনীতির জন্যই পূর্ব পাকিস্তানে আজ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থিত হইতেছে।
>
> তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণকে যদি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অংশ দেওয়া হইত এবং দেশে "পূর্ণ গণতন্ত্র" থাকিত তাহা হইল আজ যেসকল দাবী-দাওয়া উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রয়োজনই হইত না। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরই নহে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সন্তুষ্টির জন্যও অতীতের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন এবং দেশে "পূর্ণ গণতন্ত্র" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

চ. অন্যান্য দল

১৯৬৬ সালের ৭ এপ্রিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফরিদপুর থেকে ঢাকা ফেরার পথে সাংবাদিকদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা দাবি 'ডিসমিস' এবং ছয়দফাকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের দলিল বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কস্মিনকালেও তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য 'সাম্রাজ্যবাদী মহলের' দেয়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৮ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ছয়দফা 'ডিসমিস' আঃ লীগের একক ভূমিকা ভাসানীর না–পছন্দ'। বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের ছয়দফা দাবী 'ডিসমিস' করিয়া দেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের হাত হইতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধের কোন 'ব্যবস্থাপত্র' ইহাতে নাই। মওলানা ভাসানী বলেন যে, তিনি ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত বিধানমতে প্রদেশ সমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। তবে দেশের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের ব্যাপারে পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষা উহাতে অবশ্যই প্রতিফলিত হইতে হইবে।
>
> মওলানা ভাসানী বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের ব্যাপারে আন্তরিক হইলে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রায় একইরূপ কর্মসূচী সম্পন্ন অন্যান্য বিরোধীদলগুলিকে লইয়া একই

প্ল্যাটফর্ম হইতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনাই অধিকতর বিজ্ঞতার কাজ হইত। এই পথে আন্দোলন জোরদার হইত এবং লক্ষ্য অর্জন সহজতর হইত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। মওলানা বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কস্মিনকালেও তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য 'সাম্রাজ্যবাদী মহলের' দেওয়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না। ইহার সহজ কারণ হইল, উহা বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মধ্যকার ব্যবধান আরও বাড়াইয়া তুলিবে।

১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছয়দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করে বলেন, তাঁর দল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন প্রচেষ্টায় শরিক হবে না। পাকিস্তান প্রস্তাবই তাঁর দলের কর্মসূচির মূলমন্ত্র বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৯ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানের সংহতি ক্ষতি করার কোন প্রচেষ্টায় ন্যাপ শরীক হইবে না–ভাসানী'। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল (শুক্রবার) বলেন যে, তাঁহার দল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন প্রচেষ্টায় শরীক হইবে না। মওলানা ভাসানী বলেন যে, ন্যাপ পাকিস্তানের যে কোন বিদেশী শক্তির বশংবদ হওয়া প্রতিরোধ করিবে।
>
> ৬-দফার উল্লেখ করিয়া মওলানা ভাসানী বলেন যে, ন্যাপ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইবে। পাকিস্তান প্রস্তাবই তাঁহার দলের কর্মসূচীর মূলমন্ত্র বলিয়া মওলানা ভাসানী অভিমত প্রকাশ করেন।
>
> মওলানা ভাসানী বলেন, ১৯৪৬ সালের কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তিনি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। তিনি জানান যে, তিনি নিজে ঐ কনভেনশনে যোগদান করিয়াছিলেন। কনভেনশনে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল বটে; কিন্তু গ্রুপিং পরিকল্পনা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে উহা পাস করা হয় নাই।
>
> মওলানা ভাসানী বলেন যে, তাঁহার দল কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা–এই তিনটি বিষয় রাখার পক্ষপাতী। তবে কোন সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁহার দল স্বীয় মনোভাব পরিবর্তনে প্রস্তুত আছে। তবে তাঁহার দল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন প্রচেষ্টায় শরীক হইবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

১৯৬৬ সালের ২৩ এপ্রিল নেজামে ইসলামী দলের আহ্বায়ক চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছয়দফাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে, ছয়দফা কেন্দ্রকে এত বেশি দুর্বল করবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব থাকবে না। জনগণ ভাবপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হবে না এবং স্লোগানেও ভুলবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৫ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ৬-দফা'। লয়ালপুর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> এখানে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে নেজামে ইসলাম দলের আহ্বায়ক চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বেশীর ভাগ লোক ৬-দফার তাৎপর্য ও বিপদের কথা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। জনগণ ভাবপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হইবে না এবং স্লোগানেও ভুলিবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।
>
> চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন যে, ৬-দফা দেশের উভয় অংশের মধ্যকার ঐক্য শিথিল করিবে। তিনি আরও বলেন : ৬-দফা কেন্দ্রকে এত বেশী দুর্বল করিবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব থাকিবে না।
>
> ৬-দফা পরিকল্পনা প্রতিরোধ করার জন্য দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব দানের জন্য সরকারের নিকট তিনি আবেদন জানান।
>
> চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন যে, ৬-দফার নিছক বিরোধিতা করাই যথেষ্ট নহে। 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর' স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, তাহার সাম্প্রতিক পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা জনগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, তথায় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী, প্রতিরক্ষা এবং দেশ রক্ষার ব্যাপারে আরও দায়িত্বশীল করিয়া তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা দরকার।

১৯৬৬ সালের ২২ মে পাকিস্তান মুসলিম লীগ সেক্রেটারি জেনারেল সরদার মোহাম্মদ আসলাম ছয়দফাকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল ও দেশকে বিচ্ছিন্ন করাই আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবির লক্ষ্য। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ২৪ মে দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'লীগ নেতা বলেন: 'জনসমর্থনের অভাবে ৬-দফা ব্যর্থ হইয়াছে'। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সেক্রেটারী জেনারেল সরদার মোহাম্মদ আসলাম গত রবিবার জনগণকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল ও দেশকে বিচ্ছিন্ন করাই আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবীর লক্ষ্য।

সরদার আসলাম জাতীয় পরিষদের সদস্য। তিনি এ, পি,পি'র সহিত এক সাক্ষাৎকারে ৬-দফার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিই আজিকার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

লীগ নেতা বলেন যে, বৃহত্তর জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে না পারায় ৬ দফা কর্মসূচী অন্ততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের উভয় অংশের জনগণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই কর্মসূচী দেশকে বিচ্ছিন্ন করিবে। তিনি আরও বলেন, একবার জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরিলে উহা দেশের জনগণের জন্য বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে।

আট. ছয়দফার সমালোচনার জবাব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবির সমালোচনার জবাব দেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয়দফার বিরোধিতাকারীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি ছয়দফার বিরুদ্ধাচরণ না করে ছয়দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কি, গণভোটের মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, দেশবাসী আপামর জনসাধারণ ছয়দফার পক্ষে আছে এবং বিগত যুদ্ধের স্মৃতি যারা সুষ্ঠুভাবে স্মরণ রেখেছেন, তাদের এই ছয়দফার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন উপায়ই নেই। ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এই খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল : 'বিগত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে ৬-দফা'র সারবত্তা যাচাই করুন, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান: 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' প্রবক্তাদের প্রতি একটি সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনীতিতে মধ্যপন্থায় আর বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ৬-দফা কোন রাজনৈতিক দরকষাকষি নয়, কোন রাজনৈতিক

চালবাজিও নয়–এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। আমি বিশ্বাস করি যে, এই ৬-দফার বাস্তবায়নের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা–তথা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি সুসংবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠতম গ্যারান্টি নিহিত।

শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁহার ৬-দফা সুপারিশ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদের মধ্যকার সংঘাতেরই প্রশ্ন। বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের সঙ্গে এই ৬-দফার কোন বিরোধ নাই। তিনি বলেন যে, জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই দেশবাসীর সামনে তিনি তাঁহার ৬-দফা পেশ করিয়াছেন। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থেই ৬-দফার প্রতি সকল মহলের সমর্থনই তাহার কাম্য।

'১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আজ গ্রহণযোগ্য নয়' বলিয়া যাঁহারা যুক্তি দেখাইতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের ভিত্তি। এই প্রস্তাব ভিত্তিক 'ভাবী পাকিস্তানের' উপরই পাক-ভারতের জনসাধারণকে মতামত দানের জন্য সেদিন আহ্বান জানান হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাক-ভারতের মুসলমানেরা এই লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করিয়াছিল। এই পর্যায় এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে মুসলিম লীগের উদ্যোগে যে 'লেজিস্লেটরস কনভেনশন' হয় তার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে নির্বাচনে জনসাধারণ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষেই রায়দান করে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত সত্যকে বানচাল করিয়া দেওয়ার কোন এখতিয়ার দিল্লীর লেজিসলেটরস কনভেনশনের ছিল না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ যেভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, সেভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্ণ গঠনতান্ত্রিক এখতিয়ার প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে আওয়ামী লীগ দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারেন কেবল তাঁহারাই–আওয়ামী লীগের গঠনতান্ত্রিক সম্পর্কে যাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কেবলমাত্র স্বকপোকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এই ৬-দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কি, গণভোটের মাধ্যমে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দেশবাসী আপামর জনসাধারণ ৬-দফার পক্ষে আছে এবং বিগত যুদ্ধের স্মৃতি যাঁরা সুষ্ঠুভাবে স্মরণ রাখিয়াছেন, তাঁদের এই ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন উপায়ই নাই।

কাউন্সিল লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা আজ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন শেখ মুজিব তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ১৯৫৪ সালে যে একুশ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগকে খতম করা হইয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সেই একুশ দফার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল।

একটু চেষ্টা করিলেই ৬-দফার বিরুদ্ধাচারীরা নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে পারিবেন যে, ১৯৫৪ সালের সে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দেশবাসী জনসাধারণ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত একুশ দফার সমর্থকগণকেই শতকরা ৯৭টি আসনে জয়যুক্ত করিয়াছিল। আর উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া তদানীন্তন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলকে ভরাডুবি বরণ করিতে হইয়াছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তথা লাহোর প্রস্তাবের ইস্যুটিকে যদি কেহ বা কোন দল পুনরায় গণআদালতে উত্থাপন করিয়া আর একবার জনমত যাচাই করিয়া দেখিতে রাজী থাকেন, আমরা সানন্দে তাঁহাদের সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগের নামে এতকাল কায়েমী স্বার্থবাদী মহল যে গণবিরোধী ও পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা খতম হইয়াছে। তাই আজ তাঁহাদের কেহ কেহ নূতন উদ্যমে ইসলামের দোহাই দিয়া সমগোত্রীয়দের সহিত একীভূত হইয়া নূতন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জনাব আবদুল হাই ৬-দফা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের দেশপ্রেমের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, শেখ মুজিব তাহার জবাব দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, মৌলিক গণতন্ত্রের দেশে মন্ত্রীকে কেবল সৌজন্যের খাতিরেই মন্ত্রী বলা হয়। আসলে জনাব হাই কেবল নামেই মন্ত্রী- কারণ তিনি যেমন দেশবাসীর প্রতিনিধি নন, তেমনি তাঁর পলিসি নির্ধারণেরও কোন ক্ষমতা নাই।

শেখ মুজিব দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল শান্তিকামী মানুষকে বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডত্ব রক্ষার প্রশ্নটি পুনরায় গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার আহ্বান জানান।

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বক্তৃতাকালে ১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবির বিরোধিতাকারীদের সমালোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, যখনই জনগণের অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, তখনই ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী দাবি উত্থাপনকারীদের বিভেদ সৃষ্টিকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই তাদের এ অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বঙ্গবন্ধু ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান

জানান। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৯৬৬ সালের ১৭ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল : 'আপনাদের অভিযোগ নূতন নহে'–শেখ মুজিব'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (বুধবার) বিকালে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য যে- কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।
>
> তিনি বলেন যে, জনগণের মৌলিক ও সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্যই এই সকল দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ।
>
> পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যখনই জনগণের অধিকার আদায়ের দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে তখনই ক্ষমতাসীনরা দাবী উত্থাপনকারীদের বিভেদ সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার ন্যায় সম্মানিত নেতাকেও রাষ্ট্রদ্রোহী ও রাষ্ট্রের শত্রু আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। অতএব আপনাদের এই অভিযোগ নূতন নয় এবং এই সব অভিযোগ জনগণকে বিপথে পরিচালিত করিতে পারিবে না।

১৯৬৬ সালের ২৫ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মী সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অভিযোগ করেন যে, ছয়দফা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও সরকার সমর্থক পাকিস্তানের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ছয়দফার সমালোচনায় উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু তাই না, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও ছয়দফা দমনে গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত একটি খবর ২৬ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়াছে–তাই বিরোধিতা' চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মীসভায় শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা'। চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> আজ এখানে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬-দফা দাবী কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানিয়াছে

বলিয়াই কোন কোন মহল উহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলিতেছে। প্রেসিডেন্ট গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেসিডেন্টের ন্যায় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল কথা বলায় এই কথাগুলি বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, যে মুহূর্তে দেশবাসী ৬-দফা সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবিতেছেন, তখন অপর কোন বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৬৬ সালের ৪ জুন সমগ্র প্রদেশের পথে প্রান্তরে ছয়দফা কর্মসূচির সমর্থনে এবং সরকারের দমননীতির সমালোচনা করে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, ছয়দফার বাস্তবায়ন, দেশরক্ষা বিধির ও সংবাদপত্রের বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। এ সংক্রান্ত একটি খবর ৫ জুন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল : 'শহর-বন্দর-গ্রামের পথে-প্রান্তরে মিছিল ও সভা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

গতকাল (শনিবার) ঢাকা শহরের একদল যুবকর্মী আজিমপুর ও নিউমার্কেট এলাকায় পথসভা করে। তাহারা আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর সমর্থনে বক্তৃতা করে।

এইদিন আওয়ামী লীগ কর্মীরাও বায়তুল মোকাররম, নবাবপুর রোড, হোসেন মার্কেট, সিদ্দিক বাজার, আলুর বাজার, কাজী আলাউদ্দিন রোড, নাজিরা বাজার, ফ্রেন্স রোড ও ইংলিশ রোড এলাকায় পথসভা করে। তাহারা বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলি ও আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করে। তরুণ ও যুবকদের এক বিরাট মিছিল সদরঘাট, লিয়াকত এভেন্যু, নবাবপুর রোড ও জিন্নাহ এভেন্যু পরিক্রম করিয়া বায়তুল মোকাররমে আসিয়া এক সভায় মিলিত হয়। তাহারা ৬- দফা কর্মসূচীর সমর্থনে বিভিন্ন ধ্বনি দেয় এবং সরকারের দমনমূলক নীতির সমালোচনা করে। সভায় শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

১৯৬৬ সালের ৫ জুন গফরগাঁও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় নূতন বাজার ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬-দফার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দেশের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সংস্থার সমর্থন কামনা করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি খবর ৭ জুন ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'গফরগাঁও-এ বিরাট জনসভা ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন

অব্যাহত রাখার সংকল্প'। খবরটি পরিবেশন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের গফরগাঁওয়ের নিজস্ব সংবাদদাতা। এই খবরে বলা হয়:

গত শনিবার গফরগাঁও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় নূতন বাজার ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারকার্যে মাইক ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ থাকায় ভালভাবে প্রচারকার্য চালানো সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া ঢাকা হইতে যে সকল নেতৃবৃন্দের আসার কথা ছিল, তাহারা গ্রেফতার হইয়া পড়ায় আসিতে পারিবেন না জানিয়াও চতুর্দিক হইতে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণ সভাস্থলে আগমন করিতে থাকে এবং স্বল্পক্ষণের মধ্যে সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় ও শেষ পর্যন্ত সভাস্থলে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। গফরগাঁওয়ের অনুষ্ঠিত স্মরণকালের এই বৃহত্তম জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এ,বি, গোলন্দাজ।

সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার ভাষণে বলেন যে, ৬-দফা পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মিলন সেতু স্বরূপ, ৬-দফার মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি বিধান।

৬-দফা পাকিস্তানের ভিত্তিমূল দুর্বল করিবে বলিয়া সরকার যে প্রচার চালাইতেছেন সৈয়দ নজরুল বাস্তব দৃষ্টান্ত ও যুক্তির মাধ্যমে তাহার অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দ্বারা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক কাঠামো আরও জোরদার হইবে। তিনি ৬-দফার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দেশের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সংস্থার সমর্থন কামনা করেন। সভায় ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের নিন্দা ও সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতাদানের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

নয়. ছয়দফার বিরুদ্ধে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোও ছয়দফা দাবির সমালোচনা করেন। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছয়দফা সম্পর্কে বিতর্ক করতে চান। ২১ মার্চ এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'কনভেনশন লীগের প্রস্তাব 'রাষ্ট্রদ্রোহ অভিযানের' বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী'। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরটিতে লেখা হয়:

গতকাল (রবিবার) ঢাকায় কনভেনশন মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে "রাষ্ট্রদোহ অভিযানের" মোকাবিলা এবং ইসলামী আদর্শবাদ ও মুসলিম বাসভূমির সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট আহ্বান জানানো হয়। খাজা শাহাবুদ্দিন প্রস্তাবটি উত্থাপন এবং মেসার্স জেড এ ভুট্টো, আবদুল ওয়াহিদ খান ও ফজলুল বারী উহা সমর্থন করেন।

পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বে ভাঙ্গন এবং জনসাধারণের ঐক্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কতিপয় রাজনৈতিক দেশে যে "বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন" আরম্ভ করিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সম্মেলনে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। দলীয় প্রধান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

"এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র" প্রতিরোধ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের চরম আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে দেশ দরদী ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে কতিপয় রাজনীতিকের অশুভ কার্যকলাপ সম্পর্কে খাজা শাহাবুদ্দীন জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দেন। এঁদের ঘৃণ্য দুরভিসন্ধি বানচাল করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবের প্রতি ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ

খাজা শাহাবুদ্দীনের অভিমত সমর্থন করিয়া জনাব ভুট্টো বলেন যে, পাকিস্তান "শাশ্বত ও অক্ষয়"। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে চ্যালেঞ্জ করিয়া তিনি বলেন যে, সাধারণ কনভেনশন লীগ কর্মী হিসাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের যেকোন স্থানে একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া ৬- দফা আলোচনা করিতে প্রস্তুত।

সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাজুদ্দিন আহমদ ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত খবর দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৬৬ সালের ২২ মার্চ প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর প্রতি তাজুদ্দিন প্রস্তুত আছি: আর গণভোট অনুষ্ঠান করিয়াই দেখুন না–'। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরটিতে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব এবং কনভেনশন লীগের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬-দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের যে-কোন স্থানে একই প্লাটফর্মে আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ মুজিবর রহমানের সহিত 'বাকযুদ্ধে' অবতীর্ণ হওয়ায় যে চ্যালেঞ্জ

> দিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে উহার নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। জনাব তাজুদ্দীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব ভুট্টোকে আগামী রবিবার পল্টন ময়দান অথবা তাহার (ভুট্টোর) পছন্দ মত প্রদেশের অপর যে-কোন স্থানে একটা জনসভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাইয়াছেন। অথবা জনাব ভুট্টো রাজী থাকিলে আওয়ামী লীগই উক্ত দিবস পল্টন ময়দান বা ভুট্টোর পছন্দ মত প্রদেশের যে-কোন স্থানে জনসভার আয়োজন করিতে প্রস্তুত আছে বলিয়া জানান।
>
> সঙ্গে সঙ্গে জনাব তাজুদ্দীন জনাব ভুট্টোকে ৬-দফার স্বপ্নটা চিরতরে মীমাংসার জন্য তাঁহার নেতাকে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গণভোট অনুষ্ঠানে রাজী করাইবার প্রস্তাব দেন এবং উক্ত গণভোটে জনাব ভুট্টোর দল শতকরা ৩০টি ভোট পাইলে আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রশ্নে স্বীয় নীতি পুনর্বিবেচনায় প্রস্তুত বলিয়া ঘোষণা করেন।

কিন্তু চ্যালেঞ্জের বিপরীতে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে সাড়া দেননি ভুট্টো। প্রায় একমাস পর ১৯৬৬ সালের ১৪ এপ্রিল জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার প্রতি পুনরায় চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। ভুট্টোর দেয়া চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সানন্দে গ্রহণ করেন। এ প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনাব ভুট্টোকে ২৪ শে এপ্রিল পল্টন ময়দানের জনসভায় ৬-দফার প্রশ্নে বৈঠকে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু জনাব ভুট্টো এতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যেহেতু জনাব ভুট্টোর প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট নয়, সেহেতু আমি তাঁকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, জনগণের দাবি ৬-দফা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হবে প্রকাশ্য জনসভায়–কারও খাস কামরায় নয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৫ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '১৭ই এপ্রিল 'সম্মুখ সমর', কিন্তু কোথায়? শেখ মুজিব বলেন: রাজী, তবে খাস কামরায় নহে', জনাব ভুট্টো বলেন: রাজী, তবে ১৭ই তারিখে'। এতে বলা হয়:

> প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের সহিত ৬-দফার প্রশ্নে মোকাবিলা সভায় মিলিত হওয়ার সপক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সর্বশেষ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে শেখ মুজিবর রহমান বলেন : নিজ 'কর্মব্যস্ততার' দরুন আমার প্রস্তাব মতে, ২৪ শে এপ্রিল পল্টন ময়দানের জনসভায় ৬-দফার প্রশ্নে আমার মোকাবিলা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আগামী ১৭ই এপ্রিল এই মোকাবিলার যে প্রস্তাব দিয়াছেন, আমি সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু যেহেতু জনাব

ভুট্টোর প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট নহে, সেই হেতু আমি তাঁহাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, জনগণের দাবী ৬-দফা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হইবে প্রকাশ্য জনসভায়–কাহারও খাস কামরায় নহে।

জনাব ভুট্টো বলেনঃ

রাজী, তবে ১৭ই তারিখে

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জেড এ ভুট্টো এ,পি,পি প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার ছয়দফা প্রশ্নে মোকাবিলা করার জন্য সময়াভাবের দরুন আমি তাঁহার আমন্ত্রণের আশুতম সুযোগ গ্রহণ করিতেছি। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে চলতি মাসের ২৪ তারিখে পল্টন ময়দানে বৈঠকে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানাইয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদি সম্পর্কে এই ধরনের মোকাবিলার প্রস্তাবকে আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু চলতি মাসের ১৯ তারিখে আংকারায় সেন্টো সম্মেলনে যোগদানের জন্য এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার কর্মসূচী থাকায় ২৪ শে এপ্রিল তাঁহার সংগে আমার বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। তবে জনাব মুজিবর রহমানও ২৪শে এপ্রিলের পূর্বেই বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রস্তুত থাকায় আমি তাঁহার সংগে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রস্তুত রহিয়াছি। আর এজন্যই ১৭ই এপ্রিল আমার করাচী যাওয়ার কথা থাকিলেও আমি ঐদিন যাত্রা স্থগিত রাখিতে এবং ২৪শে এপ্রিলের পরিবর্তে ১৭ই এপ্রিল আমি জনাব মুজিবর রহমানের সংগে বৈঠকে মিলিত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছি"।

ভুট্টোর প্রস্তাব অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ১৭ এপ্রিলই বিতর্কে অবতীর্ণ হতে রাজি হন। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৫ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো–মুজিব মোকাবিলা প্রসঙ্গে–'। এতে বলা হয়:

> আগামী ১৭ই এপ্রিল ৬ দফা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ জনাব ভুট্টোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব ভুট্টো ১৭ই এপ্রিল আলোচনার দিন ধার্য করার প্রস্তাব করেন এবং শেখ মুজিবর রহমান তাহা গ্রহণ করেন।
>
> আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের যুক্ত উদ্যোগে জনৈক হাইকোর্ট জজের সভাপতিত্বে আগামী ১৭ই এপ্রিল বিকাল ৪টায় ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে উপরিউক্ত জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগ

> লিখিতভাবে প্রস্তাব করে। সভার জন্য অবিলম্বে যাহাতে প্রচারকার্য শুরু করা যায়, তজ্জন্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যার মধ্যে জনাব ভুট্টোকে সভার ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়ার জন্য জনাব তাজুদ্দিন অনুরোধ জানান।
>
> সভা সম্পর্কে আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোর আমন্ত্রণক্রমে গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত্রি ৮-৩০টায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তাঁহার (জনাব ভুট্টোর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
>
> জনাব ভুট্টো ১৭ই এপ্রিল জনসভা অনুষ্ঠানের পুনরুল্লেখ করেন। তবে আজ (শুক্রবার) ১২-৩০টার পূর্বে জনসভার ব্যবস্থাদি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের ব্যাপারে অক্ষমতা জানান। অনেক বিলম্ব হইয়া গেলেও আওয়ামী লীগ আশা করে যে, আজ ১২-৩০টার মধ্যে জনাব ভুট্টো অবশ্যই তাহার অনুমোদনের খবর জানাইবেন এবং জনসভা অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান জুলফিকার আলী ভুট্টো। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তিনি ছয়দফার প্রশ্নে একই মঞ্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল যশোর টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কেটে পড়ায় ৬-দফার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিজয় সূচিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৬ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: জনাব ভুট্টো কাটিয়া পড়ায় ৬-দফার নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে। যশোর থেকে বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান অদ্য স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় শ্রোতাদের একটানা আনন্দ ও হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পড়ায় ৬-দফার ব্যাপারে আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিজয় সূচিত হইয়াছে। তাঁহার এই পশ্চাদপসরণ শুধু তাঁহার একারই পরাজয় নহে, ইহা সামগ্রিকভাবে বর্তমান সরকারেরই পরাজয়। কারণ, স্বয়ং প্রেসিডেন্টসহ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হর্তাকর্তাদের প্রায় সকলেই এখানে উপস্থিত, তখনও তাঁহারা ৬-দফা প্রশ্নে সামনা-সামনি দাঁড়াইতে সক্ষম হন নাই।

শেখ মুজিব বলেন যে, ৬-দফা সম্পর্কে জনমতের সামনে দাঁড়াইতে তাঁহাদের সাহস না হওয়ায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেন্দ্রীয় চক্র জনসাধারণ সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত।

জনাব ভুট্টোর পিঠটানের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় চক্র আরও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ৬-দফার প্রতি জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, আমি এ ধরনের আঠারো শতকী মোকাবিলা প্রস্তাবে বিশ্বাসী নহি। আমরা জনমত যাচাইর জন্য গণভোটে বিশ্বাসী। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো যখন আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিলেন, তখন আমাদের উহা গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। আমরা জনপ্রতিনিধি। তাই, জনগণের আদালতেই আমাদের বিচার হইবে। জনাব ভুট্টোর প্রতি এজন্যই করুণার উদ্রেক হয় যে, তিনি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়া ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমরা সেই লোক যাঁহারা জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী।

আমরা সর্বদাই জনগণের রায় গ্রহণে প্রস্তুত। ভুট্টো সাহেবের পিঠটানের ফলে আমাদের ছয়-দফার নৈতিক বিজয়ই সূচিত হইয়াছে। ইহা শুধু আমার বা আওয়ামী লীগের জন্যই আনন্দের বিষয় নহে, ইহা বস্তুত জনগণের জন্যই আনন্দের বিষয়। সুতরাং, আসুন, আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং আমাদের ছয়-দফা দাবী বাস্তবায়িত করার জন্য দশ কোটি লোকের পক্ষ হইতে আপোষহীন সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোর অগৌরবজনক পশ্চাদপসরণের জন্য আমার দুঃখ হয়। তবে এই প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রতি ছয়-দফা প্রশ্নে জনমত যাচাইর জন্য অবিলম্বে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের উপরই নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানই জনশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশকে রক্ষা করিতে পারে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গৃহযুদ্ধের যে-হুমকি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন কাহাদের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধ হইবে? তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লক্ষ্যে পৌছানোর নীতিতে বিশ্বাস করি।

পরদিন ১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল ভুট্টোর বক্তব্য ভিত্তিক একটি খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'সম্মুখ সমরের শেষ অঙ্ক'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬-দফার প্রশ্নে একই মঞ্চে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবরের মোকাবিলা করার যে চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন এবং এই চ্যালেঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া সরকারী ও

বিরোধী পক্ষের দুই নেতার 'সম্মুখ সমরের' দৃশ্য দেখিবার জন্য সাধারণ্যে যে ঔৎসুক্য জাগিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত জনাব ভুট্টোর পক্ষে তাহার সংকল্পে স্থির থাকা সম্ভব না হওয়ায় প্রস্তাবিত মোকাবিলা সভার সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। যে কারণে প্রস্তাবিত 'সম্মুখ সমরের' শেষাঙ্কের যবনিকাপাত হইল, শুক্রবার অপরাহ্নে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তাহার বিবরণ দিয়া একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ পাইয়া জনাব ভুট্টোও ঐদিন শেষ রাত্রের দিকে একটি বিবৃতি দিয়া মোকাবিলা সভার প্রস্তুতি প্রচেষ্টার যবনিকাপাতের নিজস্ব 'ব্যাখ্যা' দেন।

শুক্রবার অপরাহ্নে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিবৃতিটিতে বলা হয়: ৬-দফা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৭ই এপ্রিলের জনসভার পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বদিন রাত্রের ব্যবস্থামত গতকাল (শুক্রবার) ১২-৩০ টায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দিন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সরকারী দলের নেতা দেওয়ান আবদুল বাসিত, রাজস্ব মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ এডহক কমিটির সম্পাদক জনাব ফজলুল বারী এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেনও এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

"জনাব ভুট্টো আওয়ামী লীগ নেতাদেরও জানান যে, তিনি স্বয়ং ১৭ই এপ্রিল জনসভায় ৬-দফার উপর বিতর্কের জন্য তাঁহার প্রস্তাবে অবিচল থাকিতে আগ্রহশীল থাকিলেও চেয়ারম্যান লিও শাও চী'র সফর উপলক্ষে ব্যস্ত থাকার জন্য মুসলিম লীগ নেতারা উক্ত জনসভার আয়োজন করিতে তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেরাই ঐদিনের সভানুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী আছেন বলিয়া জানান। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা সম্মত হন না। শেষ মুহূর্তে মুসলিম লীগ অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করায় জনাব ভুট্টো কর্তৃক নির্দিষ্ট ১৭ই এপ্রিলের জনসভার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।"

"এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জনাব ভুট্টোর প্রথম চ্যালেঞ্জের পর আওয়ামী লীগ তাহা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে। পরে জনাব ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহার বর্তমান অবস্থানের সময় একই মঞ্চ হইতে ছয়-দফার উপর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। শেখ মুজিব এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জনাব ভুট্টোকে আগামী ২৪শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। জনাব ভুট্টো নিজেই ১৭ই এপ্রিল তাঁহার পক্ষে সভার

জন্য সুবিধাজনক তারিখ হইবে বলিয়া স্থির করেন। শেখ মুজিব পূর্বেকার কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও ১৭ই এপ্রিল জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য জনাব ভুট্টোর প্রস্তাব মানিয়া লন এবং তাঁহার কর্মসূচী বাতিল করিয়া জনাব ভুট্টোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব তাজুদ্দিনের উপর ভার দেন। জনাব ভুট্টো সকল সময়েই ১৭ই এপ্রিল জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ দেখাইলেও উপরের বর্ণিত অবস্থায় তাহার প্রস্তাবের আর কোন মূল্যই রহিল না।

১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল ছয়দফার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মোকাবিলা করার সমস্ত সম্ভাবনা দূর হওয়ার পর জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বিবৃতি প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৭ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জনাব ভুট্টোর বিবৃতি'। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

৬-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবের সহিত মোকাবিলার সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে তৎসংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া শুক্রবার অপরাহ্নে বিবৃতি দেওয়ার খবর প্রাপ্তির পর ঐদিন রাত্রি ২টা ২০ মিনিটে জনাব ভুট্টো যে বিবৃতি দেন, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল:

"ছয় দফা সম্পর্কে জনসমাবেশে মোকাবিলার প্রশ্নে ঘটনাপঞ্জী এবং আসল তথ্যাবলী নিম্নরূপ:–

"১৪ই তারিখে শেখ মুজিবর রহমান সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে জানান যে, ২৪শে এপ্রিল তারিখে মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুক্ত উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠানে তিনি সম্মত আছেন। তিনি অবশ্য ইহাও উল্লেখ করেন যে, উক্ত তারিখের পূর্বেও তিনি মোকাবিলায় প্রস্তুত আছেন।

"একই দিনে আমি এক বিবৃতিতে ১৭ই তারিখে সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করি। কারণ ১৯শে তারিখে আমাকে আন্ধারা রওয়ানা হইতে হইবে। শেখ মুজিবর রহমানের সুপারিশ মোতাবেক উভয় দলের যুক্ত উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য আমি পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকটও একটি তারবার্তা প্রেরণ করি। একই দিবসে জনাব তাজউদ্দিন আমার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনটি শর্ত আরোপ করেন:- (ক) পল্টন ময়দান নামে সুপরিচিত আউটার ষ্টেডিয়ামেই জনসভার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (খ) ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ন চার ঘটিকায় সভার সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে। (গ) আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের যুক্ত উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করিতে হইবে।

"হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে সভাপতি করার জন্যও পত্রে সুপারিশ করা হয়। একই দিন অপরাহ্নে জনাব তাজউদ্দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

"সময়ের স্বল্পতার দরুন জনাব তাজউদ্দিন মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী প্রস্তাব স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করেন এবং তদস্থলে যুক্ত সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি করার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারীর নাম সুপারিশ করেন।

"১৫ই তারিখ সকালে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত যোগাযোগ করা হয়। তিনি রাজনৈতিক সভার সহিত বিচার বিভাগকে জড়িত করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফলে আওয়ামী লীগের এতদসংক্রান্ত সুপারিশ কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। জনসভার কার্যপদ্ধতি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে জনাব তাজউদ্দিন পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুসলিম লীগের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগের জনাব জহিরউদ্দিনও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর উভয়পক্ষই একমত হন যে, এত স্বল্পসময়ে এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জনসভার প্রয়োজনীয় যাবতীয় এন্তেজাম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ বোধগম্য কারণে ১৭ই তারিখের জনসভা অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলিয়া উভয়পক্ষই উপলব্ধি করেন। ইহাও স্থিরকৃত হয় যে, সময়ের স্বল্পতার দরুন এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান সম্ভব নয়– এই মর্মে উভয় দলের কর্মকর্তাদের যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হইবে।

"বৈঠকে উপস্থিত সকলে উক্ত মর্মে একমত হওয়ার পর বৈঠক মুলতবী রাখা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পৃথক বিবৃতি প্রকাশে আমি বিস্মিত হইয়াছি।

তদুপরি এই বিবৃতিতে ঘটনাবলীর প্রকৃত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। আমি এখানে পুনর্বার উল্লেখ করিতেছি যে, আশু সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ১৪ই তারিখে শেখ মুজিবের বিবৃতি ও জনাব তাজউদ্দিনের পত্রের শর্তাবলী পূরণে আমি সকল দিক দিয়াই সহযোগিতা করিয়াছি। শুক্রবার অপরাহ্নে উভয় দলের বৈঠকের এই তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনায় ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে, পূর্ণ শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও এই মাসের ১৭ই তারিখে যুক্ত সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই। এই তারিখে সভার আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই বটে; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, শেখ মুজিবকে মোকাবিলার জন্য আমার পূর্বোক্ত ঘোষণা হইতে আমি কোনক্রমে বিচ্যুত হইয়াছি। বরঞ্চ আমার সর্বপ্রকার সহযোগিতা সত্ত্বেও সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আমি হতাশ।

দশ. ছয়দফা সমর্থনে জনসভা

বঙ্গবন্ধু ছয়দফার সপক্ষে জনমত তৈরি করার লক্ষ্যে সারা দেশে গণসংযোগ শুরু করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভায় ছয়দফা তুলে ধরেন তিনি।

ছয়দফার সমর্থনে বিভিন্ন জনসভায়-পথসভায় ছয়দফার পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি হতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা অনুমোদনের পর ১৯৬৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছয়দফার প্রতি জনসমর্থন আদায়ে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ছয়দফা অনুমোদনের পর জনসমক্ষে এটিই হবে সর্বপ্রথম জনসভা। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে আয়োজিত এই জনসভায় জনসাধারণের নিকট ছয়দফা পেশ করা হবে এবং উক্ত জনসভায় চট্টগ্রামবাসীকে দলে দলে যোগদান করার আহ্বান জানান। সর্বপ্রথম জনসমক্ষে ছয়দফা কর্মসূচির পটভূমি, বাঙালীদের জন্য এর অপরিহার্যতা এবং দাবি আদায়ে কি করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হবে। ১৯৬৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জনগণের নিকট ৬-দফা পেশ, আগামীকল্য চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জনসভা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> আগামীকল্য (শুক্রবার) চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সাম্প্রতিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত তাহাদের ৬-দফা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবেন।
>
> গত রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি শেখ মুজিবরের ৬ দফা অনুমোদনের পর ৬ দফার প্রতি জনসমর্থন আদায়ের ব্যাপক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রারম্ভ হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আগামীকল্য লালদীঘি ময়দানের গণ-আদালতে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারী বেগমগঞ্জে এই নেতৃবৃন্দ আর এক জনসভায় আওয়ামী লীগের ৬ দফা পেশ করিবেন।
>
> আওয়ামী লীগের ৬ দফা প্রস্তাবের পর চট্টগ্রামেই সর্বপ্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া আপামর জনসাধারণ এই জনসভাকে সাধারণ বা গতানুগতিক জনসভা মনে না করিয়া উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে।
>
> প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ এবং চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এন,জি, মাহমুদ কামাল ইতিমধ্যে এক বিজ্ঞপ্তিতে চট্টলবাসীকে দলে দলে লালদীঘি ময়দানে সভায় যোগদান করিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

> এবং পূর্ব পাকিস্তানের অপরাপর দাবী-দাওয়ার সপক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত লালদীঘি ময়দানে ছয়দফা কর্মসূচি নিয়ে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামবাসীকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সুস্পষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে ছয়দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার প্রতি লালদীঘির বিরাট জনসভার অকুণ্ঠ সমর্থন 'দেশ ও দশের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে' দাবী আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা'। দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> অদ্য বন্দর-নগরী চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রায় ৬ ঘণ্টাব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্প্রতি ঘোষিত ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি চট্টগ্রামবাসী অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া দেশ ও দশের বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের আশা ও আকাংক্ষার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসায় আওয়ামী লীগের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়। সভায় গৃহীত এই প্রস্তাবে দেশের আপামর জনসাধারণকে ৬-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি জনমত যাচাইর প্রয়াস ইহাই প্রথম। এই উপলক্ষে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা হইতে আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আজ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত লালদীঘি ময়দানের জনসভায় দলীয় ৬-দফার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন।
>
> বিগত কিছুদিন যাবৎ কেবল পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় যে ৬-দফার কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, আজ নেতৃবৃন্দের মুখ হইতে প্রত্যক্ষভাবে উহার পটভূমি, জাতীয় জীবনে উহার তাৎপর্য ও আগামী দিনের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত পথনির্দেশ পাইবার জন্য লালদীঘি ময়দানে সভার বহু পূর্ব হইতেই বিপুল জনসমাগম হয়। নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এতই উৎসাহিত বোধ করিতে থাকে যে, শেখ মুজিবরের আহ্বানে শূন্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া একবাক্যে তাহারা ঘোষণা করে যে, ৬-দফার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়া দেশ ও দশের সত্যিকার কল্যাণসাধনের সংগ্রামে যে কোন বাধা-বিপত্তি তাঁহারা হাসিমুখে বরণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সমস্বরে উচ্চারিত '৬-দফা মানতে হবে,' আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

দিতে হইবে' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্য দিয়া তাহারা আওয়ামী লীগের দাবীকে বুলন্দ করিয়া তোলে। শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত যুদ্ধের আলোকে গোটা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির চুলচেরা বিচার করিয়াই আওয়ামী লীগ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, বিশ্ব মানচিত্রে পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী ও সত্যিকার সুসংহত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির চির অবসান ঘটাইতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থী মহল এবং এই মহলের যেসব এজেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে আজও তৎপর আছেন, তাঁহাদের শেষবারের মত আজ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, পাকিস্তানের এক অংশকে অন্য অংশের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপনিবেশে পর্যবসিত করা সম্ভব নয় আর সত্যিকার অর্থে তাঁহাদের এ প্রচেষ্টা পাকিস্তানকে দুর্বল করারই নামান্তর। তাঁহাদের আরও বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা তাঁহাদের কারচুপি ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই জন্যই তাঁহারা আজ বিগত কালের 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানকে মজবুত করিতে বদ্ধপরিকর। আর এই উদ্দেশ্য লইয়াই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা আকাংক্ষা মোতাবেক আওয়ামী লীগ এই ৬-দফা প্রণয়ন করিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসী আপামর জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, প্রকৃত অর্থে এই ৬-দফা কর্মসূচী আওয়ামী লীগের নয়, এই ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের। এই ৬-দফা বাস্তবায়নের সংগ্রামে যে অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে, সেই অত্যাচার-নির্যাতনের ভাগী হওয়ার জন্যই আমরা জনতার কাতারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। জনগণের এই ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষ সকল মহলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রধানত: ৬-দফার অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি দেশ ও দশের কল্যাণকামী মন লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদগণকে আওয়ামী লীগের ৬-দফা পরীক্ষা করিয়া দেখার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, যিনিই দেশ ও দশের স্বার্থকে সর্বোপরি স্থান দিবার মানসিকতার পরিচয় দিতে পারিবেন, তিনি আমাদের সহিত একমত হইবেন যে ৬-দফার বাস্তবায়ন ছাড়া শক্তিশালী ও সুসংহত পাকিস্তানের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

সভা শেষে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতি লালদীঘির শ্রোতৃমণ্ডলী অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় ও দেশবাসীর আশা ও আকাংক্ষার নিরিখে সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে সময়োচিত নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসায় আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানায়। প্রস্তাবে প্রদেশব্যাপী ৬-দফার সমর্থনে দুর্বার

গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ পথে সকল সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে ভারতসহ সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয়।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৬৬ সারের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের জে, এম, সেন হলে আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবির তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবাসী জনসাধারণের ঈপ্সিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এই রূপরেখার বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের ৬-দফার বাণী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ ভোগ করিতে পারে–আওয়ামী লীগের ৬-দফা দেশবাসীর ঈপ্সিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা: দলীয় কর্মসূচী 'কি ও কেন' ব্যাখ্যা'। চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্টটি পরিবেশন করেন ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি। রিপোর্টটিতে বলা হয়:

'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নহে,– শক্তিশালী পাকিস্তানই ছিল দেশবাসীর বরাবরের কাম্য। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের শাঠ্য ও চক্রান্তের মারপ্যাঁচে জনগণের সে কামনা বরাবরই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। এবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধে দেশবাসী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সেই সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই দেশবাসী আজ নূতন করিয়া অনুধাবন করিয়াছে যে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নহে– কেবলমাত্র শক্তিশালী পাকিস্তানই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের নিবিড় ঐক্য ও সংহতির একমাত্র রক্ষা কবচ। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবাসী জনসাধারণের ঈপ্সিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এই রূপরেখার বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের ৬-দফার বাণী লইয়া গ্রামে গ্রামে আপনারা ছড়াইয়া পড়ুন। --অদ্য স্থানীয় জে, এম, সেন হলে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সভায় সমাগত সহস্রাধিক আওয়ামী লীগ কর্মীর উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান এই উদাত্ত আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বলেন : অতীতের মত ভবিষ্যতেও গণতন্ত্রকে যাতে কায়েমী স্বার্থের শিকারে পর্যবসিত হইতে না হয়, দেশবাসীকে যাতে গণতন্ত্র কায়েম থাকা অবস্থায়ও মহল বিশেষের অনুগ্রহ বা অনুকম্পার উপর নির্ভর করিতে না হয়, গণতন্ত্র মতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ নিজের বা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খতম করিতে না পারে, সর্বোপরি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইলে দেশবাসী যাতে অনন্তকাল ধরিয়া স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ জীবনের সর্বস্তরে ভোগ করিতে পারে, তার জন্যই আওয়ামী লীগ গত ১৮ বৎসরের শাসন ও শোষণের নির্যাতন ও বঞ্চনার আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি-সনদ ৬ দফা প্রণয়ন করিয়াছে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কি?

শেখ মুজিবর রহমান বলেন: এ যাবৎ আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিয়াছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর তাৎপর্য বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন নেতা কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাই আজ আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য ৬ দফার মধ্য দিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছি যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে আমরা কি বুঝি। দেশবাসীকে কেবল ধোকা দিবার নিমিত্ত আজও যাঁরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ফাঁকা শ্লোগান তোলেন, তাঁদের বুঝা উচিত যে, ফাকা বুলির যুগ শেষ হইয়াছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে তারা কি বোঝেন বা বুঝাইতে চাহেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার পাশাপাশি দফা-ওয়ারী-ভাবে আজ তাঁহাদিগকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। যদি তাহারা তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথাকে দেশবাসী রাজনৈতিক কারচুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভাঁওতা দেওয়ার আরেক দফা নূতন প্রয়াস বলিয়া গণ্য করিবে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, জেলার দূরবর্তী এলাকা হইতে আগত এক সহস্রাধিক সঙ্কল্পদৃঢ় আওয়ামী লীগ কর্মীর সমাবেশে শেখ সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন।

বৈষম্যের প্রশ্নে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের লইয়া কমিশন গঠনের দাবী

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রে দুই প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বীকার এবং উহা দূরীকরণের অঙ্গীকার করা হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে 'বৈষম্য' হ্রাস পাইতেছে না। তিনি বলেন যে, বর্তমানে বরং অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। শেখ মুজিব বলেন যে, স্বাভাবিকতার কদর থাকিলে তিনি এ ব্যাপারে তদন্ত কমিশনই দাবী করিতেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট যেভাবে দিবালোকের মুখ দেখিবার মওকা পায় না, এবং এই সেদিনও

ঈদের চাঁদ সংক্রান্ত ব্যাপারে গঠিত কমিটির ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশের ব্যাপারটিও যেভাবে ধামাচাপা পড়িয়াছে তাহাতে তিনি আর তদন্ত কমিশন দাবী করেন না। তৎপরিবর্তে তিনি জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসাব করার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানানই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

অন্যান্য দল সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নীতি

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি আওয়ামী লীগের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যে সব দল ৬-দফায় বর্ণিত দাবী-দাওয়ার স্বীকৃতি দিবেন, সেই সব দলের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আওয়ামী লীগ সর্বদাই প্রস্তুত। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং অন্যান্য দাবী পূরণের ব্যাপারে অপর কোন রাজনৈতিক দল আমাদের এই ৬-দফা অপেক্ষাও উন্নত কোন প্রস্তাব পেশ করিতে পারিলে আওয়ামী লীগ সানন্দে তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়া শেখ মুজিব ঘোষণা করেন। তিনি ঘরে ঘরে ৬-দফার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ

সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন যে, ৬-দফার সংগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের শেষ সংগ্রাম। সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ত্যাগ স্বীকার করার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, বঞ্চিত মানুষ বেদনাবোধ করিলেও তা' প্রকাশের শক্তি তাহাদের নাই। 'বেদনাকাতর সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হিসেবে আওয়ামী লীগ কর্মিগণকে আজ দেশবাসী জনসাধারণের সত্যিকার দাবী-দাওয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে' বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ দীঘিরপাড়ে আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আওয়ামী লীগের ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ৬-দফা দাবি আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রতিটি ইউনিয়ন যদি তিনজন করে কর্মী দেয়, তাহলে তিন বছরের মধ্যে ৬-দফা দাবি আদায় হবে ইনশাআল্লাহ বলে তিনি জোরালোভাবে আশা ব্যক্ত করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বেগমগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিব: ছয় দফা ১৮ বছরের অবিচারেরই স্বাভাবিক পরিণতি'। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত রিপোর্টে বলা হয়:

অদ্য বেগমগঞ্জ দীঘিরপাড়ে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে আওয়ামী লীগের ৬-দফা মানিয়া লইয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার চিরন্তন ভুল বোঝাবুঝির অবসান মিটাইবার আহ্বান জানান। সহস্র সহস্র শ্রোতার তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দাবী উত্থাপনের মধ্য দিয়া আওয়ামী লীগের কেহ ব্যক্তিগত কোন আকাংক্ষা চরিতার্থ করিতে চায় না এবং সরকার যদি এই ৬-দফা মানিয়া নেন, তবে 'আমি আদালতে হলপ করিয়া লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া আজীবন রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

যুদ্ধোত্তরকালে- বিশেষ করিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ৬-দফা দাবী উত্থাপনের পর নোয়াখালী জেলার এই সভা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জনসভায় জনসমাগম এবং বক্তাদের বক্তৃতার পর্যায়ে পর্যায়ে সহস্র কণ্ঠের 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সনদ ৬-দফা মানিতে হইবে' ধ্বনির মধ্য দিয়া জনসাধারণ তাহাদের আশা ও আকাংক্ষার বাঙ্ময় অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছে। দূর-দূরান্ত হইতে দ্বিপ্রহরের দিকেই জনতা মিছিল করিয়া সভাস্থলে আগমন করে এবং নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

শেখ মুজিবর বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', '৬-দফা দাবী মানতে হবে', ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। বক্তৃতার প্রারম্ভে শেখ সাহেব আবেগপ্রবণ কণ্ঠে নোয়াখালীর মাটি ও মানুষের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুমধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, নোয়াখালীর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবিস্মরণীয় স্মৃতি জড়িত। শহীদের অমর স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়া তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত আঠার বৎসর প্রায় সব কয়টি কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবিচার করিয়াছে, তাহারই অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি এই ৬-দফা দাবী। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, যে গতিতে আজও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারকে অব্যাহত রাখা হইয়াছে, এখনি যদি তা বন্ধ না করা হয় তবে ৬-দফার চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে তৈরী থাকিতে হইবে।

কারণ দর্শাইয়া তিনি বলেন যে, আজ যাঁহারা ৬-দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তান সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাই পাকিস্তানের জন্য তাঁদের মায়া আছে। পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহাদের

রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু পাকিস্তান সংগ্রামের এইসব বীর সেনানীর প্রায় সবাইর জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর পর যাঁহারা আসিতেছে তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝিকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচারকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহারা এই ভুল বোঝাবুঝি আর অবিচার অবসানের দাবী জানাইয়া যে প্রস্তাব করিবে তাহা ভয়াবহ পরিণতিশীল হইতে বাধ্য। ভাবীকালের এই ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবিয়াই আজ দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হইবে এবং সুদূরস্পর্শী দৃষ্টি লইয়াও ৬-দফাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়া আওয়ামী লীগ দল হিসাবে কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করার প্রয়াসী হয় নাই। এই দাবী উত্থাপন করিয়া আওয়ামী লীগ বাহবাও পাইতে চায় না। কারণ, এ দাবী সস্তা রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র নয়, এ দাবী শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরও দাবী নয়। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দাবী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয়েরই দাবী। ৬-দফা বাস্তবায়িত হইলে এই ৬-দফার শর্তানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা শুধু পূর্ব পাকিস্তানই ভোগ করিবে না, পশ্চিম পাকিস্তানও একই সুযোগ-সুবিধার ভাগী হইবে। তিনি অপরাপর রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি এক জিজ্ঞাসা তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, ৬-দফার মাধ্যমে কি এমন জিনিস পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেশী চাওয়া হইয়াছে যা একেবারেই দেওয়া যায় না। ইসলামের দোহাই দিয়া আজ যাহারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন তাঁহাদেরকে শেখ মুজিব স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইসলাম নির্বিচারে সকলের প্রতি ইনসাফ করার বিধান দিয়াছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কি এতদিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ করিয়াছে? যারা ইসলামের নামে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ করিতে সরকারকে বাধ্য করিতে পারে নাই, তাদের ইসলামের দোহাই দিয়া ইনসাফ লাভের পথ রুখিয়া দাঁড়াইবারও কোন অধিকার নাই।

শেখ মুজিব ৬ দফা দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রতি ইউনিয়নে মাত্র তিনজন করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প কর্মী তৈরীর আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রতিটি ইউনিয়নে যদি সংগ্রামে তিনজন করিয়া কর্মী দেয়, তবে ইনশাল্লাহ তিন বছরের মধ্যে ৬ দফা দাবী আদায় হইবে। শেখ মুজিব দেশবাসী আপামর জনসাধারণের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের ডাক জানাইয়া বলেন যে, আপনাদের বর্তমান অবস্থা, সমাজের প্রতিস্তরে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, দেশের বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক হালচাল- যে দিকেই তাকান না কেন, সেদিক হইতেই আপনারা সংগ্রামের হাতছানি দেখিতে পাইবেন। তাই, এখনই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন, নয় আর কখনো দাবী আদায়ের সুযোগ আসিবে না।

আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ৬ দফা দাবী পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ কি-না, তাহাই আজ সকল মহলের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। কার কণ্ঠে বা কোন্ দলের মারফৎ এ-দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, সে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে না যাওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এ দাবীর বিরোধী নয়। কারণ, এ-দাবী আদায় হইলে পূর্ব পাকিস্তান যেমন সুবিধা লাভ করিবে, পশ্চিম পাকিস্তানও একই সুবিধার অধিকারী হইবে। তিনি শ্রোতাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, ন্যায্য দাবীর সামনে সব সময়ই প্রবল বাধা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ঐ সব বাধা যত প্রবলই হোক না কেন, ন্যায্য দাবীর পথে উহা বেশী দিন টিকিয়া থাকে না।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অবতারণা করিয়া তিনি বলেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা যত দৃঢ় বাধার সৃষ্টি করিয়াছে ততো বেশী শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কামিয়াবির পথে আগাইয়া গিয়াছে।

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের 'পাম্প' হিসাবে নিজেদের ব্যবহার করিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা সফর শেষ করিয়া শেখ মুজিব গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যায় মোটরযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরীও ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীদলের নেতা ও নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। জেলা লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুর রশিদ সভার পক্ষ হইতে কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সভা সর্বসম্মতিক্রমে তাহা অনুমোদন করে। জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব নূরুল হক এমপিএ অতিথিদের ধন্যবাদ জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

ছয়দফার সমর্থনে ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তাগাছা দরিচারানীর বাজার ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দেন। এর পাঁচদিন আগেই বঙ্গবন্ধুর আগমন প্রসঙ্গে ৫ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '১০ই মার্চ শেখ মুজিবের মুক্তাগাছা সফর'। মুক্তাগাছা থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১০ ই মার্চ খোন্দকার মোশতাক আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক, জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব এবিএম নূরুল ইসলাম এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে মুক্তাগাছা আগমন করিতেছেন।

নেতৃবৃন্দ ঐদিন বিকাল সাড়ে ৩টায় দরিচারানীর বাজার ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফার ব্যাখ্যাদান করিবেন।

নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিমধ্যেই থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব ইয়াকুব আলীকে সভাপতি করিয়া ৫৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

১৯৬৬ সালের ১০ মার্চ মুক্তাগাছা দরিচারানী ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আওয়ামী লীগ কর্তৃক ছয়দফা প্রকাশ করার পর মুক্তাগাছায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এটিই ছিল প্রথম সফর। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '১৮ বছরব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান শোষণ ২শত বছরের বৃটিশ শোষণকেও হার মানাইয়াছে' –শেখ মুজিবর রহমান। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত এই রিপোর্টে বলা হয়:

স্থানীয় ডরিচারানী ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ বলেন যে, গত ১৮ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে শোষণ ও নির্যাতন চালানো হইয়াছে, ইংরাজ আমলের দুইশত বৎসরে তদানীন্তন ভারতের উপর এই পরিমাণ শোষণ ও নির্যাতন চালানো হয় নাই।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা প্রকাশ করার পর মুক্তাগাছায় শেখ মুজিবর রহমানের এই প্রথম সফর। এই সফরকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুখে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির বিশ্লেষণ শোনার জন্য বহুদূর হইতে লোকজন সভায় আগমন করে।

শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তানের তিনটি রাজধানী করাচী,

অন্তবর্তীকালীন রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি এবং ইসলামাবাদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে। সেনাবাহিনীর তিনটি সদর দফতরের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতরের সুবিধা তাহারা পাইতেছে। বিদেশী রাষ্ট্র-দূতাবাস সমূহের অবস্থানও সেখানে এইসব ঐখানে থাকার ফলে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিপুল উন্নয়ন সাধন করিয়াছে। এইসব সুযোগ সুবিধা যদি পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে থাকিত, তবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ৬ দফার চাইতেও কড়া দফা লইয়া আন্দোলন করিত।

৬-দফার বিরুদ্ধে যারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন যে, নায্য দাবীর বিরুদ্ধে অতীতেও হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হইয়াছে, কিন্তু দাবী দাবানো যায় নাই। স্বার্থান্বেষী মহলের হুঁশিয়ারি যত তীব্র হইয়াছে, দাবী আদায়ের সংগ্রাম তার চাইতে তীব্রতর হইয়াছে। ৬-দফার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতে বাধ্য। শেখ মুজিবের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং এডভোকেট মোমেন মুক্তাগাছা আগমন করেন। মেসার্স রফিকুদ্দিন ভুইয়া , খোন্দকার এ, মালেক ও সামসুল হকও সভায় বক্তৃতা করেন।

১৯৬৬ সালের ১১ মার্চ ময়মনসিংহ টাউন হল ময়দানের এক জনসভায় ছয়দফা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতাদান করেন। বক্তৃতাদানকালে ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা বাস্তবায়ন করার জন্য সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও জনসাধারণকে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই শক্তিশালী পাকিস্তানের মূল নিহিত' ময়মনসিংহের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা'। ময়মনসিংহ থেকে বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

আজ বিকালে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার মানসেই ৬-দফা দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে এবং ৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শক্তিশালী পাকিস্তান কায়েম করা সম্ভব।

তিনি বলেন যে, শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, বরং শক্তিশালী অঞ্চলই জনগণের কাম্য।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিরাট জনসভায় হাজার হাজার শ্রোতা রাত্রি প্রায় ৮টা পর্যন্ত বিশেষ ধৈর্য সহকারে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। জনসাধারণের মধ্যে ৬-দফার

ব্যাপারে যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়াছে, জনসভার জনসমাগম এবং জনসাধারণের ধৈর্য্যই উহা সপ্রমাণ করে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জেল-জুলুম ও নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন হইয়াই তিনি ৬-দফা দাবী ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন : অতীতে জেল খাটিয়াছি, মামলার আসামী হইয়াছি। এবারও জেল খাটিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা বা দাবীর ব্যাপারে কোনরূপ আপোষ করিতে প্রস্তুত নই। শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আপৎকালে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত শক্তিশালী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের কোনই কাজে আসে নাই। তাই ১৭ দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকেই পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কিন্তু উহাকে সর্বদাই ভুল বুঝা হইয়াছে। বাংলার মুসলিমগণ '৪৬ সালের নির্বাচনে শতকরা ৯৬টি ভোট দিয়া পাকিস্তান কায়েম করে। জাতীয় পরিষদের ৬টি আসন '৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হইলেও সংখ্যাসাম্য মানিয়া লয়। এতদসত্ত্বেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থী গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার দুর্গতির জন্য চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও বহুলাংশে দায়ী।

শেখ মুজিবর রহমান এক এক করিয়া ৬-দফার সকল দফা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করা যায় না। ৬-দফার বাস্তবায়ন পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়ন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান যে- কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দাবী মানিয়া নিলে তাঁর দল যে-কোন সরকারকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত।

তিনি লেভী প্রথার কঠোর সমালোচনা করিয়া উহা প্রত্যাহার করার জোর দাবী করেন। ৫ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের বিকল্প কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা না করিয়া টেণ্ডুপাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় তিনি সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

বক্তৃতার উপসংহারে শেখ মুজিবর রহমান দাবী আদায়ের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হওয়ার জন্য সকল আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, যুগে যুগে

জনসাধারণের দাবী আদায়ের জন্য বহু লোককে জীবনপাত এবং কঠোর নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। ত্যাগের বিনিময়ে জনগণের দাবী আদায় হইবেই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ শোষণের মনোবৃত্তি নয়, বরং ঐক্য ও দেশপ্রেমের মনোভাব লইয়া ৬-দফা বিবেচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়াই ৬-দফা দাবী মানিয়া নেওয়া প্রয়োজন।

তাজুদ্দীন আহমদ

বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন যে, ত্যাগের এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠিত ও বৈষম্যের সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। এবার ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ৬-দফা অর্জন করিতে হইবে।

জনসভায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব এ, বি, এম, নূরুল ইসলামসহ অন্যান্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা দান করেন। গায়ক নূর মোহাম্মদ জনসভায় ৬-দফার সপক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রস্তাবাবলী

সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দী ও জরুরী আইনে আটক ব্যক্তির মুক্তি, ভাইস চ্যান্সেলারের অপসারণ এবং বিড়ি শ্রমিকদের আশু পুনর্বাসনের দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এক প্রস্তাবে ৬-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, অতীতে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ময়মনসিংহ পিছনে পড়িয়া থাকে নাই এব এবারও ৬-দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনে ময়মনসিংহ অপর কোন জেলার পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে ৬-দফার মর্ম অনুধাবন করার আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ১৪ মার্চ সিলেটে রেজিস্ট্রি অফিস ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতাদান করেন। উক্ত জনসভায় তিনি ছয়দফার সমর্থনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হলে নেতাদের ঐক্যে কোন লাভ হবে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে নেতাগণ বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস পাবে না

বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৬ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সিলেটের জনসভায় শেখ মুজিব- আমাদের অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা ৬-দফারও বেশী দাবী করিতেন'। সিলেট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আজ বলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানীর জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সদর দফতর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অপরাপর সুযোগ-সুবিধা পূর্ব পাকিস্তানে থাকিলে পশ্চিম পাকিস্তানের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ৬-দফার উত্থাপিত দাবী অপেক্ষা অনেক বেশী দাবী করিয়া বসিতেন।
>
> আজ অপরাহ্নে স্থানীয় রেজিষ্ট্রি অফিস ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা উপরোক্ত মন্তব্য করেন।
>
> তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের কল্যাণের জন্য কোন দাবী পেশ করিলেই উহাকে ধ্বংসাত্মক কাজ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এমন কি, শেরে বাংলা বা সোহরাওয়ার্দীও মত নেতাও এই অভিযোগ হইতে রেহাই পান নাই।
>
> জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদে একের পর এক তিন তিনবার রাজধানী নির্মাণ করা হইয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীর ৩টি সদর দফতরও পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ গত যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায়না। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী প্রভৃতিসহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দরকার এবং এখান হইতে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান তখনই শক্তিশালী হইবে –যখন ইহার দুইটি অঞ্চল সমানভাবে শক্তি অর্জন করিবে এবং সকল ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। অর্থনৈতিক নীতিসহ বক্তৃতায় তিনি ৬-দফার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। যুব সমাজের প্রতি শোষণের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, ৬-দফা তথা ১০ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন না।
>
> ৬-দফার সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হইলে নেতাদের ঐক্যে কোন লাভ হইবে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকিলে নেতাগণ বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহসই পাইবে না।

১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম। জনসভায় ছয়দফার সমর্থনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অতৃপ্ত আগ্রহের জন্য সভাপতি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২১ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'অতৃপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ-সিক্ত পরিবেশে ৬-দফার প্রবক্তাদের যাত্রা শুরু'। ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> সাড়ে ৫ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের জীবনে আওয়ামী লীগের ৬-দফার সত্যিকার তাৎপর্য কী, গতকল্যকার (রবিবার) পল্টন ময়দানের জনসভায় তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে নানা বিশ্লেষণে বিশেষিত করিয়া ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষ শিবিরের অবিরাম বিরুদ্ধ প্রচারের মুখে এই দিনের পল্টন ময়দান সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে যে, জাতীয় জীবনের বিগত ১৯ বৎসরের তিক্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে পটভূমিতে রাখিয়া আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলনের যে কণ্টকাকীর্ণ পথ বাছিয়া লইয়াছে, সে পথ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে সিক্ত। প্রচণ্ড ধূলিঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে সে সভা পরিত্যক্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক, উপস্থিত জনসমুদ্রে আগ্রহাতিশয্য সেই সভায় কার্য পরিচালনা করিতে উদ্যোক্তাগণকে বাধ্য করায় এবং ঝড়-বৃষ্টি শেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জনতার চাপে পূর্বাহ্নে সমাপ্ত ঘোষিত সভা 'পুনরারম্ভের' নয়া নজীর এই কথারই সত্যতা বহন করে।
>
> বেলা সোয়া ৪টার দিকে সভার কাজ শুরু হইতে-না-হইতেই ধূলিঝড় চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে এবং তারই অব্যবহিত পরে বৃষ্টি পড়িতে শুরু করে। ফলে, শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকে নিকটবর্তী স্টেডিয়ামের বারান্দা ও অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় আপাতঃদৃষ্টিতে সভা পণ্ড হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিলেও পরক্ষণেই অবাক বিস্ময়ে দেখিতে পান যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর বৃহত্তর অংশের কেহ মাথার উপর ছাতা, কেহ বা চেয়ার এবং কেহ কেহ বা রুমালের আচ্ছাদন রচনা করিয়া এবং বেশীরভাগই কোন আচ্ছাদন ছাড়াই সভা স্থলে জাঁকিয়া বসিয়া আছেন। ফলে এই অবস্থায় প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডবকে উপেক্ষা করিয়াই সভার কাজ শুরু করিতে হয়।
>
> ইহার অল্পক্ষণ পরে ঝড় থামিয়া যায় এবং মেঘ কাটিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু সভা পুরাদমে চলার সময় বৃষ্টি ও ঝড়ের পুনরাবির্ভাব ঘটে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে শেখ মুজিবরের বক্তৃতা সমাপ্ত হওয়ার পর সভা শেষ

> করা হয। কিন্তু সভার সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া নেতৃবৃন্দ চলিয়া যাওয়ার পরে বৃষ্টি থামিয়া আবার আলো ফুটিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ভয়ে বা বৃষ্টিতে অল্প স্বল্প ভিজিয়া যে সব শ্রোতা স্টেডিয়ামের নিরাপদ স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা পুনরায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিতে দেখিতে পল্টনে আবার এক বিরাট জনসভার সৃষ্টি করেন এবং সভার কাজ 'পুনরারম্ভের' জন্য অনুরোধ জানাইতে থাকেন। সভার কাজ যে পূর্বাহ্নেই শেষ হইয়াছে, শতচেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইতে না পারায় বৃষ্টিতে আটকা পড়া নেতৃবৃন্দ পুনরায় মাইক সংযোগ করিয়া আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা 'পুনরারম্ভ' করিতে বাধ্য হন। সভাপতি সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাহাদের অতৃপ্ত আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দেন এবং শীঘ্রই আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে পুনরায় জনসভা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর খেদমতে হাজির হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। তুমুল করতালির মধ্যে এই ঘোষণা অভিনন্দিত হওয়ার বুঝা যায় শ্রোতৃমণ্ডলী এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হওয়ার কারণ খুঁজিয়া পান।
>
> প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই দিনের সভায় অনেকেরই বক্তৃতার কথা থাকিলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন কেবলমাত্র জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব জহিরুদ্দীনই নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বক্তৃতা করার অবকাশ পান।

চরম প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। সভার সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক পথে ছয়দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সাড়ে ৫ কোটি মানুষের ভাগ্য ও দেশের দুই অংশের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির জন্য চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২১ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন-সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছি- পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান'। খবরটি পরিবেশন করেন ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার। এতে বলা হয়:

> কালবৈশাখীর উদ্দাম, নতুন ধূলিঝড় এবং বৃষ্টি সত্ত্বেও গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক জনসভার মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রকৃতির উদ্দাম তাণ্ডবকে স্তব্ধ করিয়া সভায় সমাগত বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে দৃপ্তকণ্ঠে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত সভাপতি ঘোষণা করেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের চোখে মুখে আজ যে বিরাট জিজ্ঞাসা, কুসুমাস্তীর্ণ পথে সে জিজ্ঞাসার জবাব মিলিবে না- এ জিজ্ঞাসার জবাব পাইতে হইলে জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনকে আশীর্বাদ বলিয়া বরণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাড়ে ৫ কোটি মানুষের ভাগ্য ও দেশের দুই অংশের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতির এই বাণী লইয়া আপনারা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের জন্য সবকিছু জানিয়া শুনিয়াই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথে ৬-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে।

সভার সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, কঠোর নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ৬-দফা দাবী আদায় করিতে হইবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষকে ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, এইবার যদি কোন গণতান্ত্রিক কর্মীর উপর নির্যাতন নামিয়া আসে, তবে পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়টি কারাগার আমরা ভরিয়া তুলিব। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিব।

১৯৬৬ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ায় মুন্সেফ কোর্ট প্রাঙ্গণে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করার জন্য তৈরি থাকার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। আমাদের ওপর আঘাত আসলে আমরা প্রত্যাঘ্যাত করব না, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আঘাত সহ্য করব। আমরা আঘাত করব না, আমরা সত্যাগ্রহ করব। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৯ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান সাতকানিয়া কোর্ট প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবের বক্তৃতা'। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার

> আহ্বান জানান। তিনি আজ স্থানীয় মুন্সেফ কোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।
>
> শেখ মুজিবর রহমান সভায় ঘোষণা করেন যে, যদি পূর্ব পাকিস্তানীরা ৬-দফা দাবী আদায় করিতে ব্যর্থ হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ গোলামে পর্যবসিত হইবে। ৬-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, যদিও দেশের দায়িত্বশীল মহল হইতে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ডাক পাওয়া গিয়াছে তথাপি আমরা গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে রাজী নই। আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। আমাদের উপর আঘাত হানিলে আমরা প্রত্যাঘাত করিব না, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আঘাত সহ্য করিব। আমরা আঘাত করিব না, আমরা সত্যাগ্রহ করিব।
>
> ৬-দফা দাবী কেন উত্থাপন করা হইল, এই প্রশ্নের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দান করিয়া তিনি বলেন যে, আজ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হিন্দু মহাজনী আমলে এদেশের মুসলমানদের যে দুরবস্থা হইয়াছিল, আজকের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান দেশের ৭০ ভাগ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে, কিন্তু শতকরা ৩০ ভাগ বিদেশী মুদ্রা এখানে ব্যয় হয়। ব্যবসা -বাণিজ্য প্রভৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের কোন অধিকার নাই। এইখানে ব্যবসা করিয়া দিনের পর দিন এখান হইতে মূলধন পাচার করিয়া ক্ষমতাসীন দলের কাপুরুষোচিত ও অসহনশীল মনোভাবেরই পরিচয়।

১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল ছয়দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ৭ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের পথ-সভা'। রিপোর্টটি পরিবেশন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার। এতে বলা হয়:

> বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল (বুধবার) বিকালে ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সব পথ-সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করেন।
>
> পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ কর্মিগণ আওয়ামী লীগের পুরানা পল্টনস্থ দফতরে সমবেত হন। অতঃপর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোষ্টার সহকারে মিছিল করিয়া তাহারা প্রথমে বায়তুল মোকাররমে এক পথ-সভায় মিলিত হন। হাজার হাজার লোক কর্মীদের বক্তৃতা শোনার জন্য এই সভায় যোগদান করেন। কর্মিগণ এই সভায় ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা

করেন। এই পর্যায়ে জনসাধারণও কর্মীদের সহিত মিছিলে শামিল হয়। ফলে ক্ষুদ্র কর্মী মিছিল শেষ পর্যন্ত এক বিরাট গণ-মিছিলের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৬৬ সালের ৭ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের নগরবাড়ীতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, একমাত্র জনসাধারণই নিজেদের তথা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ প্রসঙ্গে তিনি ৬ দফার কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি কর্মীদের প্রতি গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৮ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নগরবাড়ীতে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা'। পাবনা থেকে বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে আজ মধ্যাহ্নে উত্তর- বঙ্গের প্রবেশপথ নগরবাড়ী পৌঁছিলে হাজার হাজার লোকের এক বিরাট জনতা তাঁহাদের বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।
>
> সম্বর্ধনা জ্ঞাপনকারী হর্ষোৎফুল্ল জনতার মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে শেখ মুজিব এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, জনগণই নিজেদের তথা দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। সুতরাং পাকিস্তানের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য এক-ব্যক্তি শাসনের অবশ্যই অবসান দরকার।
>
> আগ্রহাকুল জনতার বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, একমাত্র জনসাধারণই নিজেদের তথা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বলেন, দেশকে স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধিশালী রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে এক-ব্যক্তি শাসনের অবশ্যই অবসান দরকার। এই প্রসঙ্গে তিনি ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি কর্মীদের প্রতি গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল পাবনা টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলের ছয়দফার রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। উক্ত জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরে রাজী হন, তবে তিনি ও তাঁর দল ছয়দফা প্রত্যাহার

করতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, ছয়দফা কোন রাজনৈতিক দরকষাকষির বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন। তাই জনগণকে তিনি হয় মানুষের মতো বাঁচার, না হয় মানুষের মতো মরার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৯ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করুন–ছয় দফা প্রত্যাহার করিব, পাবনার বিরাট জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা'। পাবনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন: প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরে রাজী হন, তবে তিনিও তাঁহার দল ছয়দফা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত। ছয়-দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য শেখ সাহেব সরকারপক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, উক্ত গণভোটে ৬-দফা বিরোধীরা শতকরা ৩০ ভাগ ভোট পাইবে। তিনি বাকী জীবনের জন্য রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।
>
> স্থানীয় টাউন হল ময়দানে সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ছয়-দফা কর্মসূচী শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান নহে, পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর জন্যও ম্যাগনাকার্টা এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার ইহাই সুনিশ্চিত পন্থা বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।
>
> শেখ মুজিব বলেন যে, ছয়-দফা রাজনৈতিক দরকষাকষির কোন ব্যাপার নহে, ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের জীবন-মরণ প্রশ্ন। এমতাবস্থায় ৬-দফার প্রশ্নটিকে হালকাভাবে গ্রহণ না করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানান।

ছয়দফা দাবী-দাওয়া নিয়ে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালের ৯ এপ্রিল ইত্তেফাকের শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পথসভা'। দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার রিপোর্টটি পরিবেশন করেন। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় ঢাকার রাজপথে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ অফিস হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মিছিল প্রথম বায়তুল মোকাররম, জিন্নাহ্ এভিনিউ এবং নবাবপুরে গমন করে। এই সকল স্থানে পথসভায় কর্মিগণ ৬-দফা ব্যাখ্যা করেন। কর্মিগণের মিছিলে জনসাধারণও শরীক হন। মিছিলে কর্মী-জনতা বিভিন্ন শ্লোগান দেন।

১৯৬৬ সালের ৯ এপ্রিল বগুড়া এডওয়ার্ড পার্কে আওয়ামী লীগেরে উদ্যোগে ছয়দফা কর্মসূচি নিয়ে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় অর্ধলক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। 'ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের জনগণের মুক্তিসনদ', এই অভিমত ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় ছয়দফার নানা দিক তুলে ধরেন। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক তৎপরতায় ক্ষমতাসীনদের উদ্বেগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই কর্মসূচির ফলে তাদের আঁতে ঘা লেগেছে। তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের একমাত্র অস্ত্র -সুতরাং আন্দোলন চলবে এবং নির্যাতনও আসবে। নির্যাতনই জাতিকে যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করবে- নির্যাতনের কষাঘাতেই জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দিবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১০ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'নির্যাতনের কষাঘাতই দেশবাসীকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবে, সংগ্রামী শপথদীপ্ত বগুড়াবাসীর প্রতি শেখ মুজিবের আশ্বাস'। বগুড়া থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এই ছোট্ট শহরের বুকে অর্ধলক্ষাধিক লোকের এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশের জনগণ তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং জনগণকেই ইহার ফল ভোগ করিতে দিতে হইবে। স্বার্থান্বেষী মহল কিংবা তাঁহাদের ক্রীড়নকদের রাজত্বের জন্য দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই।

স্থানীয় এডওয়ার্ড পার্কে গতকাল আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, শোষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার চির অবসান ঘটাইবার জন্য আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

সভায় প্রধান বক্তা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া ঘোষণা করেন যে, শোষণের যাঁতাকল হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই আওয়ামী লীগের নীতি। ৬-দফা কর্মসূচী একাধারে পাকিস্তানের জনগণের মুক্তিসনদ, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায়

এক এক করিয়া ৬-দফার ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলেন যে, ইহা কোন দলের প্রয়োজনে প্রণীত রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়– পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃত রাজনৈতিক মনোভাব লইয়াই উহার বিচার করিতে হইবে। জনগণকে কোন পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানান। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, আমাদের উপর জরুরী আইন ও পাকিস্তান রক্ষা বিধির খড়্গ নিপতিত হইতে পারে, এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। তাই নির্যাতনের মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ানোর পূর্ণ প্রস্তুতি লইয়াই আমরা আজ কার্যক্ষেত্রে আগাইয়া আসিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই নির্যাতনেই জাতিকে যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করিবে– নির্যাতনের কষাঘাতেই জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবে।

ছয়দফা কর্মসূচি নিয়ে ১৯৬৬ সালের ৯ এপ্রিল রংপুরে এক জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর প্রতি প্রবঞ্চনাকারীদের উৎখাত করার জন্য সকল স্তরের মানুষকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য প্রত্যন্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়া এবং ঘরে ঘরে ৬-দফার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলা। সমাবেশে ছয়দফা কর্মসূচি আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য রংপুর জেলায় ৬ দিনব্যাপী এক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১১ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফার সমর্থনে রংপুরে গণজাগরণ, অকুতোভয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান'। রংপুর থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

আজ এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা কালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীর প্রতি প্রবঞ্চনাকারীদের উৎখাত করিবার জন্য সকল স্তরের মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অকুতোভয় সংগ্রাম চালনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই প্রবঞ্চনাকারীরা আজ শোরগোল তুলিয়াছে কিন্তু ইহাদের আওয়াজ দেশবাসীকে স্তব্ধ করিয়া দিতে হইবে।

শেখ মুজিব তাঁহার ছয়দফা কর্মসূচীর এমনি প্রাঞ্জল ও যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দান করেন যে, সভাশেষে প্রত্যেকটি লোকের মুখে শুধু ছয়দফার কথাই শুনা যায়। শেখ মুজিব বলেন, আমাদের সংগ্রাম তাঁহাদের বিরুদ্ধে–যাঁহারা পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করিয়াছে, বঞ্চনা করিয়াছে। এখানে যে সমস্ত মোহাজের আগমন করিয়াছে, তাহাদেরও একই দশা। তাহারাও বঞ্চিত, রিক্ত। সুতরাং স্থানীয়দের সহিত এক কাফেলায়

তাহাদেরও শামিল হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নাই। তিনি বলেন, ছয়দফা কোন দলীয় কর্মসূচী নহে, ইহা বর্তমান বিধি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করিয়া নয়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ম্যাগ্নাকার্টা। ইহাতে গোপন কিছুই নাই, যে-কেহ খোলা চক্ষে ইহা নিরিখ করিতে পারেন।

শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফার বিরুদ্ধবাদীদের হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং যে-কোন পরিণতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আজ প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য প্রত্যন্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়া এবং ঘরে ঘরে ৬-দফার তাৎপর্য বুঝাইয়া বলা।

পরদিন অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিনাজপুরের জনসভায় যোগদান করেন। উক্ত জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। ছয়দফার সমালোচনাকারীদের উদ্দেশে জনসভায় দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, জীবনের বিনিময়ে হলেও ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১২ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আমরা জনগণেরই দালাল-আর জনতার দরবারই শক্তিশালী আদালত', দিনাজপুরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা'। দিনাজপুর থেকে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধির প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, কাহারা দেশ ও জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে উহা বিচারের ভার জনগণের উপর। কেননা আদালতে তাহাদের বিচার হইতে পারে না। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আমারও ভোটাধিকার নাই, আপনাদেরও ভোটাধিকার নাই, আসুন, আমরা সবাই মিলিয়া ভোটাধিকার অর্জন করি।

শেখ মুজিব বলেন : আমি বিশ্বাস করি, জনসাধারণই প্রকৃত শক্তির উৎস এবং জনতার দরবারই আল্লার আদালতের পক্ষে শক্তিশালী আদালত। তাই আপনাদের উপরই বিচারের ভার দিলাম, আপনাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬-দফা দাবীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, একদা লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আর পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, এই আশা লইয়া ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করার জন্য আমি লাহোর গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে। জনসভায় ভাষণদানকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছয়-দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইহা বিগত ১৮ বৎসরের দুর্দশারই বহিঃপ্রকাশ।

১৯৬৬ সালের ১০ এপ্রিল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ৬-দফা দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১২ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা গ্রামে-গঞ্জে আশার উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে'। ময়মনসিংহের ঝনকা থেকে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬-দফা শুধু শহরে বন্দরেই নয়, কৃষকের মনেও আশার নব-উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে।

গত মঙ্গলবার ময়মনসিংহ জেলার কনভেনশন লীগের সুরক্ষিত ঘাঁটি মুক্তাগাছা থানার কাশিমপুর ইউনিয়নের নেকা স্কুল ময়দানে 'জাঁদরেল' পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব কেরামত আলী তালুকদারের বাড়ীর মাত্র দেড় মাইল দূরে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়'।

দিনাজপুর সফর শেষ করে ঐদিনই অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ১১ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহী সফরে যান। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, দীর্ঘ আঠারো বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটেছে এই ছয়দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। ছয়দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, যে কোন কিছুর বিনিময়ে ৬-দফা প্রত্যাহার করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, ৬-দফা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই ৬-দফার প্রশ্নে কোনরূপ আপোস নেই। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ৬-দফাকে বাস্তবায়িত করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৩ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফা প্রশ্নে কোন আপোষ নাই, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে দাবী আদায় করা হইবে- রাজশাহীর জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা'। রাজশাহী থেকে প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ রাজশাহীতে এক বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, বিগত ১৮ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বঞ্চনামূলক আচরণ করা হইয়াছে, তার ফলে দেশবাসীর মনে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আওয়ামী লীগের ৬ দফার মাধ্যমে দেশবাসীর সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। প্রদেশবাসী ৬ দফাকে তাদের মুক্তিসনদ বলিয়া আদৃত করিয়াছে। ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। তাই, ৬ দফার প্রশ্নে কোনরূপ আপোষ নাই। যে- কোন ত্যাগের বিনিময়ে ৬ দফাকে বাস্তবায়িত করাই আজ আওয়ামী লীগের সংগ্রাম।

শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর পাবনা সভার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া রাজশাহীর জনসমাবেশে বলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিলে তিনি ৬-দফা প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সঠিক নয়। তিনি বলেন যে, ৬ দফার যথার্থ প্রমাণ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া আমি সেদিন বলিয়াছিলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তান, পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী করাচী, অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি এবং নির্মীয়মাণ রাজধানী ইসলামাবাদ, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি সদর দফতর এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সবকয়টি সদর দফতরের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছে। এইসব সুযোগ-সুবিধা যদি গত ১৮ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান ভোগ করিত তবে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা ৬-দফার চাইতেও গুরুতর দফা লইয়া সংগ্রাম শুরু করিতেন। শেখ মুজিব বলেন যে, কোন কিছুর বিনিময়ে ৬-দফা প্রত্যাহার করার প্রশ্ন উঠে না। কারণ ৬-দফা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ৬-দফা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, দেশবাসীও ৬-দফাকেই তাদের মুক্তি সনদ বলিয়া আদৃত করিয়াছে ও স্বীকৃতি দিয়াছে। ৬-দফা আজ দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষার প্রতীক। দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষাকে যে-কোন ত্যাগের বিনিময়ে বাস্তবায়িত করাই আওয়ামী লীগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ৬-দফা বিনিময়যোগ্য বস্তু নয়। ৬-দফা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।

শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। ইহারই মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের বিরামহীন সংগ্রামের দৃঢ়সংকল্পের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

১৯৬৬ সালের ১২ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ছয়দফা কর্মসূচি প্রচার সমাপ্ত করে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহকর্মীগণ ঢাকায় ফিরে আসেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৩ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সদলবলে শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন'। ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> উত্তর বঙ্গের পাঁচটি জেলার জনসাধারণের কাছে ৬-দফার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার সহকর্মিগণ গতকাল (মঙ্গরবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুলনা সফর করেন। এ সময় খুলনার মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনায় অনুষ্ঠিত এই জনসভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তর ও

দক্ষিণবঙ্গ সফরকালীন সময়ের সর্বশেষ জনসভা। উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় ছয়দফার দফাওয়ারি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছু সংখ্যক অতিপ্রগতিবাদী রাজনীতিক ছয়দফার উদ্যোক্তাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় এবং গ্রেফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সভায় ছয়দফা দাবি আদায়ে যে কোন প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জেল বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত'–শেখ মুজিব। খুলনা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> আজ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন জেল আমরা বহুবার দেখিয়াছি, বুলেটের আঘাতও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত। আঘাত যতই প্রচণ্ড হইবে, আমাদের সংগ্রাম ততই জোরদার হইবে, আপোষহীনভাবে চলিতেই থাকিবে।
>
> শেখ সাহেব বলেন যে, সরকার ছয়দফার উদ্যোক্তাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুতি নিতেছেন। তাই এক্ষণে জনসাধারণকেই সমস্যা অনুধাবন করিতে এবং ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ছয়দফা জনসাধারণেরই কর্মসূচী এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।
>
> শেখ মুজিব বলেন, হিন্দু ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলেই পাকিস্তানের দাবী উত্থাপিত হয় এবং মুসলমানরা পাকিস্তান কায়েম করে। আজ সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ছয় দফা আদায় করিতে হইবে।
>
> অদ্য খুলনায় অনুষ্ঠিত এই জনসভা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সফরকালীন সর্বশেষ জনসমাবেশ। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় শেখ সাহেব তাঁহার ছয় দফার দফাওয়ারী বিশ্লেষণ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছুসংখ্যক অতি প্রগতিবাদী রাজনীতিক কেন ছয় দফার বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়াছেন, তাহা অনুধাবনের জন্য তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জ্ঞাপন করেন। ছয় দফা বিশ্লেষণ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন: ছয় দফা বঞ্চনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ, ইহা আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্যারান্টি, ইহা সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই ম্যাগনাকার্টা বা বড় সনদ। ছয় দফার সুযোগ গ্রহণে পশ্চিম পাকিস্তান নারাজ কেন তাহাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন

যে, সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় শক্তিশালী কেন্দ্র বা কেন্দ্রের শক্তিমান পুরুষের উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। যুদ্ধকালে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট কেন পূর্ব পাকিস্তানে আসিতে পারেন নাই, তাহা অনুধাবনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধকালে পুর্ব পাকিস্তান গোটা দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা গিয়াছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের রাজত্বের খাতিরে পূর্ব পাকিস্তান সকল প্রকার আত্মত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু শুভেচ্ছার এই মনোভাবকে দুর্বলতা বলিয়া ভুল বুঝা হইয়াছে।

খুলনার মহামারী, জীবাণুযুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় সমস্যাদি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। দূষিত পানি সরবরাহের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, স্থানীয় মন্ত্রীরা বিভিন্নস্থানে উপদেশ খয়রাত করিতেছেন। কিন্তু মহামারী কবলিত খুলনার জনসাধারণের নিকট আসিতেছেন না। কারণ জনসাধাণের জন্য তাঁহাদের কোন মমতা নাই, প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানই তাঁহাদের কাজ।

১৯৬৬ সালের ১৮ এপ্রিল বরিশালের ভোলায় ছয়দফার দাবিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন এবং জীবনপণ করে ছয়দফা আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২০ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার সমর্থনে ভোলায় বিরাট জনসভা'। বরিশাল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

গতকাল ছয়দফার দাবীতে ভোলায় এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভোলা মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হেদায়েত আলী মোক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জনাব আজহার উদ্দিন এম.পি,এ, জনাব মোশাররফ হোসেন এম,পি,এ, জনাব তোফায়েল আহমদ প্রমুখ নেতা ছয়দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিএ জনাব মোশাররফ হোসেন বলেন যে, আমরা নিজেরা শক্তি সঞ্চয় না করিলে কেহই আমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে না। তিনি বলেন যে, আমরা অপর কাহারো উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে চাই না, নিজেদের শক্তিতেই আমরা বলীয়ান হইতে চাই। জনাব মোশাররফ হোসেন বলেন, এই প্রদেশের জনসাধারণ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে এবং ছয়দফাকে তাহারা তাহাদের বড় সনদ বা ম্যাগনাকার্টা বিবেচনা করে। তিনি ঘোষণা করেন যে, আমরা যে সংগ্রাম শুরু করিয়াছি, তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং জীবন পণ করিয়া আমরা এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখিব।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডাঃ আজহার উদ্দিন আহমদ বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী নূতন কিছু নয়, ইহা অনেক পুরাতন দাবী। প্রথম গণ-পরিষদ এই দাবী অনুমোদন করিয়াছিল। ১৯৪৯ সালে মরহুম জনাব লিয়াকত আলীও এই দাবী মানিয়া লন। অতঃপর ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রেও ইহা স্বীকৃত হয়। জনাব আজহার উদ্দিন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বৈষম্যের অবসান দাবী করেন। তিনি বলেন যে, ছয়দফা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

১৯৬৬ সালের ২১ এপ্রিল ময়মনসিংহে গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং ছয়দফা বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৩ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভিতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের সভা, ৬ দফা বাস্তবায়নের সংকল্প প্রকাশ'। ময়মনসিংহ থেকে ইত্তেফাকের সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

গত রবিবার গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গৌরীপুরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব জমসেদ আলী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুস সাত্তার এবং জেলা লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া সহ বিভিন্ন বক্তা ছয়-দফার পটভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ছয়-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, গৌরীপুর এবং শ্যামগঞ্জের মধ্যবর্তী কাউরাটি নামক স্থানে একটি নূতন রেল ষ্টেশন স্থাপনের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন তৈরির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার মূল বক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে রেখেই এই জনসভার কাজ শুরু করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে সেদিন ময়মনসিংহ কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম জনসভা যে জনসভায় সভাপতির আসন শূন্য রেখে সভা করতে হয়েছিল। সভায় বক্তারা ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন এবং শাসনকর্তৃপক্ষকে ছয়দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করে ছয়দফার দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৫ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সংগ্রাম চলিবেই: পল্টনের বিশাল জন-সমুদ্রে

নেতৃবৃন্দের ঘোষণা, সভাপতির আসন শূন্য রাখিয়া সভার কাজ পরিচালনা 'বিভক্ত' জাতিকে সত্যিকারে ঐক্যবদ্ধ করার বাপারে ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা'। দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গত ২০শে মার্চ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন শেষে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীর পীড়াপীড়িতে পুনরায় পল্টন ময়দানে জনসভা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানে সেই প্রতিশ্রুত জনসভাই অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তবে শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসন শূন্য রাখিয়া।
>
> শেখ সাহেবকে ময়মনসিংহের কারাগারে রাখিয়াই এই দিন পল্টন ময়দানে সভার কাজ শুরু করা হয়। নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই সভাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হওয়ায় পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ঠিক ৪টায়ই সভার কাজ শুরু হয়। সভায় প্রধান বক্তা ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির প্রতিবাদে ও তাঁহার প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ পল্টন ময়দানের এই দিনকার এই মহতী জনসভায় সভাপতির আসন শূন্য রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী এই সিদ্ধান্তকে তুমুল করতালির মধ্যে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। সভাপতির শূন্য আসনের পার্শ্বে মঞ্চে বসিয়া সভার কাজ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান। জনসভায় সভাপতির আসন শূন্য থাকা পাকিস্তানের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। ঠিক নির্ধারিত সময়ে সভার কাজ আরম্ভ হওয়াও সাম্প্রতিক কালের পল্টন ময়দানে ইহাই প্রথম। প্রতিটি বক্তার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় : অত্যাচার-নির্যাতন যত আসে আসুক–সংগ্রাম চলিবেই।
>
> মূল বক্তা শেখ মুজিবর রহমান মামলা ঘটিত কারণে কারাগারে আটক থাকিয়াই যেন এই সভার গুরুত্ব বাড়াইয়া দেন। প্রধান বক্তার অবর্তমানে সভায় ৬-দফার 'কি ও কেন' ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষমতাসীন দলের অপপ্রচারের জবাব দেন মেসার্স জহিরুদ্দীন, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম-এন-এ, খোন্দকার রফিকুল হোসেন, আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ দফতরের সেক্রেটারী ওবায়দুর রহমান। প্রস্তাব পাঠ করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক।
>
> সভার সূচনাতে ও বক্তৃতা চলাকালীন কয়েকদফা আবহাওয়া ঘোরানো হইয়া উঠিলেও এমনকি কখনও বা ছিটে ফোটা বৃষ্টি পড়িলেও শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর আগ্রহে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং '৬-দফা কেন' পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ যখন সংখ্যাতত্ব ও ঘটনা পঞ্জীর সাহায্যে

পাকিস্তানের বিগত আঠারো বছরের শাসনেতিহাসের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিতে থাকেন, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তখন কখনও তুমুল করতালি দিয়া, কখনও বা শ্লোগানের মাধ্যমে, আবার কখনও বা ' শেম শেম' ধ্বনি তুলিয়া বক্তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানাইতে থাকে। সভার শেষ পর্যায়ে ঝড়ো হাওয়ার সহিত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিলেও সভার ঘোষিত কার্যসূচী অনুযায়ী শ্রোতৃমণ্ডলী ফেষ্টুন ও প্লাকার্ড লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। নবাবপুর রোড দিয়া শোভাযাত্রাটি বাহাদুর শাহ পার্ক, সদরঘাট, চকবাজার, জেলগেট প্রভৃতি রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মোনাজাতের পর মাজারে আসিয়া সেখান হইতে ছত্রভঙ্গ হয়। জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বক্তৃতার প্রারম্ভে 'ক্ষমতাসীনদের কাহারো সহিত আওয়ামী লীগের ব্যক্তিগত বিরোধ নাই' বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমষ্টিগত কারণে তাহাদের সহিত আওয়ামী লীগের যে বিরোধ, এক এক করিয়া তাহার বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, বিরোধ হইতেছে ১০ কোটি মানুষের ভোটের অধিকার ও মৌলিক অধিকার নিয়া, আইনের ছদ্মবেশে বে-আইনী ব্যবস্থা প্রয়োগ নিয়া, অত্যাচার আর নিষ্পেষণ নিয়া। জনাব চৌধুরী যখন সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে পাকিস্তানের বিগত ১৮ বৎসরের ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ক্ষমতাসীনদের 'সুবিচারের' ফিরিস্তি তুলিয়া ধরিতে থাকেন, সভাস্থলে তখন এক অপূর্ব নীরবতা বিরাজ করিতে থাকে। প্রতিটি শ্রোতাই যেন সে সংখ্যাতত্ত্ব হৃদয়ে গাঁথিয়া লইতে চাহে। ৫০০ কোটি টাকা করিয়া ২ বৎসরে মোট ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিলে প্রতি বৎসর ২০০ কোটি টাকার ফসল বিনষ্টকারী বন্যার হাত হইতে পূর্ব বাংলাকে রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর আমরে ক্রুগমিশন যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, ক্ষমতাসীন সরকার গত ৮ বৎসরেও সে বাবত এক কপর্দকও ব্যয় করেন নাই বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। জনাব চৌধুরী বলেন যে, এবারকার পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সরকারের এজমালী তহবিল হইতে দেওয়া হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্য তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছে।

রেলওয়ে শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত করার ব্যাপারটিকে তিনি 'যার যা তার তা' নিয়মে। পাকাবাড়ী ও কাঁচা বাড়ীর বাসিন্দা দুই ভাইর এজমালী সম্পত্তি বণ্টনের সহিত তুলনা করেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধোত্তর যুগে কেন্দ্রীয় চাকুরীতে লোক সংগ্রহের সংখ্যাতত্ত্ব ভিত্তিক ফিরিস্তিও তিনি শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। উপসংহারে তিনি শেখ মুজিবের হয়রানির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এক 'মুজিব ভাই'র কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দশ কোটি মানুষের কণ্ঠ কখনও স্তব্ধ করা যাইবে

না। তিনি বলেন, বিগত ১৮ বৎসরের শাসন পূর্ব পাকিস্তানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। তাই পূর্ব পাকিস্তান আজ এই ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য দৃঢ় সংকল্প। আর দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলিতে থাকিবেই। প্রাক্তন পরিষদ সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ ৬-দফার 'কি ও কেন' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতীতে পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে কিভাবে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এক এক করিয়া তাহার বিবরণ দেন। প্রতিদানে পূর্ব পাকিস্তান কি পাইয়াছে– শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়া তিনি নিজেই তাহার বিশদ বর্ণনা দেন এবং বলেন যে, আজ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বৃহত্তর স্বার্থেই আওয়ামী লীগ ৬-দফা প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছে। এ প্রস্তাবের বিরোধিতার পরিণাম কাহারও পক্ষে শুভ হইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রাক আজাদী যুগে ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক কায়েদে আজমের ঐতিহাসিক ১৪-দফা মানিয়া না লওয়ার পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। প্রাক্তন পরিষদ সদস্য খোন্দকার রফিকুল হোসেন তাঁহার স্বভাবসুলভ রসালো ভঙ্গীতে ক্ষমতাসীনদের চেহারা জনসমক্ষে তুলিযা ধরেন। বক্তৃতার পর্যায়ে পর্যায়ে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কঠোর সত্যের দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সকলের মনে নূতন নূতন জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলেন। ১৮ বৎসরের ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, ১৯৫৪ সালের আগে যে জনাব সবুর, মোনায়েম খাঁ ও ওয়াহিদুজ্জামানরা দেশবাসীর সেবার ঠেলায় সাধারণ নির্বাচনে উৎখাত হইয়াছিলেন, ১৯৫৮ সালের ক্ষমতা দখলকারীরা তাহাদিগকেই আবার কোলে তুলিয়া লইয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, জনগণ যাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিয়া সেদিন ঐতিহাসিক রায় দিয়াছিল, সেই তাহাদিগকেই আবার গোপন পথে জনগণের স্কন্ধে সওয়ার করাই ছিল সেদিনকার সে 'বিপ্লবের' মূল রক্ষ। অর্থাৎ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসন করা হইবে ইহা তাহাদের কাম্য নয়।

জনাব রফিকুল হোসেন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা দাবী পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করিবে বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহারা মিথ্যা বলেন। তিনি বলেন, বরং ক্ষমতাসীন সরকারের অনুসৃত নীতিই বর্তমানে দেশকে নানা দিক দিয়া বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। জনাব রফিক বলেন, এই বিভক্ত অবস্থার অবসান ঘটাইয়া দুই অংশের মধ্যে সত্যিকার ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠাই ৬-দফার লক্ষ্য। তিনি বলেন, আজাদী অর্জন কালেই কেবল ১০ কোটি মানুষের মধ্যে একবার সত্যিকার ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তারপর আর তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইতে দেওয়া হয় নাই। আওয়ামী লীগের ৬-দফাই হইল ১০ কোটি মানুষের আবার সত্যিকার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সোপান। পাকিস্তানের যাহা ভিত্তি, সেই লাহোর প্রস্তাব

উত্থাপনে ও পরবর্তীকালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর সাধারণ নির্বাচনে কোন দুই মহাত্মার দান সর্বাধিক, এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়া জনাব রফিক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, সেই শেরে বাংলা, এ, কে, ফজলুল হক ও মোজাহিদে আজম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছবি আজ কারও ঘরে বা অফিস-আদালতের শোভা বৃদ্ধি করে না, তাঁহাদের মরদেহকে আমরা গড়িয়া দিয়াছি হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে। এ অকৃতজ্ঞতার অবসান ঘটিয়া যেদিন এই দুই মহাপ্রাণের ছবি এদেশের মানুষের ঘরবাড়ীর শোভা বর্ধন করিবে, সেই দিনই হইবে কৃতজ্ঞ জাতির সত্যিকার মুক্তি, তার আগে নয়। জনাব রফিক বলেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফাই গোরে শায়িত। এই দুই মহান নেতার স্বপ্নসাধ পূর্ণ করিয়া ১০ কোটি মানুষের সত্যিকার মুক্তি বিধান করিবে। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন বলেন যে, কর্তৃপক্ষ ৬-দফা দেশের সংহতি বিনষ্ট করিবে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এই দফাগুলির মধ্যে কোনটি বা কোন্ কোন্‌টি দেশের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর তাহা বলিতেছেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি জনাব "ভুট্টোর পৃষ্ঠ প্রদর্শনের" ব্যাপারটিরও উল্লেখ করেন। জনাব জহিরুদ্দীন বলেন, এ ব্যাপারে একমাত্র সঠিক জবাবদানের মালিক এ দেশের জনসাধারণ। সুতরাং এই ৬-দফার ব্যাপারে আমরা সরকারের নিকট গণভোট দাবী করি। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন, যাঁহার জন্য আজকার এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল সেই শেখ মুজিবর রহমান আজ ময়মনসিংহ কারাগারে। তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমান সাড়ে ৫ কোটি মানুষের মুক্তি কামনা করেন। পাকিস্তানের সংহতি দৃঢ় করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে চান এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। তাই তিনি আজ ক্ষমতাসীন মহলের চক্ষুশূল। জনাব তাজুদ্দীন শাসনকর্তৃপক্ষকে ৬-দফার দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান জানান। অন্যথায় তাঁহারা উহা মানিয়া নিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগ সম্পাদক বলেন, ৬-দফা ব্যক্তি বিশেষের দাবী নয়। শেখ মুজিবর রহমান জেলখানায় থাকুন বা জেলের বাহিরে থাকুন, জনসাধারণের জীবন-মরণের দাবী এই ৬-দফা আদায়ের সংগ্রাম চলিবেই। শেখ সাহেবের হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় আসিয়া পল্টনের বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া শ্রমিক নেতা ও আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ৬-দফার প্রশ্নে চট্টগ্রামবাসীর, বিশেষ করিয়া শ্রমিক সমাজের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করার ব্যাপারে ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি ক্ষমতাসীন মহলের বিভিন্ন অভিযোগ ও অপবাদের জবাব দেন। পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি গোলামির অপবাদ দানকারীদের উদ্দেশ্যে

তিনি বলেন, বাঙ্গালীদের ইতিহাস তাঁহারা জানেন না। বাঙ্গালীরা কাহারো গোলামি করে না। শহীদ তিতুমীর ও চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের ন্যায় বীর সন্তানদের দেশের এই অঞ্চলেই জন্ম। পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালীর ভূমিকা তদানীন্তন আমলে সর্ব মহলে যে 'অনন্যসাধারণ' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, একথা তাঁহারা জানেন না।' পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ৬-দফা প্রস্তাবে ১০ কোটি মানুষের দাবী-দাওয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য নয়, বরং পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী করার জন্যই ৬-দফা প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬৬ সালের ২৯ এপ্রিল কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ৬ দফাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৩০ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার প্রতি গণ-সমর্থন আমাকে সাহস দিয়াছে, কুমিল্লার বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা'। রিপোর্টটি পরিবেশন করেন ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার। এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে ঘোষণা করেন যে, ৬ দফাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ।

কুমিল্লার বিরাট জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা পাকিস্তাকে দুর্বল নয় পাকিস্তানের ভিত্তি আরও শক্তিশালী ও মজবুত করিবে। জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ৬-দফার ব্যাপারে আপনারা যে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা আমাকে আরও সাহসদান করিয়াছে। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাইলে নির্যাতন ও জেল-জুলুম কোন কিছুতেই আমি ভয় করি না।

শহর ছাড়াও কুমিল্লা জেলার দূরাঞ্চল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা হইতে বহু লোক উক্ত সভায় যোগদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহমান খান।

শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতার সময় বিশেষ করিয়া ৬-দফার দফাওয়ারী ব্যাখ্যাদানকালে জনগণের মধ্য হইতে ঘন ঘন করতালি ও উহার সমর্থনে ধ্বনি উত্থিত হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান সদলবলে মোটরযোগে ঢাকা হইতে কুমিল্লা পৌঁছিলে তাহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কুমিল্লার ইতিহাসে এই ধরনের সম্বর্ধনার দৃষ্টান্ত বিরল।

শেখ মুজিবর রহমানের পৌছার বহু পূর্বেই প্রায় ১০ হাজার লোক ৬-দফার দাবী সম্বলিত পোষ্টার ও ফেষ্টুন ইত্যাদিসহ ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে ছিল। বেলা ১০ টায় শেখ মুজিবর রহমান পৌছার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতার তুমুল জিন্দাবাদ ধ্বনিতে কুমিল্লা শহর কাঁপিয়া উঠে। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে শেখ মুজিবর রহমানকে টাউন হলে কর্মী সমাবেশে লইয়া যাওয়া হয়। ঢাকা হইতে কুমিল্লা যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৬-দফার দাবী সম্বলিত পোষ্টার-ফেষ্টুনসহ জনসাধারণ পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। পথিপার্শ্বে কয়েক স্থানে শেখ মুজিবর রহমানকে জনতার অনুরোধে বক্তৃতা করিতে হয় এবং তজ্জন্য কুমিল্লা পৌছিতে তাঁহার বিলম্ব হয়।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা জনাব রফিকুল হোসেন ৬-দফার সমর্থনে বলেন, ৬-দফা লাহোর প্রস্তাব ও বিগত ১৮ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, এডভোকেট জনাব আবদুর রব, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ জেলা সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন।

পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কুমিল্লা টাউন হলে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ৩ সহস্রাধিক কর্মীর এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

১৯৬৬ সালের ৩০ এপ্রিল প্রকাশিত কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশের অবশিষ্ট বিবরণ ১ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে ছয়দফার সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর দেয়া বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'কুমিল্লার জনসভার অবশিষ্ট বিবরণ'। কুমিল্লা থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

কুমিল্লার মহতী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে (আংশিকভাব গতকল্য প্রকাশিত) জনাব শেখ মুজিবর রহমান খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্রমাবনতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন ও সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানান। দেশের সাত লক্ষ বিড়ি শ্রমিক অসংখ্য জাহাজী শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমস্যাদির প্রতি সরকারী উদাসীনতার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। পরিশেষে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জনতার মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, তাঁর ৬-দফা দাবী

পাকিস্তানের দশকোটি মানুষেরই মুক্তি সনদ। সরকারী জেল-জুলুম ও নির্যাতন তাঁহাকে বা জনতার এ উদ্দাম তরঙ্গকে রুখিতে পারিবে না। আল্লার রহমতে জনতার অন্যান্য দাবীর মত তাঁহাদের এ মৌলিক দাবীও অচিরেই বাস্তবায়িত হইবে।

সভায় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম-এন-এ চট্টগ্রাম হইতে জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, এম-এন-এ, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব এম.এ. আজিজ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ফেনী হইতে মৌলানা আবদুল ওয়াহাব ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সভায় যোগদান করেন। সভাশেষে শেখ সাহেব অন্যান্য নেতা সমভিব্যাহারে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সভায় পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচা-মরার দাবী ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ও হয়রানির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া সভা প্রদেশে খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, লেভীর মাধ্যমে সংগৃহীত ধান ক্রয়মূল্যে বাজারে ছাড়ার ও পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, টেণ্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার ও দারিদ্র কবলিত সাত লক্ষ বেকার বিড়ি শ্রমিকের বিকল্প অর্থ সংস্থান এবং তাসখেন্দ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসায় জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া আরও কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় গৃহীত সর্বশেষ প্রস্তাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়।

১৯৬৬ সালের ৭ মে সিলেটের কোর্ট ময়দানে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং ছয়দফা দাবি বাস্তবায়নে ন্যায্য জনদাবির সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৮ মে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'গণদাবীর স্বীকৃতিতেই জনগণের আস্থা অর্জন করা যায়–শেখ মুজিব'। সিলেট থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত এই খবরটিতে বলা হয়:

> গতকল্য বৈকালে সিলেটের কোর্ট ময়দানে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এখানকার স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান

> ঘোষণা করেন যে, জেল, জুলুম ও হয়রানি দ্বারা ন্যায্য জনদাবীর সংগ্রামের গতিরোধ করা যায় না। বরং আন্তরিকতার সঙ্গে দাবী-দাওয়া বিবেচনা করিয়া মানিয়া লওয়ার মাধ্যমেই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা যায়।
>
> শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করেন। ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ৬-দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ দাবী উপেক্ষা করিতে অতীতেও কেহ পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবেনা। তিনি ৬-দফার, সমালোচকদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই পাকিস্তানের সংহতি নিহিত। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬-দফা অবশ্যই আদায় হইবে। ৬-দফা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ উহার নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী দেশে সমাজতান্ত্রিওক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

এগারো. গ্রেফতার-হয়রানি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল খুলনা সফরে গিয়ে বলেছিলেন, সরকার ছয়দফার উদ্যোক্তাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে নাজেহাল করা শুরু হয়। দিনের পর দিন এসব মামলা চলতে থাকে। নতুন নতুন মামলায় জড়ানো হয় তাঁকে এবং বারবার গ্রেফতার করা হয়। আবার জামিনও লাভ করেন তিনি। এসব ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায় দৈনিক ইত্তেফাকে।

১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল ভোর রাতে খুলনা থেকে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে ঢাকা ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে গ্রেফতার করে যশোর সদর দক্ষিণ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। সেখান থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯ এপ্রিল প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল : 'শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার: জামিনে মুক্তি লাভ: এবার দেশরক্ষা বিধিবলে আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের'। যশোর থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল রাত্রি চারটায় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৪৭(৫) ধারাবলে পুলিস পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে খুলনা হইতে সদলবলে ঢাকা যাওয়ার কালে যশোরে গ্রেফতার করে। যশোর সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের এজলাস হইতে শেখ মুজিবর

রহমান আজ জামিনে মুক্তি লাভ করেন। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সফর শেষ করিয়া তিনি আজ সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই মামলাটি লইয়া বর্তমানে প্রদেশের বিভিন্ন আদালতে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে মোট ৬টি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী শেখ মুজিব কাল খুলনায় বিপুল সমাবেশে বক্তৃতাদানের পর সদলবলে ঢাকার পথে মোটরযোগে খুলনা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব মসিউর রহমানের যশোরস্থ বাসভবনে তিনি সদলবলে আতিথ্য গ্রহণ করেন। গোয়ালন্দে ঢাকাগামী প্রথম ফেরী ধরার জন্য তিনি রাত চারটায় সদলবলে জনাব মসিউর রহমানের বাসভবন হইতে রওয়ানা হন। জনাব মসিউর রহমানের বাসভবন হইতে মাত্র বিশ গজ যাওয়ার পরই পুলিস মোটরের গতিরোধ করে। খুলনায় পোষ্টিং জনৈক ডিআইজি সাব-ইন্সপেক্টর এই পুলিস দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। উক্ত অফিসারটি গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন না করিয়া শেখ সাহেবকে যশোর কোতওয়ালী থানায় যাওয়ার অনুরোধ করেন। শেখ সাহেব গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন না করিলে থানায় যাইতে অস্বীকার করিলেও অফিসারটি পরোয়ানাটি দেখাইতে বিরত থাকেন। এক পর্যায়ে জনাব মসিউর রহমান ও জনাব তাজুদ্দিনও শেখ সাহেবের সঙ্গে একযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শনের দাবী জানাইলে অফিসারটি দ্বিধাজড়িতভাবে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করেন। উক্ত কাগজখানি ঢাকা হইতে খুলনা পুলিসের নিকট একটি "রিকুইজিশন অর্ডার"। উক্ত অর্ডারে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করিয়া নিকটস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁহাকে পেশ করিতে বা ঢাকা প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে। গতকাল ঢাকার রমনা থানায় দায়েরকৃত ৮০নং মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা বলিয়া উহাতে উল্লেখ ছিল। খুলনা পুলিস গতকালই বেলা ১১টায় এই নির্দেশনামা পাইয়াছে বলিয়া ঐ অর্ডারে উল্লেখ আছে। উক্ত অর্ডারে যশোর ডেপুটি কমিশনারের 'এণ্ডোর্সমেন্ট' না থাকায় শেখ সাহেব এই গ্রেফতারি পরোয়ানা অবৈধ বিধায় উহার নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন। তিনি পুলিসকে বলেন যে, তিনি উক্ত পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তবে তিনি বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে চান নাই বলিয়া পুলিসকে গ্রেফতারি পরোয়ানাটি আইনতঃ সিদ্ধ করিয়া আনার সুযোগ দেন।

পুলিস শেখ সাহেবকে যশোরে আটক করায় তাঁহার পক্ষে আজ ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালেকের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় হাজির হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই আদালতে আলোচ্য মামলার সওয়াল-জওয়াব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আজ বেলা দশটায় পুলিস শেখ সাহেবকে যশোর সদর (দক্ষিণ) মহকুমা হাকিম জনাব সোলায়মানের আদালতে হাজির করিলে এডভোকেট জনাব মসিউর রহমানের নেতৃত্বে যশোর বারের ১৫ জন আইনজীবী শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন করেন। মাননীয় মহকুমা হাকিম শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২১ শে এপ্রিলের পূর্বে ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালেকের আদালতে আত্মসমর্পণ করিবেন–এই শর্তে তাঁহাকে ৫ হাজার টাকার জামিন ও সমপরিমাণ অর্থের মুচলেকায় মুক্তি দান করেন। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নির্দেশে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান একজন স্বীকৃত জননেতা এবং সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, এইক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৯৬৬ সালের ২১ এপ্রিল আবার ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন ২২ এপ্রিল এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবর পুনরায় গ্রেফতার: পুলিস প্রহরায় সিলেটে প্রেরিত'। সিলেট থেকে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

সিলেট এসডিও আদালতের এক পরোয়ানা বলে ঢাকার জনৈক অতিরিক্ত পুলিস সুপারের নেতৃত্বাধীন একটি পুলিস পার্টি গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত্রি ৯টায় জনাব মুজিবর রহমানকে তাঁহার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন হইতে গ্রেফতার করিয়া ঢাকার মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) বাসভবনে হাজির করিলে তিনি তাঁহাকে পুলিস প্রহরাধীনে সিলেট প্রেরণ করেন। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করিতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় সিলেট মেল ট্রেনখানি ঢাকা ত্যাগে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয় এবং নির্ধারিত সময় রাত্রি সাড়ে ৯টার স্থলে রাত্রি সাড়ে ১০টায় ট্রেনখানি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

গ্রেফতারী পরোয়ানা হইতে জানা যায় যে, গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে সিলেটের মহকুমা হাকিমের আদালতে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩-ক, পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭ (৩) ও পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৪৭ (১) ধারাবলে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং এই মামলায় তাঁহার বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

১৯৬৬ সালের ২৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জামিন দেয়া এবং পুনরায় গ্রেফতার করা নিয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটে। ২২ এপ্রিল সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বঙ্গবন্ধুর জামিন আবেদন বাতিল হওয়ার

পর ২৩ এপ্রিল সেশন জজ তাঁকে জামিন দেন। কিন্তু সিলেট কারাগারেই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের এক গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয় পুলিশ। কারাগার থেকে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ময়মনসিংহে। ১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'সেশন জজ কর্তৃক শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তিদান : অপর মামলায় পুনরায় গ্রেফতার : নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে পুলিস কর্তৃক ধৃত নেতাকে লইয়া ময়মনসিংহ যাত্রা'। এতে লেখা হয়:

> গত শুক্রবারে সিলেটের মহকুমা হাকিমের আদালতে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের জামিনের আবেদন বাতিল হওয়ার পর গতকল্য (শনিবার) সেশন জজ তাঁহার জামিন মঞ্জুর করিলেও শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাত হইতে তাঁহার আর নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নাই। সিলেটের কারাগার হইতেই ময়মনসিংহের এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে পুলিস শেখ সাহেবকে পুনরায় গ্রেফতার করিয়া বেলা ২টার দিকে এক নাটকীয় পরিবেশে জেলগেটে সমবেত জনতার প্রবল বিক্ষোভ ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে সরাসরি ষ্টেশনে লইয়া যায় এবং সেশন জজের আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন পেশের প্রস্তুতিপর্বেই পুলিস তাঁহাকে লইয়া আখাউড়াগামী ট্রেনযোগে ময়মনসিংহের পথে পাড়ি দেয়। স্থানীয় মহলের মতে, ট্রেনখানি নির্ধারিত সময়ের (২-৩০ মিঃ) ১৫ মিনিট আগে বেলা সোয়া দুইটায় সিলেট ত্যাগ করে। ময়মনসিংহ হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, সেখানে অদ্য সকালেই মহকুমা হাকিমের আদালতে শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে। প্রকাশ, সেখানে তাঁহার জামিন মিলিলেও শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ তাঁহার ঢাকা আগমন ও অদ্যকার পল্টন ময়দানের জনসভায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না, কারণ প্রদেশের অন্য কয়েকটি স্থানেও নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে এবং তাহারই কোন একটি পরোয়ানা বলে ময়মনসিংহে তাঁহাকে হয়তো পুনরায় গ্রেফতার করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানে চালান দেওয়া হইবে।

১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল সিলেট থেকে ময়মনসিংহ এনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ময়মনসিংহ সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্গবন্ধুর জামিন আবেদন বাতিল করে দেন। দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবর ২৫ এপ্রিল প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ময়মনসিংহে শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন বাতিল : অদ্য সেসন জজের আদালতে আবেদন পেশ'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল (রবিবার) সকাল ৯ টায় ময়মনসিংহ সদর মহকুমা হাকিমের বাসভবনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে হাজির করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহাকে গত শনিবার সিলেটে একবার জামিন লাভের পর অন্য মামলায় পুনর্বার গ্রেফতার করিয়া একটি লোকাল ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ এসডিও আসামীপক্ষের কৌসুলীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বিকাল ৪টা পর্যন্ত শুনানী স্থগিত রাখেন। বিকাল ৪টায় এসডিও জামিনের আবেদন বাতিল করেন। আজ (সোমবার) ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজের আদালতে শেখ সাহেবের জামিনের আবেদন পেশ করা হইবে।

বারো. হয়রানির প্রতিবাদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার এবং হয়রানির প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে অহেতুক হয়রানি করায় পথসভায় বক্তারা সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা জানান। ২৩ এপ্রিল এ সংক্রান্ত একটি খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবরের হয়রানির অবসান দাবী : চট্টগ্রামের রাজপথে স্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল'। দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস থেকে প্রেরিত এই খবরে লেখা হয়:

> শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির প্রতিবাদে আজ বিকালে চট্টগ্রাম শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। শ্রমিক, কর্মী ও যুবকসহ সকল পর্যায়ের নাগরিকদের এই বিক্ষোভ মিছিলটি বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড ও ফেষ্টুন সহকারে শহরের প্রধান প্রধান মহল্লা ও রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। লালদীঘি, রেয়াজুদ্দীন বাজার, দেওয়ান বাজার, ষ্টেশন রোড প্রভৃতি শহরের প্রধান প্রধান মোড়গুলিতে পথসভা করিয়া ছোটখাট বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। সমবেত কণ্ঠে বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যদিয়া জনতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং রাজনৈতিক কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানির আশু অবসান দাবী করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চট্টগ্রামে সর্বপর্যায়ের নাগরিকদের এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শোভাযাত্রা এই প্রথম। অদ্যকার মিছিলে ঘোষণা করা হয় যে, আগামীকালও লালদীঘি ময়দান হইতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির হইবে এবং শহরের বিভিন্ন মহল্লা প্রদক্ষিণ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদের অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ জানান হইবে।

পরদিন ১৯৬৬ সালের ২৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ ও পথসভা হয়। আগের দিনের মতো

এদিনও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ঢাকার পথসভাগুলোতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানি বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ২৪ এপ্রিল এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবের হয়রানি বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ ও পথসভা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির দরুন ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে এবং অবিলম্বে এই হয়রানির অবসানের দাবীতে সর্বস্তরের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শেখ মুজিবের প্রতি এই হয়রানি যতদিন পর্যন্ত বন্ধ করা না হয় এবং তাঁহাকে প্রদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করিতে সুযোগ না দেওয়া হয়, ততদিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রত্যহ চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।
>
> শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির প্রতিবাদে গতকাল (শনিবার) ঢাকার সদরঘাট, জিন্নাহ এভিনিউ, বাহাদুর শাহ পার্ক, জেল গেট, নিউ মার্কেট (বলাকার নিকটে) এবং ঝিগাতলায় স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশ হয়। শ্রমিক, কর্মী ও যুবকসহ সকল পর্যায়ের নাগরিক এই প্রতিবাদ সভায় যোগদান করেন। এই সকল পথসভায় ছোটখাটো বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের এই কার্যের তীব্র সমালোচনা এবং সরকারের অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। পথসভায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানির আশু অবসান দাবী করা হয়।
>
> আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে নানাবিধ হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে পূর্বদিনের মত আজও চট্টগ্রামের কৃষক, শ্রমিক, যুবক ও ব্যবসায়ীরা শহরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
>
> অপরাহ্ন ৫টায় লালদীঘি ময়দান হইতে হাজার হাজার জনতা মিছিল সহকারে শেখ মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ, শেখ মুজিবকে হয়রানি করা চলবে না, ৬-দফা দাবী মানতে হবে, রাজনীতিতে তপ্নীগিরি চলবে না প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শহরে প্রবেশ করিলে পথচারী জনতাও ক্রমে ক্রমে মিছিলে শামিল হইতে থাকে। মিছিল করিয়া তাঁহারা লালদীঘি ময়দান হইতে শুরু করিয়া আন্দরকিল্লা, কাটাপাহাড়, রিয়াজউদ্দীন বাজার, ষ্টেশনরোড, মমিন রোড, পাথরঘাটা প্রভৃতি সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায় থেকেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৯৬৬ সালের ২৫ এপ্রিল কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব আহমদ আলী এক

বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে হয়রানির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারের উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন প্রকার হয়রানিই জনগণের প্রকৃত দাবি-দাওয়ার কণ্ঠরোধ করতে পারবে না। জনগণ তাদের দাবি আদায় করবেই। ১৯৬৬ সালের ২৭ এপ্রিল এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবকে হয়রানির নিন্দা'। এই খবরে লেখা হয়:

> কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আহমদ আলী এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের উপর সাম্প্রতিক সরকারী হয়রানির গভীর নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহার পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে। তিনি বলেন, সরকারের উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন প্রকার হয়রানিই জনগণের প্রকৃত দাবী-দাওয়ার কণ্ঠরোধ করিতে পারিবে না। জনগণ তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য কৃতসঙ্কল্প বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৬৬ সালের ২ মে যশোরে আওয়ামী লীগের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানি ও নির্যাতনের নিন্দা জানানো হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সব মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। ৪ মে দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবের হয়রানীর নিন্দা : যশোর আওয়ামী লীগের সভার প্রস্তাব'। যশোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে লেখা হয়:

> অত্র জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যশোর মিউনিসিপ্যাল আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আব্দুর রাজ্জাক চিশতী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের অহেতুক হয়রানি ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সমস্ত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে যশোর পৌর এলাকা ও মফস্বলে বসন্ত ও কলেরা রোগের মহামারী পরিস্থিতির আশঙ্কাজনক অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং বসন্ত রোগে সমগ্র জেলার মৃত্যুহার সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য গোপন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিন্দা করা হয়। যশোরে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্যও সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে জেলার সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের এই দাবী জানানো হয়।

১৯৬৬ সালের ৩ মে কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, গ্রেফতারি এবং হয়রানির কথা জেনে শুনেই তিনি ৬ দফা দাবি আদায়ে নেমেছেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৪ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ছয় দফা কেন? কমলাপুরের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (মঙ্গলবার) কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গ্রেফতারী এবং হয়রানির কথা জানিয়া-শুনিয়াই তিনি ৬-দফা দাবী অদায়ের সংগ্রামে নামিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, জনগণের ভোটাধিকার নাই এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়ার আশা নাই জানা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভাবিয়াই তিনি ৬-দফা দাবীর সংগ্রামে নামিয়াছেন।
>
> কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ, জলিল। সভার শুরুতে মানপত্র পাঠ করেন জনাব শাখাওয়াত হোসেন। সম্বর্ধনা সভায় কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিউদ্দিন আহমদ, শ্রমিক নেতা জনাব গোলাম মর্তুজা, কমলাপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব ময়জুদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মোশাররফ হোসেন খান (হাসু) বক্তৃতা করেন।
>
> মানপত্রে শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় : "যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ৬-দফা আদায়ের জন্য কমলাপুরের কর্মীবাহিনী দৃঢ়সংকল্প।"

১৯৬৬ সালের ১০ মে সারা প্রদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়ে যুক্তভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবি করে বলা হয়, ছয়দফা আওয়ামী লীগের একার কোন সংগ্রাম নয়, এটা সমস্ত পাকিস্তানবাসীর বাঁচা মরার সংগ্রাম । দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১২ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা বাস্তবায়নের নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবসহ বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড়'। খুলনা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেফতারে বন্দর শহর খুলনার আপামর

> জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নেতাদের এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানোর জন্য ১৩ই মে এখানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।
>
> আওয়ামী লীগ নেতাদের এই গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী এডভোকেট জনাব মনসুর আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব এনায়েত আলী এবং সিটি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম,এ, বারী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতাদের এমন এক সময়ে গ্রেফতার করা হইয়াছে, যখন তাহারা জনসাধারণের প্রাণের দাবী আদায়ে আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। সরকারের এই কার্যকলাপ মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা ও বাক-স্বাধীনতার পরিপন্থী। আইনানুগ পথের আশ্রয় না লইয়া সরকার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন উহা কাপুরুষোচিত। এই বিবৃতিতে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়। খুলনা জেলা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট আবদুল জলিল এই ধরনের ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, গণ-আন্দোলন ধ্বংসের ইহা একটি দুরভিসন্ধি।

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় তুমুল আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আজ জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদারের সভাপতিত্বে মহকুমা আওয়ামী লীগের এক বিশেষ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেসার্স আবদুল মোমিন তালুকদার, ডঃ জসিম উদ্দিন আহমদ, দবির উদ্দিন আহমদ, আবদুর রউফ খান, মনসুর রহমান, শহীদুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনা প্রসঙ্গে সরকারী কার্যাবলীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, মোশতাক আহমদ ও তাজুদ্দীন আহমদসহ ধৃত নেতৃবৃন্দের আশুমুক্তি দাবী করা হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, অবিলম্বে মুক্তি প্রদান না করিলে সমগ্র মহাকুমাব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে।

শ্রমিক সাধারণ এ দমন নীতি বরদাশ্‌ত করিবে না

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিতে অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতা সহ মোট ২০ জনের স্বাক্ষরিত এই যুক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয়: আমরা আরও জানিতে পারিলাম যে সরকার পাকিস্তান রক্ষা আইনের প্রয়োগ করিয়া আমাদের প্রিয় শ্রমিক নেতা জনাব জহুর আহমদ

চৌধুরীকেও ঢাকায় গ্রেফতার করিয়াছেন। তিনি গত ৮.৫.৬৬ তারিখে সকালে উল্কাযোগে ঢাকা যাত্রা করেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে অংশ গ্রহণের জন্যই তিনি ঢাকা গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এমন কি করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে পাকিস্তান রক্ষা আইন বলে গ্রেফতার করা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পরিতেছি না। আমরা সরকারের এই দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছি। সরকারের ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করিবার জন্যই দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সরকার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই যেন এই আইন প্রয়োগ করিতেছেন। এই ধরনের দমননীতি জনগণ বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-সাধারণ কিছুতেই বরদাশত করিবে না। আমরা অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করিতেছি। অন্যথায় যদি কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি উদ্ভব হয়, তাহার জন্য সরকারই দায়ী হইবেন। যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন: মেসার্স জামশেদ আহমদ চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট এসো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; মকবুল আহমদ, সেক্রেটারী বার্মা ইষ্টার্ণ লেবার ইউনিয়ন; এ. বি. এম. আনোয়ার হোসেন, সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কর্মচারী ইউনিয়ন; মাহবুব আলী, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে কর্মচারী লীগ; রহমত উল্লাহ চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে কর্মচারী লীগ নেতা মকবুল হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক, কর্ণফুলী পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; ছিদ্দিক মিয়া, সেক্রেটারী রবাব এন্ড এ্যালাইড প্রোডাক্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; জয়নাল আবেদিন প্রধান, সেক্রেটারী টাটরী গ্লাস শ্রমিক ইউনিয়ন; নূর আহমদ, সেক্রেটারী পাকিস্তান টোবাকো কর্মচারী ইউনিয়ন; সফিকুর রহমান চৌধুরী, সেক্রেটারী, মটর ড্রাইভার্স ইউনিয়ন; সফিকুর রহমান, সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম মাষ্টার্ড ওয়েল এন্ড ভেজিটেবল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; নূরুল আমিন, সেক্রেটারী, গোল্ডেন টোবাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; এস, এম, মহিবুর রহমান, সেক্রেটারী ন্যাশনাল সিমেন্স ইউনিয়ন; মোহাঃ ইলিয়াছ, কার্যকরী সভাপতি, ন্যাশনাল সিমেন্স ইউনিয়ন; এম. এ. ছালাম সেক্রেটারী, আমিন জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়ন; আবু সিদ্দিক, সেক্রেটারী, সিদ্দিক ওয়েল মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; মোহাঃ এয়াহিয়া চৌধুরী, সেক্রেটারী, এসো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। খায়রুল আনোয়ার, সেক্রেটারী, পাকিস্তান রোপ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; বেবী টেক্সী ড্রাইভার্স ইউনিয়ন; জয়েন্ট সেক্রেটারী, চিটাগাং মাষ্টার্ড ওয়েল এন্ড ভেজিটেবল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; ডাঃ আনোয়ার হোসেন, সভাপতি, আজিজ উদ্দিন টোবাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন; সালেহ আহমদ চৌধুরী, সেক্রেটারী, আজিজ উদ্দিন টোবাকো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

'দেওয়ালের লিখন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন'

পূর্ব পাকিস্তান বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম, শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন, 'নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় ও নির্যাতন করিয়া কোন আন্দোলনকে বন্ধ করা যায় না। বরঞ্চ ইতিহাসের নজির হইতে দেখা যায় যে, নির্যাতন যত বেশী হইয়াছে জনসাধারণের দুর্বার গতিও তত শক্তিশালী হইয়াছে।' "কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করি, সরকার যেন দেওয়ালের লিখন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ধৃত নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেন। অন্যথায় তুমুল গণ-আন্দোলন তার স্বভাব গতি পথ বাছিয়া লইবে।"

চট্টগ্রামে প্রতিবাদ সভা : নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

শেখ মুজিব সহ অন্যান্য নেতার গ্রেফতারে গতকাল আন্দর কিল্লাস্থ জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে চট্টগ্রাম শহর ও জেলা আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দ এবং যুব সমাজ ও শ্রমিকদের এক যুক্ত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী।

শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকিলেও বিপুল সংখ্যক লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় ১৩ই মে'র প্রতিবাদ দিবসে শহরের জে, এম, সেন হলে সভা, প্রতি থানা সদর দফতরে সভা ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ এই প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কক্সবাজার, সাতকানিয়া, পটিয়া, আনোয়ারা, বাঁশখালি, রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, মীরেশ্বরাই ও ডবল মুরিং এলাকায় সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যুক্ত বিবৃতি

সারা প্রদেশে নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রাম বার সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কাসেম এডভোকেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম,আর, সিদ্দিকী, সাংগঠনিক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আবদুল্লা আল হারুন চৌধুরী, দফতর সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান এবং সহ-সম্পাদক জনাব আবদুল ওয়াহাব যুক্তভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে তাহারা বলেন, ৬-দফার সংগ্রাম শেখ মুজিব অথবা আওয়ামী লীগের একার সংগ্রাম নহে; ৬-দফা সমগ্র পাকিস্তানবাসীর বাঁচা মরার দাবী। সুতরাং নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া এই দাবীর সংগ্রাম বন্ধ করা যাইবে না। একদলকে গ্রেফতার করিলে নূতন আরেক দল এই সংগ্রামের পতাকা হাতে নিয়া অগ্রসর হইবে।

যশোরের সর্বত্র অসন্তোষ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদে যশোরের সর্বত্র নিদারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। শহর আওয়ামী লীগের উদ্দেশে গত ৯ই মে সন্ধ্যা ৭টায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকে বিনা বিচারে আটকের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ সকল রাজনৈতিক নেতাকে বিনাশর্তে মুক্তির দাবী করা হয়। সভার অপর একটি প্রস্তাবে যশোরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ খাদ্যদ্রব্যের উর্ধ্বগতিরোধ করিবার জন্য পূর্ণ রেশনিংসহ অবিলম্বে সর্বদলীয় ভিত্তিক শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ফুড কমিটি গঠন পূর্বক সুষ্ঠুভাবে যাহাতে খাদ্য বণ্টন করা হয় তাহার দাবী জানানো হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রকার সার্টিফিকেট, শুল্ক ট্যাক্স আদায় বন্ধ রাখিবার জন্যও সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়।

১৯৬৬ সালের ১৪ মে চাঁদপুর পৌর পার্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় সমগ্র দেশবাসীর ন্যায্য দাবি ৬- দফা দাবিয়ে রাখার জন্য দেশরক্ষা আইনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে আটক রাখার তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবি জানানো হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৮ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার কর : শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীর মুক্তি চাই, প্রতিবাদ দিবসে সর্বত্র বলিষ্ঠ আওয়াজ'। চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল স্থানীয় পৌর পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব চান্দ বক্স পাটোয়ারী। কোটি কোটি মানুষের ন্যায্য দাবী ৬-দফা দাবাইয়া রাখার জন্য দেশরক্ষা আইনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়া আটক রাখার তীব্র নিন্দা এবং তাঁহাদের আশু মুক্তির দাবী জানাইয়া সভায় বক্তৃতা করেন চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব সিরাজুল ইসলাম (উকিল), জনাব আবদুল করিম, জনাব আবদুল লতিফ ও রুহুল আমিন প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে জনাব চান্দ বক্স দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আশু মুক্তির জন্য প্রদেশের সর্বত্র নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

> সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা এবং আশু মুক্তি দাবী, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও দেশরক্ষা আইন রাজনীতিবিদদের প্রতি প্রয়োগ করার তীব্র নিন্দা, টেঞ্জুপাতা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার ও লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের কর্ম সংস্থান, ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন লেভী প্রথা প্রত্যাহার ও প্রচুর-পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের দাবী এবং প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু করার দাবী জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নেত্রকোনা মোক্তার পাড়ার মাঠে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ ছয়দফা ব্যাখ্যা করেন এবং অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৯ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবসহ আটক নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী'। নেত্রকোনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ১৩ তারিখ নেত্রকোণা আওয়ামী লীগ স্থানীয় মোক্তার পাড়ার মাঠে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। বিশিষ্ট মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সাদির উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সভায় আওয়ামী নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন। শেখ মুজিবের ৬-দফা ব্যাখ্যা করিয়া বক্তাগণ ইহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেন। শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের জন্য বক্তাগণ তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

নারায়ণগঞ্জ মোক্তার সমিতি

গোটা পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক দিক বিবেচনা করিয়াই পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দ লাহোর সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। ৬-দফা দাবী ১০ কোটি মানুষের প্রাণের দাবী। এই দাবী দেশের সর্ব মহলের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। দেশবাসী মনে করেন যে, ৬-দফা কার্যকরী হইলে শক্তিশালী পাকিস্তান ও দেশের সংহতি সুদৃঢ় হইবে।

হাটহাজারী

গত ১৩ ই মে হাটহাজারীতে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শফিকুল ইসলাম চৌধুরী। হাটহাজারী থানার

বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু লোক এই সভায় যোগদান করেন। সভায় হাটহাজারী থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল ওহাব সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, সরকার যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ৬-দফার প্রবক্তা জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে জেলে আটক রাখিয়া দফার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে, তাহা হইলে সরকার নিশ্চয়ই ভুল করিতেছেন। কেননা, ৬-দফা কেবল আওয়ামী লীগের দাবী নয়, ইহা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবী, ইহার বাস্তবায়নের মধ্যেই পাকিস্তানের সাড়ে দশ কোটি মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিহিত। তিনি প্রতি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে আরও মজবুত করিয়া তোলার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ইউনুস আলি উকিল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, জনগণের দাবীকে বানচাল করার জন্যই নেতৃবৃন্দকে কারা প্রাচীরের অন্তরালে আটকাইয়া রাখা হইতেছে। কিন্তু দমন নীতির মাধ্যমে জনগণের দাবীকে কেহ কোনদিন দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই। ৬-দফার দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশের কল্যাণার্থ ৬-দফা দাবীর মাধ্যমে সরকারকে একটা পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে মাত্র– ইহাতে অন্য কোন কিছুই বলা হয়না। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যই এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৬৬ সালের ১৯ মে ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানার কাওরাইদে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে স্মরণকালের এক বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় দেশবাসীর ছয়দফা দাবি আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার অনড় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। ২০ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফা আদায়ে দেশবাসীর অনড় সঙ্কল্প, আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীতে কাওরাইদে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা'। গফরগাঁও থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে সম্প্রতি গফরগাঁও থানার কাওরাইদে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ৬ দফার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ৬-দফা মুজিবরের নয়, আওয়ামী লীগের–নয়, ৬-দফা জনসাধারণের প্রাণের দাবী, ন্যায্য দাবী।

> ঢাকার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শামসুল হক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশে খাদ্য পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিতেছে। লেভীর মাধ্যমে কৃষকদের গোলার ধান সরকারী গুদামে উঠাই ইহার কারণ বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। ৬-দফার বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, জনসাধারণের প্রাণের দাবী ৬-দফা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার অপরাধেই সরকার শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করিয়াছেন। শেখ সাহেবের হয়রানির বিবরণ দান করিলে জনসাধারণ 'শেম শেম' ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে।
>
> ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, কোন নির্যাতনই আমাদের টলাইতে পারিবে না। তিনি বলেন, ৬-দফার সহিত জনসাধারণের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত।
>
> তিনি আরও বলেন যে, ধান-চাউলসহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে দেশে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি জনসাধারণকে ৬-দফা দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার আবেদন জানান।

১৯৬৬ সালের ২১ মে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য আপোসহীন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। ছয়দফা দাবি আদায় ও প্রদেশব্যাপী গ্রেফতার ও দমননীতির প্রতিবাদে ৭ জুন হরতালের ডাক দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২২ মে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তিসহ কতিপয় সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে ৭ই জুন হরতাল আহ্বান, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনারত নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা বিধিবলে কারাগারে আটক করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য আহূত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গতকাল (শুক্রবার) দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর ৬-দফার সমর্থনে ও কতিপয় সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত করে এবং এই হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য আওয়ামী লীগের শাখা কমিটিসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

তেরো. হয়রানির প্রতিবাদ হয় পশ্চিম পাকিস্তানেও

পাকিস্তানের করাচি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হয়রানির প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৯৬৬ সালের ১ মে

এক বিবৃতিতে করাচি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান আহমদ আলতামাশ বলেন, দেশের বর্তমান জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ছয়দফা একটি আদর্শ ফর্মুলা। তিনি বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতা অভিহিত করে বলেন, সারাদেশ তাঁকে সম্মান ও সমর্থন করে। ক্ষমতাসীন দলেরও তাঁকে প্রাপ্য সকল প্রকার সম্মান দেখানো উচিত। এই খবর ২ মে দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিব নিপীড়িত জনগণের স্বার্থকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন: করাচী আওয়ামী লীগ নেতা কর্তৃক সরকারী নীতির সমালোচনা'। করাচি থেকে বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহসান আহমদ আলতামাশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে যেভাবে হয়রানী করা হইতেছে তাহার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে শাসক গোষ্ঠীর দেউলিয়াপনাই প্রকাশিত হইয়াছে। জনাব আলতামাশ বলেন যে, এইভাবে আইনের শাসনকে হেয় করা হইতেছে। জনাব আলতামাশ জানিতে চাহেন যে, জনাব মুজিবর রহমান এমন কি করিয়াছেন যার জন্য শাসক-চক্র তার সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করিতে পারেন?
>
> তিনি বলেন যে, জনাব মুজিবর রহমানের একমাত্র অপরাধ হইতেছে এই যে, তিনি দেশের নিপীড়িত জনগণের স্বার্থকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। করাচী আওয়ামী লীগ নেতা আরও বলেন যে, দেশের সম্মুখে বিদ্যমান জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ৬-দফা একটি আদর্শ ফর্মুলা। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতা এবং সারাদেশ তাঁহাকে সম্মান ও সমর্থন করে। উপসংহারে তিনি বলেন যে, ক্ষমতাসীন দলের তাঁহাকে একজন রাজনৈতিক নেতার প্রাপ্য সকল প্রকার সম্মান দেখানো উচিত অন্যথায় তাহারা দেশে অবাঞ্ছিত নজীর স্থাপন করিবেন।

চৌদ্দ. গ্রেফতার হয়রানির মধ্যেও জনসভা বন্ধ হয়নি

ছয়দফা আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য একদিকে চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু অব্যাহত রাখেন ছয়দফার সমর্থনে দেশব্যাপী জনসভা।

১৯৬৬ সালের ২৫ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ময়মনসিংহ কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর সন্ধ্যায় মোটরযোগে ঢাকায় ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিলাভের সংবাদ পেয়ে বিপুল জনতা তাকে

সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সমবেত হন। তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি খবর ২৬ এপ্রিল ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ছয় দফার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে' শেখ মুজিবের জামিন লাভ: ঢাকা ও ময়মনসিংহে বিপুল সম্বর্ধনা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) অপরাহ্ন তিনটার দিকে ময়মনসিংহের দায়রা জজ কর্তৃক জামিনে মুক্তি লাভের পর সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় মোটরযোগে ঢাকা উপস্থিত হন। তাঁহার জামিন লাভের সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই তেজগাঁও ফার্ম গেটে বিপুল জনতা তাহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সমবেত হয়। শেখ মুজিবের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তুমুল জিন্দাবাদ ধ্বনিতে জনতা ও কর্মিগণ তাহাকে অভিনন্দন জানায় এবং বিপুলভাবে মাল্য ভূষিত করে। আওয়ামী লীগ নেতা সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।
>
> ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর করার পর শেখ মুজিব গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় মোটরযোগে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা রওয়ানা হন। জামিন প্রাপ্তির খবরে ঢাকায় বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। জনতা, কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বিকাল ৫টা হইতে ফার্ম গেটে শেখ মুজিবের আগমন প্রতীক্ষায় রাস্তার দুই পার্শ্বের ফুটপাথে এবং রাস্তার মধ্যবর্তী আইল্যান্ডে অপেক্ষা করিতে থাকে। সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে শেখ মুজিবকে লইয়া মোটরটি ফার্ম গেটে পৌঁছিলে বিরাট জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। কর্মী ও জনতার সম্বর্ধনার জবাব দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন: অত্যাচার-উৎপীড়ন দিয়া আমাদের দমাইয়া দেওয়া যাইবে না। ৬-দফা আদায়ের সংগ্রাম আমাদের চলিতেই থাকিবে। এই ৬-দফা আদায়ের জন্য তিনি জনসাধারণকে দেশব্যাপী দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানান। শেখ সাহেব ৬-দফাকে এদেশের মানুষের মুক্তি সনদ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এই ৬-দফার উপর নির্ভর করিতেছে।
>
> কয়েকদিন হাজত বাসের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, জনতার দাবী আদায়ের জন্য সারা জীবন তিনি জেলে থাকিতে রাজী আছেন। শেখ সাহেবের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাতেম আলী তালুকদার প্রমুখ ঢাকা আসেন। ফার্মগেটে অন্যান্যের মধ্যে জনাব জহিরুদ্দীন, হাফেজ হাবিবুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, জনাব আবদুল মালেক উকিল

এম,পি,এ, জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান, হাফেজ মুসা, গাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানান।

১৯৬৬ সালের ৬ মে ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিলেটে পৌঁছলে বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং ছয়দফা জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তিনি জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৭ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিবের সিলেট সফরের পথে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া'। সিলেট থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম-এন-এ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন ও কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী সমভিব্যাহারে ট্রেনযোগে এখানে উপনীত হইলে তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ মুজিবকে লইয়া ট্রেনখানা সিলেট ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিপুল জনতা শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ছয় দফা জিন্দাবাদ, মুজিবকে হয়রানি করা চলবে না প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

বিভিন্ন স্টেশনে সম্বর্ধনা ও সভা

ঢাকা হইতে সিলেটের পথে আড়িখোলা, নরসিংদী, ভৈরব, আখাউড়া ও কুলাউড়া ষ্টেশনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক শোভাযাত্রা সহকারে আসিয়া বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। প্রত্যেক ষ্টেশনে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া শেখ সাহেব বক্তৃতা করেন।

রাত দুইটায় শেখ সাহেবকে লইয়া ট্রেনখানি আখাউড়া পৌঁছিলে কয়েক হাজার লোক তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। জনতা ষ্টেশনে এক মঞ্চ নির্মাণ করে এবং শেখ সাহেবকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করে। শেখ সাহেব জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফা দাবী ব্যাখ্যা করিয়া উহা আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানাইলে জনতা হাত তুলিয়া সংকল্প প্রকাশ করে। বৃষ্টির মধ্যেও দীর্ঘ অর্ধঘণ্টাব্যাপী জনতা শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করে।

শেখ সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, আমার জন্য আপনাদের স্নেহ ও ভালবাসা আমাকে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে উৎসাহ দান করিয়াছে।

পরদিন ১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় উপস্থিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছয়দফাকে বাঁচার দাবি অভিহিত করে জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই আমাদের সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। তিনি বলেন, ছয়দফা আদায়ের জন্য দেশের মানুষ কারাভোগসহ যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। ৯ মে এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'দলে দলে কারাবরণের এই প্রস্তুতির মুখে দশ কোটি মানুষের এ মুক্তি সংগ্রাম প্রতিরোধের ক্ষমতা কাহারও নাই : নারায়ণগঞ্জের অভূতপূর্ব জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা: সংগ্রামী নেতার প্রতি শহরবাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণনির্মিত প্রতীক উপহার দান'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

শক্তিশালী কেন্দ্র নয় শক্তিশালী পাকিস্তানই আমাদের কাম্য। তাই মুক্তি সনদ হিসাবে ৬-দফা দাবী পেশ করা হইয়াছে। আর এই দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই আমাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।'

গতকাল (রবিবার) নারায়ণগঞ্জ টাউন হল ময়দানে নয়নাভিরাম ও সুশৃংখল পরিবেশে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তেজদৃপ্ত কণ্ঠে উক্ত ঘোষণা করেন।

গতকাল নারায়ণগঞ্জের জনসভায়ই সর্বপ্রথম ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানকে সাড়ে পাঁচ কোটির নহে– দশ কোটি জনগণের নেতা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের জনসাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিবর রহমানকে ৬-দফা খোদিত একটি স্বর্ণতারকায় ভূষিত করা হয়।

সভায় আদমজী শ্রমিকদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে পাটের তৈরী মালায় ভূষিত করা হয়। বস্ত্রমিল শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আওয়ামী প্রধানকে মাল্যভূষিত করা হয়। ইহাছাড়া পাট ব্যবসায়ী, সিটি আওয়ামী লীগ এবং জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। ৬-দফার প্রতীক হিসাবে শেখ মুজিব ৬টি শান্তি কপোত উড়াইয়া দেন। সভাশেষে ৬-দফার প্রতীক হিসাবে ৫টি মশাল জ্বালাইয়া সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করা হয়।

গতকাল জনতার অনুরোধে নির্ধারিত সময়ের অর্ধঘণ্টা পূর্বেই সভার কাজ শুরু করিতে হয় এবং রাত ৮টা পর্যন্ত সভার কাজ চলে। ৬-দফা দাবী আদায়ের অগ্নিশপথ গ্রহণ করার জন্য আদমজী জুট মিলের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক মিছিল সহকারে সভায় আগমন করে। ইহাছাড়া

শীতলক্ষ্যা, নলুয়া, পাইকপাড়া, দেওভোগ ও হাজিগঞ্জ ইউনিয়ন হইতে এবং বিভিন্ন মহল্লা হইতে মিছিল সহকারে জনতা সভায় যোগদান করে। এই সকল মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ৬-দফা দাবীর সমর্থনে ও অন্যান্য দাবী-দাওয়া সম্বলিত বিভিন্ন ফেষ্টুন শোভা পাইতেছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় বিড়ি শিল্পের শ্রমিক ও মালিকদের একটি মিছিল আসিয়া সভায় শামিল হয়। মুহর্মুহু করতালির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, শক্তিশালী, সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও গণতান্ত্রিক পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা পেশ করি। কিন্তু আমাদের বিদেশীর চর এবং পাকিস্তানের ধ্বংসকামী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইতেছে। কিন্তু এসব আখ্যা আমাদের কাছে নূতন নয়। পাকিস্তানের ভিত্তি লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতা শেরেবাংলা এবং পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও উক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় নিতে হইয়াছে।

সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপুল জনতাকে লক্ষ্য করিয়া শেখ মুজিব এক এক করিয়া ৬-দফা কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করিয়া তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, ৬-দফা দাবী উত্থাপনের পর হইতে নূতনভাবে আমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দায়ের করা হইতেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের জানিয়া রাখা দরকার যে, কোন কিছুতেই আমাদের ৬-দফা আদায়ের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না। নিবিষ্টচিত্ত শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, আওয়ামী লীগের ১৪ শত কর্মী ৬-দফা আদায়ের জন্য কারাভোগসহ যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। এ সময় জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রয়োজন বোধে আপনারাও কারাভোগে প্রস্তুত আছেন কি? সঙ্গে সঙ্গে একযোগে লক্ষ হস্ত উত্তোলন করিয়া জনতা কারাভোগের প্রস্তুতির শপথ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বাধ্যতামূলক লেভী করা হইয়াছে, তাই সার্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা উচিত ছিল। তিনি বলেন যে, লেভী করিয়া সরকারী গুদামে ধান-চাউল জমা করা হইয়াছে বলিয়া আজ বাজারে ধান-চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। তিনি অবিলম্বে পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়া দুর্দশা-পীড়িত মানুষকে রক্ষা করার দাবী জানান।

৬-দফার সমালোচকদের লক্ষ্য করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ৬-দফায় শ্রমিক-কৃষকদের কথা নাই, এই সকল সমালোচকদের জানাইয়া দিতে চাই যে, আওয়ামী লীগের কর্মসূচী দেখুন। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। অতএব, তাহাদের ঐসব সমালোচনা অর্থহীন। কেননা সমাজতন্ত্রের মধ্যেই দেশের শ্রমিক-কৃষকের সমস্যার সমাধান নিহিত আছে।

জহীরুদ্দীন

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব একেএম শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব জহীরুদ্দিন বলেন যে, ৬-দফার জনপ্রিয়তাই ক্ষমতাসীন মহলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইতিমধ্যেই করাচী আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়া উহা আদায়ের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। ৬-দফার জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া ক্ষমতাসীনরা বেসামাল হইয়া ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানকে হয়রানি করিতেছে। তবে যত হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক না কেন, ৬-দফার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হইব।

মিজানুর রহমান চৌধুরী

সরকারী নীতির তথ্য-ভিত্তিক সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম,এন,এ, বলেন যে, প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের পূর্বে জনাব আইয়ুব খান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কার্টেলের অবসান ঘটাইবেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত উহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জনাব চৌধুরী বলেন যে, বর্তমান শাসকরা অহরহ রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন শেরে বাংলা জীবনে ওকালতী করিয়া বহু অর্থ আয় করা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মরহুম জনাব সোহরাওয়ার্দী ওকালতী করিয়া মাসে ৩০/৪০ হাজার টাকা রোজগার করিতেন, কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি ১৩ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দিন ও জনাব মোহাম্মদ আলীর ছেলেরা চাকুরী করিয়া সংসার চালাইতেছেন। কিন্তু বর্তমান আমলে দেখা যাইতেছে যে, ৫/৬ বছর আগেও যাহারা ৬০০ টাকা মাইনায় চাকুরী করিত, আজ তাহারা কোটি কোটি টাকার মালিক।

মুষ্টিমেয় লোককে ধনী করার নীতির সমালোচনা করিয়া জনাব চৌধুরী বলেন যে, মশলা আমদানীর জন্য একটিমাত্র লোককে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকিলে উক্ত টাকার লাইসেন্স ২২ হাজার অথবা উহা অপেক্ষাও বেশীসংখ্যক ছোট ব্যবসায়ীকে বণ্টন করিয়া দিত। ফলে একজন মুনাফার পাহাড় গড়ার সুযোগ পাইত না।

রফিকুল হোসেন

বিশিষ্ট আওয়ামী নেতা জনাব রফিকুল হোসেন বলেন যে, ৬-দফা পাকিস্তানের ১০ কোটি লোকের মুক্তি সনদ। তাই ইহার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানও ১০ কোটি পাকিস্তানীর সত্যিকারের নেতা।

জহুর আহমদ চৌধুরী

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী সরকারের বিড়ি পাতা আমদানী বন্ধ করার নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সরকারের খামখেয়ালির দরুন আজ ৭ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক তাহাদের প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার-পরিজনকে লইয়া পথে বসিয়াছে। তিনি বিড়ি শ্রমিক ও তাহাদের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করার দাবী জানান। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য জনাব চৌধুরী দাবী জানান। তিনি বলেন যে, ৬-দফা দাবী আদায় করা গেলে এই সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইবে। সভায় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান ও নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোস্তফা সরোয়ারও বক্তৃতা করেন।

সভাপতির ভাষণ

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে জনাব এ, কে, এম শামসুজ্জোহা দেশের মুক্তি সনদ ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য মরণপণ সংগ্রামের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নিহিত।

প্রস্তাবাবলী

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও শেখ মুজিবর রহমানের হয়রানির অবসান ঘটানোর দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে মূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা করার দাবী জানান হয়। সভায় বিড়ি শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লওয়ার দাবীসহ আরও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পনেরো. দেশরক্ষা আইনে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জ থেকে জনসভা করে ঢাকায় ফেরার পর ১৯৬৬ সালের ৮ মে দেশরক্ষা আইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৮ মে রাত ২টায় ঢাকায় ধানমণ্ডির বাসভবন ঘেরাও করে পুলিশ। তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানাটি তাঁর হাতে দেয়া হয়। পরে ওই রাতেই তাঁকে সরাসরি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর ৯ মে দৈনিক ইত্তেফাকে শেষ পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'দেশরক্ষা আইনবলে

আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতাকে কারাগারে আটক'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গত রবিবার দিনগত রাত দুইটা হইতে চারটার মধ্যে ঢাকা শহরে প্রকৃত প্রস্তাবে ৬ জন এবং চট্টগ্রামে একজন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করিয়া দেশরক্ষা আইনের ৩২(১)ক ধারার বিধানবলে কারাগারে আটক করা হয়। শেখ সাহেবসহ ঢাকায় গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে ঐরাতেই সরাসরি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দেশরক্ষা আইনের এই ধারাটিতে 'পাকিস্তানের জননিরাপত্তা, স্বার্থ বা দেশরক্ষা, জনশৃংখলা, অন্য কোন শক্তির সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক পাকিস্তানের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও কাজকর্ম অব্যাহত রাখার বা যথাযোগ্যভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ আপত্তিকর বলিয়া নিঃসন্দিহান হন, 'তবে তাঁহাকে আটকের নির্দেশ দিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইয়াছে।'
>
> প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবিবার রাত দুইটায় শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন ঘেরাও করা হয় এবং জনৈক পুলিস অফিসার তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া গ্রেফতারী পরোয়ানাটি তাহার হাতে দেন। অল্প সময়ের মধ্যে শেখ সাহেব প্রস্তুত হন। রাত্রি তিনটায় তাঁহার সহোদর এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ সাহেবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটে পৌঁছাইয়া দেন।
>
> একই সময়ে পুলিস আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদের বাসভবনে হানা দেয়। তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। রাত প্রায় তিনটায় পুলিস পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরীর বাসভবনে হানা দেয় এবং তাঁহাকেও গ্রেফতার করিয়া সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যায়। ঐ রাতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে নওয়াবপুর সেন্ট্রাল হোটেল হইতে এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমানকে (রাজশাহী) নওয়াবপুর ঢাকা বোর্ডিং হইতে গ্রেফতার করা হয়।
>
> উল্লেখযোগ্য যে, গত রবিবার শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যোগদানের জন্য জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রাম হইতে এবং জনাব মুজিবর রহমান রাজশাহী হইতে ঢাকা আগমন করেন। গতকাল চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, তথায় রবিবার রাত্রে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম এ আজিজকে গ্রেফতার করিয়া দেশরক্ষা আইনবলে কারাগারে আটক করা হইয়াছে।

ষোলো. বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও মুক্তিদাবি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করায় সারা দেশে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবী করেন।

আওয়ামী লীগ

১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল খুলনা বাগেরহাটের পৌর পার্কে ৬ দফার দাবিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় ছয়দফা দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৫ এপ্রিল ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার দাবীতে বাগেরহাটে বিরাট জনসভা লেভী প্রথা প্রত্যাহার ও চাউলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যে গভীর উদ্বেগ'। বাগেরহাট থেকে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> আজ বিকালে স্থানীয় পৌর পার্কে ৬-দফার দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল হামিদ (উকিল)। সভায় প্রধান বক্তার ভাষণে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ ৬-দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উহার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
>
> জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মনসুর আলী, প্রাক্তন সম্পাদক জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, খুলনা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মমিন উদ্দিন আহমদ, জনাব একরামুল কবীর ও জনাব আলী আহমদ প্রমুখ নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, লেভী প্রথা প্রত্যাহার, কলেরা ও বসন্ত মহামারী প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে পৌর কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।
>
> সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে স্থানীয় বাজারে চাউল, চিনি ও আটার অভাব এবং চাউল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে চাউল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির জোর দাবী জানান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে স্থানীয় বাজারে প্রতিমণ চাউল ৪০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করায় ১৯৬৬ সালের ৯ মে শ্রমিক এলাকায়ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ও স্লোগানে মুখরিত হয় ঢাকার তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিল এলাকা। এই খবর ১০

মে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীতে ঢাকায় ও শ্রমিক এলাকায় বিক্ষোভ'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ প্রমুখের গ্রেফতারের সংবাদ গতকাল সকালে শহরে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং শহরবাসীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কালোব্যাজ পরিধান, বিক্ষোভ মিছিল, পথসভা এবং বিবৃতির মাধ্যমে সকল শ্রেণীর নাগরিক ও শ্রমিক তাহাদের ক্ষুব্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে।
>
> **আদমজী মিলে শ্রমিক বিক্ষোভ**
>
> নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদ পাইয়া আদমজী জুট মিলের শ্রমিকরা গতকাল কালোব্যাজ ধারণ করে এবং সকাল ১১টা, বিকাল ৪টা, রাত ৯টা এবং রাত ২টায় কাজে যাওয়ার এবং কাজ শেষে ফিরিয়া আসার পথে মিছিল করিয়া তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শেখ মুজিবসহ বন্দী সকল নেতার মুক্তির দাবী জানাইয়া শ্লোগান দেয়। তাহারা রেশনে মাথাপিছু ৫ সের সিদ্ধ চাউল দেওয়ার দাবী জানাইয়া শ্লোগান তোলে। রাত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, মিলের শ্রমিকরা নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে মিল এলাকায় এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ করিয়া ফিরিতে থাকে। নেতৃবৃন্দের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহারা এইভাবে বিক্ষোভ চালাইয়া যাওয়ার এমনকি প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ কর্মসূচী গ্রহণেরও সংকল্প ঘোষণা করেন।
>
> **তেজগাঁও ও ঢাকায় বিক্ষোভ**
>
> গতকাল বিকালে শেখ মুজিবর ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার মুক্তির দাবীতে তেজগাঁও শিল্প এলাকার শ্রমিকরাও বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল বাহির করে। তাহারা ধৃত নেতাদের আশু মুক্তির দাবী জানায়। বিকাল সাড়ে ৫টায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভকারী জনতা নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী সম্বলিত প্লাকার্ডসহ মিছিল করিয়া বায়তুল মোকাররম হইতে সদরঘাট ও চকবাজার হইয়া শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে গিয়া ছত্রভঙ্গ হয়। পথিমধ্যে নবাবপুর, বাহাদুর শাহ পার্ক, সদরঘাট ও চকবাজারে পথসভা করিয়া বক্তৃতা করা হয়। বিক্ষোভকারীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্দী নেতাদের মুক্তি চাই, ৬-দফা কায়েম কর, ন্যায্যমূল্যে খাদ্য চাই প্রভৃতি ধ্বনি দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর বিষয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত আরও খবর ১৯৬৬ সালের ১১ মে

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে যশোর ও চট্টগ্রামের দুটি খবরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে যশোর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে আটক নেতাদের মুক্তি দাবি করা হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ এক সভায় বঙ্গবন্ধুসহ অন্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদের মুক্তি দাবি করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত খবর দুটির শিরোনাম ছিল: 'যশোরে প্রতিবাদ' ও 'চট্টগ্রামে ক্ষোভ প্রকাশ'। এতে বলা হয়:

> আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও আটক নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া যশোর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, নিপীড়িত মানুষের দাবীই শেখ মুজিব তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কারণে সরকার তাঁহাদের কারান্তরালে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের ইহা বুঝা প্রয়োজন যে, দমননীতি প্রয়োগ করিয়া কোন শাসকগোষ্ঠীই মানুষের ন্যায্য দাবী প্রতিহত করিতে পারে নাই। সুতরাং সরকার যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইলে দেশবাসীর জন্য মঙ্গলজনক হইবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন মেসার্স আবদুর রশীদ, এম রওশন আলী বি, এল, সৈয়দ আতর আলী, সোহরাব হোসেন এলএলবি, আফছার উদ্দীন আহম্মদ, খোন্দকার আব্দুল হাফিজ এলএলবি, জে কে এম আবদুল আজীজ ও আলহাজ নূর বখশ।
>
> চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ অফিসে এক সভায় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া শীঘ্রই তাঁহাদের মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সৈয়দুর রহমান চৌধুরী। সভায় বিভিন্ন বক্তা সরকারের দমননীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশবাসীর ন্যায্য দাবী প্রতিফলন করিয়া যদি কারাবরণ করিতে হয়, তবে কারাবরণের জন্য এই দেশে লোকের অভাব হইবে না। তাঁহারা অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

১৯৬৬ সালের ১০মে দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে বের করে না আনা পর্যন্ত ছয়দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এছাড়াও বক্তাগণ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জেল জুলুমের প্রতি নিন্দা জানান। এ সংক্রান্ত খবর ১৯৬৬ সালের ১২মে দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: '৬-দফা আদায়ের

নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে দাউদকান্দি জনসভার রায়'। কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল স্থানীয় হাইস্কুলের খেলার মাঠে দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অন্যূন ১০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব হইতেই বহু দূর-দূরান্ত হইতে জনসাধারণ সভাস্থলে উপস্থিত হয়। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানসহ খোন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার বক্তৃতা করার কথা ছিল। কিন্তু শেখ সাহেব, খোন্দকার মোশতাক ও অন্যান্য নেতা গ্রেফতার হইবার পরেও সভায় এই বিপুল জনসমাবেশ ভবিষ্যৎ আন্দোলনের এক নবসূচনা করে এবং ৬-দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনেরই পরিচয় ফুটিয়া উঠে। সভার শুরু হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপুল করতালির মধ্যে শ্রোতাগণ বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং ৬-দফা আদায় ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলন চালাইয়া যাইবার শপথ গ্রহণ করে।
>
> **এম এ রব এডভোকেট**
>
> সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এডভোকেট এম এ রব ৬-দফার বিশদ ব্যাখ্যাদান করেন। তার বক্তৃতার সময় জনসাধারণ হাত তুলিয়া ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। জনাব রব বলেন, আজ হইতে ১৮ বছর পূর্বে ছাত্র থাকাবস্থায় পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রামে একজন কর্মী হিসাবে বক্তৃতা করিয়াছি। কিন্তু আজ ১৮ বছর পর আবার মানুষের মৌলিক অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং মানুষের বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নামিয়া বক্তৃতা করিতে হইতেছে। আজ শেখ মুজিবসহ গণনেতারা স্বাধীন দেশের কারাগারে বন্দী, ধান-চাউলসহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, অগণিত মানুষ আজ অর্ধাহারে-অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে। এমতাবস্থায় সকল মানুষের সামনে আজ এই প্রশ্নই নতুন করিয়া দেখা দিয়াছে 'আমরা চক্ষু বুঁজিয়া এই অনাচার সহ্য করিব না, নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িব।' আজ জনগণের সামনে ৬-দফা গণমুক্তির মহাসনদরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সেই জন্য ক্ষমতাসীনরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ধর-পাকড়ের আশ্রয় লইয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ১১ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো অব্যাহত থাকে। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতার মুক্তির জন্য বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও শিল্প এলাকা প্রতিবাদমুখর থাকে। ১২ মে এই খবর দৈনিক

ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী : নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে নিন্দামুখর পূর্ব বাংলা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> শেখ মজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার গ্রেফতারে সমগ্র দেশ নিন্দামুখর হইয়া উঠিয়াছে। ঢাকা এবং প্রদেশের সর্বত্র সরকারী দমন নীতির নিন্দা করিয়া বিনাশর্তে নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তির দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভের ঝড় অব্যাহত রহিয়াছে।
>
> গতকাল শহরে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতার মুক্তির জন্য বিক্ষোভ, মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে বায়তুল মোকাররমে পথসভার পর বিক্ষোভকারীরা বন্দী নেতাদের মুক্তির দাবীসূচক শ্লোগান দিতে দিতে সদরঘাট পর্যন্ত যায়। পথিমধ্যে এবং সদরঘাটে তাহারা পথসভা করে। গতকাল আদমজী মিল শ্রমিকরাও অন্যান্য দিনের মত কাজে যাওয়ার ও কাজ হইতে বাহিরে আসার সময় শেখ মুজিব ও অন্যান্য বন্দী নেতার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।
>
> **তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের প্রতিবাদ**
>
> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তেজগাঁও শিল্প এলাকার ৩০ সহস্রাধিক শ্রমিক গতকাল (বুধবার) প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। অপরাহ্নে নাবিস্কো ফ্যাক্টরীর নিকটে অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সমাবেশে তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেখ মুজিবসহ অপরাপর বন্দী নেতার মুক্তি দিতে হইবে। সভায় বক্তাগণ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি প্রয়োগের নিন্দা করেন।
>
> গতকল্য (বুধবার) গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সংবাদ ইত্তেফাক অফিসে আসিয়া পৌঁছে। আগামীকল্য (শুক্রবার) এই সমস্ত সভা ও বিক্ষোভের বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

১৯৬৬ সালের ৩ জুন রাজশাহী জেলার বাণিজ্য কেন্দ্র রোহনপুরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর আরোপিত সকল প্রকার হয়রানিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করার জোর দাবি জানান হয়। ১৯৬৬ সালের ৬ জুন এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রোহনপুরে বিরাট জনসভা ৬-দফার

বাস্তবায়নই দেশ ও জাতির কল্যাণ করিতে পারে'। রাজশাহীর রোহনপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

> সম্প্রতি রাজশাহী জেলার বাণিজ্য কেন্দ্র রোহনপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া বলা হয় যে, ৬-দফার বাস্তবায়নই দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ওসমান আলী খান বলেন যে, পাটের ন্যায্য মূল্য এবং বিশ্ব বাজারে পূর্ব পাকিস্তানী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একান্ত অপরিহার্য। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং শেখ মুজিবর রহমানের উপর আরোপিত সকল প্রকার হয়রানিমূলক ব্যবস্থা রহিত করার জোর দাবী জানান হয়। সভায় অনতিবিলম্বে লেভী প্রথার বিলোপ, খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং প্রদেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানান হয়।
>
> সভাপতির ভাষণে জনাব খান বলেন যে, লেভী, খাদ্যদ্রব্যে চোরাচালান, মজুতদারী ও অনাবৃষ্টির জন্যই খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন, খাদ্য সমস্যা সকল রাজনীতির উর্ধ্বে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য মহকুমা আওয়ামী লীগ প্রধান ক্রুগ মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবী জানান।
>
> তিনি আরো বলেন যে, সাম্প্রতিক উপনির্বাচন উপলক্ষে ভোটের জন্য সরকারী কর্মকর্তাগণ দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে পারিয়াছেন, অথচ জনগণের নিকট তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। তিনি বলেন যে, লেভীর মাধ্যমে সরকার কৃষকদের ধান সরকারী গুদামে জমা করিয়াছেন অথচ যাহাদের ঘরে খাবার নাই তাহাদের মধ্যে ধান-চাউল বিতরণের সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। তিনি অবিলম্বে ১০ টাকা মণ দরে লেভীর ধান গ্রামে বিতরণের জোর দাবী জানান।

১৯৬৬ সালের ৬ জুন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ছয়দফার দাবি পূরণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক বিরাট মশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। মিছিলে ছয়দফার সমর্থন এবং সরকারি নির্যাতন ও দমননীতি বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা ও বিভিন্ন স্থানে মশাল শোভাযাত্রা মিছিল ও পথ সভা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

আওয়ামী লীগ ও যুব কর্মীদের উদ্যোগে গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে এক বিরাট মশাল শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রীদের হাতে "সংগ্রামের প্রতীক" প্রায় পাঁচ শত মশাল ছিল।

মশাল শোভাযাত্রা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে আরম্ভ হয় এবং জিন্নাহ এভেনিউ, গুলিস্থান, নবাবপুর, ইসলামপুর, মোগলটুলী, চাকবাজার, জেলগেট ও নাজিমুদ্দিন রোড হইয়া শহীদ মিনারে আসিয়া শেষ হয়। শোভাযাত্রীরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ৬-দফার দাবী পূরণ, শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং সরকারী নির্যাতন ও দমননীতি বন্ধ করার দাবী জানাইয়া শ্লোগান প্রদান করে। শোভাযাত্রা চলাকালে লোকজন পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শোভাযাত্রা দেখে এবং তাহাদের সহিত সুর মিলাইয়া শ্লোগান প্রদান করে।

গোপীবাগ হইতে স্থানীয় যুব ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা অপর একটি শোভাযাত্রা বাহির করে। ৬-দফার সমর্থন ও শেখ মুজিবর রহমানসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে শ্লোগান দিতে দিতে শোভাযাত্রীরা টিকাটুলী, কমলাপুর, মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া, স্বামীবাগ প্রভৃতি এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

মতিঝিল হইতেও একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। তাহারা ফকিরাপুল, আরামবাগ, নটরডাম কলেজ ও মতিঝিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রীরা ৬-দফার সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে। ইহা ছাড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে খণ্ড খণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হয়। তাহারা শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও ৬-দফার সমর্থনে শ্লোগান প্রদান করে।

১৯৬৬ সালের ৬ জুন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, সভা ও শোভাযাত্রায় ছয়দফার সফল বাস্তবায়ন এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করা হয়। ৯ জুন এই সংক্রান্ত খবর দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিব ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই: বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, সভা- শোভাযাত্রা'। এই খবরে বলা হয়:

> ৬-দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার তথা প্রদেশব্যাপী ধরপাকড়ের প্রতিবাদে গত সোমবার নারায়ণগঞ্জের যুব-জনতা শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পথসভা ও বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সহকারে বন্দর-নগরী প্রদক্ষিণ করে।
>
> পথসভায় কর্মিগণ ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ঘোষণা করেন যে, যে-কোন নির্যাতনের মুখে দেশবাসী শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলার জন্য ৬-দফার সফল বাস্তবায়ন করিবে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করার নিন্দা করিয়া তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের বৈঠক

ইতিপূর্বে গত রবিবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় কর্তৃপক্ষের দমননীতির নিন্দা করিয়া অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানসহ দেশরক্ষা আইনে ধৃত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়। এই দিনও যুব-জনতা শহরে পথ-সভা অনুষ্ঠান ও মিছিল বাহির করে।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ হইতে জানান হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগ কর্মী অন্যান্য রাজনৈতিক ও যুবকর্মীরা শহরে যে সকল দেয়ালপত্র লাগাইয়াছেন, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল উহা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। যুবকর্মীরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোষ্টারসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় পথসভা করে।

সিরাজগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল মাইক্রোফোন আটক করা হইয়াছে এবং বুধবার পর্যন্ত মাইক ভাড়া না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করা হইয়াছে।

খুলনা

ইত্তেফাকের খুলনাস্থ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, গত সোমবার খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ কর্মী ও যুবকর্মীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে পথসভা করে। এই সকল পথ সভায় বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্পর্কে বক্তৃতা করিলে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উহার সমর্থন করে।

এই সকল পথসভায় সরকারী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

নেতৃবৃন্দের মুক্তিদাবী

সম্প্রতি বরিশাল জেলা বার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব এস, ডব্লিউ লকিতুল্লাহর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল নেতা ও কর্মীদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ কতিপয় দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৬ সালের ৯ জুন চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ বাজারে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল ইসলাম। নেতৃবৃন্দ ৬ দফা দাবি

আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১১ জুন ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'নেতৃবৃন্দের মুক্তিদাবী'। চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> মাইক ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি হাজিগঞ্জ বাজারে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল ইসলাম। সভায় বিস্তর জনসমাগম হয়।
>
> হাজিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রব বলেন যে, কোন শক্তিই ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম প্রতিহত বা বানচাল করিতে পারিবে না। জনাব রব বলেন, ৬ দফা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে আরও সমৃদ্ধিশালী এবং শক্তিশালী করা। জননেতা শেখ মজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতা এবং কর্মীর ব্যাপক গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া তিনি তাঁহাদের আশু মুক্তি দাবী করেন। অন্যান্য নেতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ৬-দফার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করিয়া তাহা আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।
>
> সভায় ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের নিন্দা ও আশু মুক্তির দাবী, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দানের দাবী জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।
>
> ইহা ছাড়া জনসাধারণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হাজিগঞ্জ, মতলবগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জসহ অত্র মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অন্যান্য দল ও নেতাদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদাবী

১৯৬৬ সালের ৯ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পর দিনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবি করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানো হয়। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতার করাকে চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার ওপর নয়া হামলা অভিহিত করে বলেন, যুদ্ধোত্তরকালেও দেশরক্ষা আইনবলে বিনাবিচারে নেতৃবৃন্দের এই আটক কেবল অসঙ্গতই নয়–নীতি বিগর্হিতও। নেজামে ইসলাম নেতা ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে সরকারের উদ্দেশে বলেন যে, নেতাদের জেলে পুরে আন্দোলন দমানো যায় না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের আটক করে রাখা শুধু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণই

নয়, স্বাধীনতার ওপরও প্রত্যক্ষ হামলা। ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বলেন, কেউ জনগণের অধিকার ও স্বার্থের কথা বললেই তার বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। 'ন্যাপ' নেতা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ সংবলিত ছয়দফা দাবি উত্থাপন করায় সরকারের রোষানলে পড়েছেন। তিনি দেশের গণতন্ত্রমনা প্রত্যেক নাগরিককে এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবর ১৯৬৬ সালের ১০ মে প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'অসঙ্গত ও নীতি বিগর্হিত-অযাচিত ও জবরদস্তিমূলক-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : নেতৃবৃন্দের আটকের প্রতিবাদে তুমুল ক্ষোভ : চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর নয়া হামলার তীব্র নিন্দা : অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এ খবরে লেখা হয়:

> শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আটকের সংবাদে রাজধানী ঢাকার সর্বমহলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়।
>
> **নূরুল আমীন**
>
> জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমীন, শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতাকে বিনাবিচারে দেশরক্ষা আইনে আটক রাখার ব্যবস্থাকে চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর নয়া হামলা বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, গণতন্ত্রমনা মানুষ মাত্রেই ইহাকে ধিক্কার দিবে। তিনি বলেন যে, সরকার উপর্যুপরি দেশবাসীকে এই আশ্বাসই দিয়াছেন যে, দেশরক্ষা আইন একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই অস্থায়ীভাবে এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। তাই, প্রয়োজনের বাহিরে বা যুদ্ধাবসানের পরও দেশরক্ষা আইনের এই প্রয়োগ বা ব্যবহার শুধু অসঙ্গতই নয় নীতি বিগর্হিতও বটে।
>
> **ফরিদ আহমদ**
>
> নেজামে ইসলাম নেতা জনাব ফরিদ আহমদ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা করিয়া তাহাদের আশু মুক্তি দাবী করেন। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরিয়া দিয়া আন্দোলন দমানো যায় না। দেশের আইন ভঙ্গ করিলে আদালতে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। বিশেষ ধরনের রাজনীতি করিতে গিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের আটক করিয়া রাখা শুধু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণই নয়, এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার উপরই একটা প্রত্যক্ষ হামলা।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ-এর সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গত রাত্রে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কেহ জনগণের অধিকার ও স্বার্থের কথা বলিলেই তাহার বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। 'ন্যাপ' নেতা আরও বলেন, শেখ মুজিবর রহমান ও তাহার দল পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ সম্বলিত ৬-দফা দাবী উত্থাপন করায় সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হন। দেশের গণতন্ত্রমনা প্রত্যেক নাগরিককে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতার এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগাইয়া আসার জন্য 'ন্যাপ' সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ১০মে খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, ছয়দফা মানুষের জীবন-মরণের দাবি। নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষের জীবন-মরণের দাবিকে নস্যাৎ করা যায় না। ক্ষমতায় আঁকড়াইয়া থাকার জন্য ক্ষমতাসীনরা যেখানেই জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি বলপ্রয়োগে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে, সেখানেই নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম অধিকতর জোরদার হয়ে উঠেছে। তিনি অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুসহ সব রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেন। ১৯৬৬ সালের ১১ মে এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে সকল মহলে প্রতিবাদের ঝড়'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ গতকাল সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অপর ৬ জন নেতার গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, ৬-দফা মানুষের জীবন-মরণের দাবী। নির্যাতন ও বিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মানুষের জীবন-মরণের দাবীকে নস্যাৎ করা যায় না। ক্ষমতায় আঁকড়াইয়া থাকার জন্য ক্ষমতাসীনরা যেখানেই জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি বল প্রয়োগের স্তব্ধ করার চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম অধিকতর জোরদার হইয়া উঠিয়াছে। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ঘোষণা করেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যে সার্বজনীন দাবী তোলার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আটক করা হইয়াছে এদেশের অগণিত মজলুম জনগণের পক্ষ হইতে আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই দাবী জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি।

পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামের পক্ষ থেকে ১৯৬৬ সালের ১২ মে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবি করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, দমননীতির দ্বারা কোন গণআন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা যায় না। এই সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে বিবৃতিতে বিশ্বজনীন পদ্ধতিতে ছয়দফা কর্মসূচির ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের সুযোগ দেয়ার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ মে ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল: 'জনমত যাচাইয়ের বিশ্বজনীন পদ্ধতি অনুসরণ করুন : নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রশ্নে সরকারের উদ্দেশে নেজাম নেতৃবৃন্দের বিবৃতি'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামের সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অস্থায়ী সম্পাদক গতকাল (বৃহস্পতিবার) দেশরক্ষা আইনে আটক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আশু মুক্তি দাবী করিয়াছেন। নেজামে ইসলাম নেতা মওলানা মোসলেহ উদ্দিন, মওলানা আশরাফ আলী এবং মওলানা আবদুল মতিন (বরিশালী) গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, দমননীতির দ্বারা কোন গণআন্দোলনকে দাবাইয়া রাখা যায় না। এই সত্যকে যত শীঘ্র উপলব্ধি করা যায় ততই মঙ্গল। জনগণের দরবারে নিজ দলীয় কর্মসূচী পেশ করার অধিকার সকল রাজনৈতিক দলেরই আছে। জনসাধারণকে নিজ নিজ কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকিফ করার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। জনমত যাচাইর মধ্যদিয়া কোন দলের কর্মসূচীর সারবত্তা বা অসারতা প্রমাণ করাই বিশ্বজনীন পদ্ধতি। বিভিন্ন আদালতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা বিচারাধীন থাকার পরও তাঁহাকে বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখার ব্যবস্থায় তাঁহারা তীব্র নিন্দা করেন।

১৯৬৬ সালের ১৩ মে ২৭ জন মৌলিক গণতন্ত্রী এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবি করেন। ১৯৬৬ সালের ১৫ মে দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: '২৭ জন মৌলিক গণতন্ত্রী কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী'। বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গত শুক্রবার বলা হয় যে, নারায়ণগঞ্জের ২৭ জন মৌলিক গণতন্ত্রী এক বিবৃতিতে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ

নেতার আশু মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। তাঁহারা অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে দুইজন চেয়ারম্যান আছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারিগণ হইতেছেন : মেসার্স এ কে এম শামসুজ্জামান, আফজাল হোসেন (চেয়ারম্যান), এ রব বেপারী, শেখ মীজানুর রহমান, আসগর হোসেন ভুঁইয়া (চেয়ারম্যান), গোকুল চন্দ্র পোদ্দার, এ ওয়াহাব, এ জব্বার, আবদুল মতিন, কে মনসুর আহমদ, আবুল হোসেন, হারুনুর রশিদ, আন্নর আলী, আকাউদ্দিন দেহলভী, মহিউদ্দিন আহমদ, শরিফ মুন্সী, আলী আহমদ, শামসুদ্দোহা, মাহতাবুদ্দিন, তারা মিয়া, গোলাম হোসেন ফারুক, মীর কফিলুদ্দিন, খোরশেদ আলম, আবদুল হামিদ মুন্সী, মোহাম্মদ আলী, আবদুল কাদির এবং আবদুর রহিম।

পশ্চিম পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদাবি:

১৯৬৬ সালের ১৭ মে লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় বিনাবিচারে বঙ্গবন্ধুকে আটক করায় নিন্দা প্রকাশ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদানের দাবি জানান হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৮ মে ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'লাহোর কাউন্সিল মুসলিম লীগ সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী'। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল লাহোর কাউন্সিল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব চৌধুরী এনায়েত উল্লা। কমিটির বৈঠকে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, শেখ মুজিবের আটক সকল প্রকার ন্যায়-নীতির পরিপন্থী। কাজেই ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিনাবিচারে শেখ মুজিবকে আটক করার নিন্দা করিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে দেশ হইতে জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার ও সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দানের দাবী জানান হয়।

১৯৬৬ সালের ১৭ মে করাচীতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, ছয়দফার পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থন দেখে সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে হীনপন্থা গ্রহণ করেছে। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়, বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য জননেতার বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ ওই আইনের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। ২১ মে এই খবর

দৈনিক ইত্তেফাকে ভেতরের পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থনে সরকারের আতঙ্ক : গণদাবী নস্যাৎ করার জন্য দেশরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগের নিন্দা : করাচী আওয়ামী লীগের সভায় নেতৃবৃন্দের আশুমুক্তি ও জরুরী অবস্থার অবসান দাবী'। করাচি থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল রাত আটটায় করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক সভা লীগের স্থানীয় অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব এস পি লোধী।
>
> সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনবলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, কার্যকরী সংসদের সদস্য জনাব মোশতাক আহমদ, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম এ আজীজ এবং রাজশাহী আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিবের উপর বিভিন্ন প্রকার হয়রানির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার দাবী করা হয়। সভায় এই মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, ৬-দফার পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থন দৃষ্টে সরকার আতংকগ্রস্ত হইয়া শেখ মুজিবের ন্যায় জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে হীনপন্থা গ্রহণ করিতেছেন। সভায় এইমর্মে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্য জননেতার বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ উক্ত আইনের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নহে এবং গণদাবী নস্যাৎ করার জন্য উক্ত আইন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইতেছে। সভায় অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, পূর্ণ শান্তি বিরাজ করা সত্ত্বেও দেশে জরুরী অবস্থা বহাল রাখার জন্য বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষই দায়ী।

সতেরো. বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ দিবস:

১৯৬৬ সালের ১৩ মে সামরিক সরকারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আহ্বানে সমগ্র প্রদেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুসহ কারাগারে বন্দী নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান। দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টা হতে বিরত থাকতে বলা হয়, তা না হলে অচিরেই প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৪ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার

শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাও- প্রতিবাদ দিবসে প্রদেশের দিকে দিকে বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জন অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিয়া রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যত্নবান হওয়ার আহ্বান'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> দেশের বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বজন-স্বীকৃত নিয়মতান্ত্রিক পদে পরিচালিত আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া কারাগারে আটক নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাও, অন্যথায়, এদেশের ভাগ্যবঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেরাই নিজেদের পদ বাছিয়া লইয়া এমন দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, সে আন্দোলনের মুখে শত বাধাও আর তিষ্ঠিতে পারিবে না।'
>
> গতকালকার (শুক্রবার) 'প্রতিবাদ দিবসে' পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় বক্তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত এই সতর্কবাণী পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশেও যেন ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হয়। মফস্বল এলাকা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায়, আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবিতে সর্বত্র এই একই আওয়াজ ক্রুদ্ধ আক্রোসে ফাটিয়া পড়িয়াছে। বিক্ষুব্ধ মিছিলের পদচারণায় আর অযুতকণ্ঠে উচ্চারিত 'মুক্তি চাই' ধ্বনিতে প্রতিটি মোকামই প্রকম্পিত হইয়াছে। আর ফেনিল আক্রোশের সে ক্রুদ্ধ গর্জনে কণ্ঠ মিলাইয়াছে এদেশের ভাগ্যহত দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী-সকল সম্প্রদায়ের মানুষ।
>
> ৬-দফার প্রবক্তা নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবিতে আগাইয়া আসিয়াছে, এদেশের হাজার হাজার শ্রমিক। পল্টন ময়দানের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া চটকল ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে : অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেওয়া না হইলে প্রদেশের কল-কারখানার চাকা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। ইহারই পাশাপাশি সভার উদ্যোক্তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ধাপে ধাপে কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া যাইবে। সুতরাং অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেওয়া না হইলে অচিরেই প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতালের কর্মসূচী ঘোষিত হইবে।
>
> ঢাকার পল্টন ময়দানের গতকালকার প্রতিবাদ সভা নানা দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। সভা শেষে সহস্র সহস্র জনতা বিক্ষোভ মিছিল করিয়া পল্টন ময়দান হইতে সদরঘাট ও চকবাজার হইয়া শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে গমন করে। আন্দোলনের মুখে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগারে পুরিয়া দেওয়ার রীতি প্রদেশের সনাতন রীতি। কিন্তু নেতৃবৃন্দকে আটকের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ যে কতখানি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়া

গিয়াছে গতকালকার পল্টনের বিপুল জনসমাবেশ। ব্যক্তিবিশেষের বক্তৃতা শোনার জন্য জনতা জনসভায় ভীড় করে বলিয়া যে বিশ্বাস অনেকের মনে চিরন্তন হইয়া দেখা দিয়াছিল, গতকালকার সভা জনসমাবেশে সে বিশ্বাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নেতার চেয়ে যে নীতি বড় এবং নেতার অবর্তমানে নীতিকে সমুন্নত রাখিয়া জনগণও যে বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া সঠিক পথে আগাইয়া চলিতে পারে, গতকালকার সভা তাহারই জলজ্যান্ত প্রমাণ বহন করে। শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ও আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অনুমোদিত ৬-দফা যে আজ ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের সম্পদ নয়, ৬-দফাকে এ প্রদেশের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ যে তাদের নিজেদের সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে গতকাল প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যদিয়া তাহাই প্রতিভাত হইয়াছে।

গতকালকার পল্টনের জনসভা পল্টনে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম জনসভা সমূহের অন্যতম। সভা যখন শেষ হইতে চলিয়াছে, তখনও দূর-দূরান্ত হইতে প্লাকার্ড-ফেষ্টুনসহ বিক্ষোভ মিছিল আসিয়া সভায় শরীক হইতে থাকে। আদমজী নগরের শিল্প এলাকায় গতকাল আর চাকা ঘুরে নাই। সহস্র সহস্র শ্রমিক তাহাদের কাজ কামাই করিয়া মিছিল করিয়া সুদীর্ঘ নয় মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া পল্টনের প্রতিবাদ সভায় আসিয়া নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি বুলন্দ করিয়া তুলে। গতকালের জনসভায় অনলবর্ষী বাগ্মীর অভাব ছিল; কিন্তু জনতার উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্যে সে অভাব তলাইয়া গিয়াছে। কে বক্তৃতা করিতেছেন, বক্তা নেতা কি কর্মী সেদিকে দৃষ্টিপাত করার কোন তাগিদই শ্রোতাদের ছিল না। জনসভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শ্রোতা প্রতিবাদমুখর। তাই সভা চলাকালীন মুহুর্মুহ অযুতকণ্ঠে উচ্চারিত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হইতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মমিন এ্যাডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান, শেখ ফজলুল হক (মনি), শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব এম এ রব এ্যাডভোকেট, শ্রমিক নেতা জনাব মকবুল হোসেন, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব জহিরুদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রহমান।

জনসভায় প্রস্তাব পাঠ করেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মতিউর রহমান এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন জনাব রফিকুল হোসেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত হস্তত্তোলনের মধ্যদিয়া প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১৯৬৬ সালের ১৩ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন ও অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সমগ্র প্রদেশের জনগণ এইদিন সভা ও শোভাযাত্রায় শরিক হয়ে শপথ ঘোষণা করে, সর্বজনস্বীকৃত ও অভিনন্দিত ছয়দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে কিছুতেই স্তব্ধ করা যাবে না। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে এ আন্দোলন চলতে থাকবে। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৫ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জেল-জুলুম ও ধরপাকড়ের সাহায্যে ৬-দফার নিয়মতান্ত্রিক আন্দেলন স্তব্ধ করা যাইবে না। প্রতিবাদ দিবসে সমগ্র প্রদেশবাসীর রায়'। এতে বলা হয়:

> ৬-দফার ভিত্তিতে আপামর দেশবাসীর প্রাণের দাবী-দাওয়া আদায়ের যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হইয়াছে, উহাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য জেল-জুলুম, গ্রেফতারী ও নির্যাতন-নিগ্রহের প্রতিবাদে গোটা প্রদেশ বিক্ষোভমুখর হইয়া উঠিয়াছে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতারের নিন্দা জ্ঞাপন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে মুক্তির দাবীতে গত শুক্রবার সমগ্র প্রদেশে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এইদিন ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশেও জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে আহূত অযুত কণ্ঠে অবিলম্বে ধৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়। দেশের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানব এইদিন সভা ও শোভাযাত্রায় শরীক হইয়া যে শপথ ঘোষণা করে তাহা হইল : "সর্বজন স্বীকৃত ও অভিনন্দিত ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে কিছুতেই স্তব্ধ করা যাইবে না। যে-কোন ত্যাগের বিনিময়েও বঞ্চিত দেশবাসীর এ আন্দোলন চলিতে থাকিবে। এ আন্দোলনের শেষ হইবে ৬-দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের পর।" জনসভায় সভাপতি জনাব মমিনুদ্দীন এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, জুলুম, অত্যাচার, ধরপাকড়, এমনকি গোলাগুলীও আমাদের ছয় দফা আদায়ের সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবেনা। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী নেতাদের গ্রেফতার করিয়া আমাদের সংগ্রামকে আরও জোরদার করা হইয়াছে এবং জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলা হইয়াছে, ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা, খুলনা-চট্টল-রাজশাহীর জনসভা উহার প্রকৃষ্ট নজির। উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার তুমুল করতালির মধ্যে তিনি জনগণকে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ১১ জুন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ১১ ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অন্যতম সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম। বৈঠকে ছয়দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদানের প্রথম পর্যায়ের আন্দালনে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে ছয়দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্দোলনে আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ জুন দেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১২ জুন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফার বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯ই জুন প্রদেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' উদযাপনের আহ্বান, ১৬ই আগষ্ট গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হওয়ার আগে যাবতীয় গণবিরোধী ব্যবস্থার অবসান দাবী'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দুইদিনের মোট ১১ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে দলের ৬ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্দোলনের অগ্রগতি পর্যালোচনার পর মোট ১৫ দফা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মারফত বিভিন্ন বিষয়ে দলের সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশের পাশাপাশি আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের কর্মসূচী নির্দেশ করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সকল সদস্য এবং জেলা আওয়ামী লীগ সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ ছাড়াও দলীয় পরিষদ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম। বৈঠকে ৬ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার বাস্তব রূপদানের প্রথম পর্যায়ের আন্দালনে আশানুরূপ সাড়া দৃষ্টে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর পূর্ণ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সাফল্য যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও আরও ত্যাগ স্বীকারের উপরই নির্ভরশীল, একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়া আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি সদস্যকে নির্ভীকচিত্তে ও আরও ঘনিষ্ঠভাবে ৬ দফা কর্মসূচীর প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আগামী ১৬ই আগষ্ট হইতে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। মোট ১৫ দফা প্রস্তাবের অন্যতম একটি প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটি আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দাবাইয়া দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্নমুখী জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুন সমগ্র প্রদেশব্যাপী 'জুলুম-প্রতিরোধ

দিবস' পালনের আহ্বান জানান হয়। ঘরে ঘরে কালোপতাকা উড়ডীন, অঙ্গে কালো ব্যাজ ধারণ এবং জনসভা ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মাধ্যমে এই 'দিবস' উদযাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি ইউনিটের প্রতি নির্দেশ দেন। ১৭ই জুন (শুক্রবার) 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসের' উদ্বোধনী দিনে জুম্মার জামাতে শহীদানের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাতের জন্যও কমিটির প্রস্তাবে প্রদেশব্যাপী জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি ৬ দফার সমর্থনে অবিলম্বে প্রদেশব্যাপী এক স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯শে জুন দেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংক্রান্ত খবর ১৯৬৬ সালের ১৩ জুন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: '১৭ই ১৮ই ও ১৯শে জুন 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস'। এতে বলা হয়:

জনগণের অধিকার আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দাবাইয়া দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্নমুখি জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুন সমগ্র প্রদেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

(গতকালকার ইত্তেফাকের এই সংক্রান্ত সংবাদের শিরোনামায় ভুলক্রমে ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই জুন 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল)

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, ঘরে ঘরে কাল পতাকা উত্তোলন, অঙ্গে কাল ব্যাজ ধারণ এবং জনসভা ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়া এই দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

ছয়দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ জুন দেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এক প্রেস রিলিজে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এ সংক্রান্ত খবর ১৪ জুন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচী'। বার্তা সংস্থা পিপিএ পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুন প্রদেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গতকাল (সোমবার) দলের এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যই এই 'দিবস' পালনের আয়োজন করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে অঙ্গে কালো ব্যাজ ধারণ, প্রদেশের আওয়ামী লীগ অফিসসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন, সভার অনুষ্ঠান এবং শান্তিপূর্ণ মিছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, আগামী ১৭ই জুন বাদ জুম্মা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া ফাতেহা পাঠ করা হইবে।

১৯৬৬ সালের ১৪ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ১৭, ১৮ এবং ১৯শে জুন 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস উপলক্ষ্যে সকল আওয়ামী লীগ অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ পরিধান এবং জনসভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য কর্মসূচী গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত খবর ১৫ জুন ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবসের কর্মসূচী। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গতকালের (মঙ্গলবার) এক প্রেস রিলিজে বলা হইয়াছে যে, আগামী ১৭ই, ১৮ই এবং ১৯ শে জুন 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস উপলক্ষে সকল আওয়ামী লীগ অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ পরিধান এবং জনসভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

প্রেস রিলিজে আরও বলা হইয়াছে যে, এই তিন দিনে হরতাল (ধর্মঘট) করার কোন প্রোগ্রাম নাই। এতদ্ব্যতীত প্রদেশের যে সব এলাকায় ১৪৪ ধারা বলবৎ আছে, সেই সব স্থানে সভা ও শোভাযাত্রার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯৬৬ সালের ১৫ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ জুন দেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত খবর ১৬ জুন ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: আগামীকাল হইতে 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল (শুক্রবার), আগামী শনিবার এবং আগামী রবিবার সমগ্র

প্রদেশে 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। এই দিবস পালনকল্পে সকল আওয়ামী লীগ অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন, শুক্রবার মসজিদে মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা, কালো ব্যাজ পরিধান এবং জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

১৯৬৬ সালের ১৫ জুন ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কর্মীদের এক সভায় আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ জুনের জুলুম প্রতিরোধ দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের জন্য শহরের সকল নেতা-কর্মীকে আহ্বান জানানো হয়। এ সংক্রান্ত খবর ১৬ জুন ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কর্মীসভা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

গতকাল (বুধবার) ১৫, পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কর্মীদের এক সভায় আগামীকাল (শুক্রবার) আগামী শনিবার ও আগামী রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আহূত 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শান্তিপূর্ণভাবে পালনের জন্য ঢাকা শহরের সকল আওয়ামী লীগ ইউনিট, সকল কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া সমসাময়িক প্রশ্নে সভায় কমিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৬৬ সালের ১৫ জুন 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসকে' সফল করার জন্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অফিসে জেলা ও শহর আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত খবর ১৬ জুন ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'অদ্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীসভা'। ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হতে প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বানক্রমে "জুলুম প্রতিরোধ দিবসকে" সফল করার উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আগামীকাল বিকাল সাড়ে ৪টায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অন্দরকিল্লাস্থ অফিসে জেলা ও শহর আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

আঠারো. বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে হরতাল:

১৯৬৬ সালের ২০ মে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য আপোসহীন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ছয়দফা দাবি আদায় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল নেতার মুক্তি ও অন্যান্য দাবিতে ৭ জুন হরতাল পালন করা হবে। এ

সংক্রান্ত একটি খবর ২২ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তিসহ কতিপয় সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে ৭ই জুন হরতাল আহ্বান, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত'। স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনারত নেতৃবৃন্দকে দেশরক্ষা বিধিবলে কারাগারে আটক করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য আহূত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গতকাল (শুক্রবার) দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর ৬-দফার সমর্থনে ও কতিপয় সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত করে এবং এই হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য আওয়ামী লীগের শাখা কমিটিসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়।

১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতালকে সফল করার জন্য এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু হয়। ১৯৬৬ সালের ২০ মে ছয়দফার প্রণেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সভায় হরতাল পালনের আহ্বান ছাড়াও নেতৃবৃন্দের আটকসহ সরকারের দমননীতির তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২২ মে ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬ দফার প্রণেতার মুক্তি ও জরুরী অবস্থা অবসানের দাবীতে বিভিন্ন স্থানে সভা ও মিছিল। লালমনিরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমগ্র লালমনিরহাটে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ঝড় বহিতেছে। এক সপ্তাহ ধরিয়া এখানে বিরোধী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করিয়া বিভিন্ন সভার প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে এবং তাহাদের আশু মুক্তি দাবী করা হইতেছে। প্রায় দিনই বিকাল ৫ টায় স্থানীয় মডেল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইতেছে। এই সভাগুলিতে হাজার হাজার লোক প্রিয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রায় প্রত্যেক দিনই লালমনিরহাটে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিতেছে। বিক্ষোভকারী জনতা "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ", "রাজবন্দীদের মুক্তি চাই", "অত্যাচার ও নির্যাতন দ্বারা মানুষের বাঁচার দাবী রোখা যায় না", "৬-দফা জিন্দাবাদ", "দেশ প্রেমিকদের স্তব্ধ করার পন্থা টিকবে না" প্রভৃতি ধ্বনি প্রদান করে।

আওয়ামী লীগের পক্ষে আহূত প্রদেশব্যাপী ৭ জুনের হরতাল কর্মসূচিকে সফল করতে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২৯ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৭ই জুনের হরতালের সমর্থনে গণতান্ত্রিক শিবিরে অভূতপূর্ব সাড়া'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরটিতে বলা হয়:

> দেশ ও দশের স্বার্থে 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' পরিবর্তে 'শক্তিশালী পাকিস্তান' গঠনের কর্মসূচী ৬-দফার প্রবক্তাদের দেশরক্ষা আইনে আটকের প্রতিবাদে এবং দেশের বুক হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক কারণে নির্যাতন বন্ধ, রাজবন্দীদের মুক্তি, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস, কর্মচ্যুত বিড়ি শ্রমিক ও বেকারদের কর্মসংস্থান, কৃষক-শ্রমিক নির্বিশেষে সকল মানুষের সত্যিকার মুক্তিসাধন, সংবাদপত্রের ও বাক-স্বাধীনতা কায়েম প্রভৃতির দাবীতে আওয়ামী লীগ আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী যে সাধারণ হরতাল পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রদেশের গণতান্ত্রিক শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভূতপূর্ভ সাড়া জাগিয়াছে।

১৯৬৬ সালের ২৯ মে আওয়ামী লীগের পক্ষে আহূত প্রদেশব্যাপী ৭ জুনের হরতালকে সফল করে তোলার জন্য ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় ৭ জুনের হরতালকে সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। সভায় উপস্থিত জনতা হরতালকে সফল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৩০ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৭ই জুনের হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপক প্রস্তুতি'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> আগামী ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্নস্থানে বিপুল কর্মপ্রস্তুতি শুরু হইয়াছে। এই হরতালকে বানচাল করার জন্য মহল বিশেষ যে-কারসাজির আশ্রয় লইয়াছে, সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলার জন্য ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জনসভার অনুষ্ঠান করা হইতেছে। এই সব সভায় বক্তারা জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, আগামী ৭ই জুনের হরতাল দল বিশেষের নয়। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আটক রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদির দাবীতে এই হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে। তাই এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া অগণতান্ত্রিক শক্তিকে বুঝাইয়া দিতে

> হইবে যে, দেশবাসী শত নিপীড়ন সত্ত্বেও অধিকার সচেতনতা আজও হারাইয়া ফেলে নাই এবং শত বাধা-বিপত্তিকে জয় করিয়া তাহারা নিজেদের অধিকার অর্জন করিতে বদ্ধপরিকর।
>
> গতকাল (রবিবার) মালীবাগ চৌরাস্তার মোড়ে রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় আগামী ৭ই জুনের হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সভায় উপস্থিত জনতা দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করে। খিলগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সিদ্দিকুর রহমান হাজরা এডভোকেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে সরকার যেসব অনাহূত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছেন তাহার তীব্র নিন্দা করেন। গণতান্ত্রিক শিবিরের কর্মীদের উপর যেসব নির্যাতন চলিতেছে, অবিলম্বে তাহা বন্ধ করার জন্য তিনি দাবী জানান।

জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক বৈঠকে ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতাল দিবসকে সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হয়। এ সংক্রান্ত একটি খবর ৩১ মে ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল:'৭ই জুনের ডাক'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক বৈঠকে আগামী ৭ই জুনের সাধারণ হরতাল দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হয়।
>
> এ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে বলা হইয়াছে যে, গত ২৭ শে মে বিকাল সাড়ে ৫টায় 'পিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের ডেপুটি লীডার ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা জনাব শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত ৭ই জুনের সাধারণ হরতাল দিবসের প্রতি সকল মহলের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এই শান্তিপূর্ণ সাধারণ হরতালের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া এই দিবসকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন হরতালের যাবতীয় প্রচারকার্য বন্ধ করার জন্য ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই আদেশ ৭ জুন বেলা ১১টা পর্যন্ত বলবৎ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত

খবর ৮ জুন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা নগরী ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (মঙ্গলবার) পূর্বাহ্ন ১১ টার সময় হইতে ঢাকার কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁ থানার সকল এলাকা এবং নারায়ণগঞ্জ থানার সকল এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করিয়া পাঁচ বা ততোধিক লোকের একত্র সমাবেশ, কোন শোভাযাত্রা, সভা অনুষ্ঠান, অস্ত্রশস্ত্র, লাঠি, ফ্ল্যাগপোষ্ট বা কোন বিস্ফোরক অথবা আপত্তিকর কোন অস্ত্র এবং পোষ্টার ও প্লাকার্ড বহন, মাইক, এ্যাম্প্লিফায়ার বা লাউড স্পীকার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক নির্দেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশ ৭ই জুন বেলা ১১টা হইতে বলবৎ করা হইয়াছে।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আহূত সাধারণ হরতাল পালিত হয়। হরতাল সফল করার জন্য আগের দিন অর্থাৎ ৬ জুন গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তৎপর থাকে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে মাইকিং এবং প্রচারপত্র বিলি করে হরতাল পালন না করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বন্দরে সশস্ত্র পুলিশ টহল দেয়। এ সময় হরতাল প্রচারকার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। পরদিন ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। এ সময় পুলিশ ও ইপিআর তেজগাঁও, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে ১০ জন নিহত হয়। এ সংক্রান্ত খবর ৯ জুন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে পুলিসের গুলীতে ১০ জন নিহত'। সরকারী প্রেসনোট থেকে প্রাপ্ত এই খবরে বলা হয়:

> আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনে ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও ও গুণ্ডাদের লেলাইয়া দেওয়া হয়। ইপিআর টি সি বাসগুলিতে ইট পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যানবাহনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিসযাত্রীদের অপমান ও হয়রানি করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিস কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুণ্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

তেজগাঁওয়ে ২-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেল ষ্টেশনের আউটার সিগনালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিস দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে বহু পুলিস কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিস জনতার কবলে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা গুলীবর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পূর্বাহ্নে ১০ ঘটিকায় প্রায় ৩০০ উচ্ছৃংখল জনতা কর্তৃক তেজগাঁওস্থ ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সার্ভে ডিরেক্টরে অফিস আক্রান্ত হয়। জনতা তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে অফিসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

জনতা অতঃপর সেটেলমেন্ট প্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্টিং মেশিন সমূহের দারুণ ক্ষতি সাধন করে। আক্রমণের সময় প্রেসের তিনজন কর্মচারী আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জে এক উচ্ছৃংখল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতি সাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়।

যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিস দল আক্রান্ত এবং বহু সংখ্যক পুলিস কর্মচারী আহত হয়। পুলিস দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতি সাধন এবং বন্দকের গুলীতে পুলিস অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃংখল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিস আত্মরক্ষার্থে গুলী বর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫ জন পুলিস আহত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব এম, এ জাহেরের মোটর গাড়ী ভস্মীভূত ও তাহার বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও চাষারার মধ্যে রেলওয়ে সিগন্যালিং লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বাহির করে। কাওরান বাজারের উচ্ছৃঙ্খল জনতা একজন সার্জেন্টকে প্রহার ও তাঁহার স্কুটারের ক্ষতি সাধন করে এবং রেলওয়ে ক্রসিং এর নিকট একটি মালবাহী ট্রেন থামাইয়া দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর ছাত্ররা পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা হলও বাহিরের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিস ও ই পি আর দ্রুত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ই পি আর বাহিনীর একটি দল শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেণ্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীন এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখী ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও ষ্টেশনে আটক করা হয়। যাহা হউক, ট্রেন যোগাযোগ অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় চালু করা হয়।

সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছৃংখল জনতা কালেক্টরেট ও পরে ষ্টেট ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে। রক্ষিগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলীবর্ষণ করে। বেলা ১১টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।

১৯৬৬ সালের ৮ জুন এক সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় ৭ জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ ছিল। এ সংক্রান্ত খবর ৯ জুন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'সরকারী প্রেস নোট বলে: গতকাল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ শান্ত ছিল হাসপাতালে আর এক ব্যক্তির মৃত্যু'। এতে বলা হয়:

গতকাল (বুধবার) এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হয় যে, বুধবারে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। কোন এলাকায় উত্তেজনা ছিল না এবং অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা বা শান্তিভঙ্গের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সকল দোকান-পাট খোলা ছিল এবং যানবাহন স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করে।

গতকাল নারায়ণগঞ্জে গুলী বর্ষণে আহত এক ব্যক্তি আজ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। প্রদেশের অবশিষ্ট এলাকার পরিস্থিতিও স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ।

উনিশ. সারা দেশে ছয়দফার সমর্থনে আওয়ামী লীগের জনসভা অব্যাহত

১৯৬৬ সালের ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ছয়দফা আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালায় পাকিস্তান সরকার। কিন্তু আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে এ আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায়। ছয়দফা বাস্তবায়ন দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৯৬৬ সালের ১ মে ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বরিশাল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা

পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হোন, বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় নেতৃবৃন্দের আহ্বান'। এতে বলা হয়:

পটুয়াখালী মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার সমর্থনে স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অপরাহ্ন ৪টায় শুরু হইয়া রাত্র সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মালেক। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। এই বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদান করেন জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আজাহার উদ্দীন আহমদ এমপিএ জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নূরুল ইলাম (মঞ্জুর) ও পটুয়াখালী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আব্দুল আজিজ খোন্দকার। জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ আজহার উদ্দীন বলেন যে, বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে জনসাধারণের বক্তব্যের কোনই মূল্য নাই, এমন কি সরকার ও মন্ত্রীদেরও একই অবস্থা। মন্ত্রীদের জনসাধারণের মতামতের প্রতি কোন দায়িত্ব নাই। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে সরকার অদ্যাবধি কোন স্থায়ী বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ৬-দফার বাস্তবায়নে তিনি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নিহিত রয়েছে। ৬-দফা পাকিস্তানের ম্যাগনাকার্টা স্বরূপ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, যত শক্তিশালী হউক না কেন সরকারই জনসাধারণের দাবী দাবাইয়া রাখিতে পারে না। ৬-দফার দাবী বাস্তবায়নে তিনি জাতীয় নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার দাবিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ছয়দফা কর্মসূচিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বাঁচা মরার দাবি বলেও মন্তব্য করা হয় ও ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৬ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৬-দফার সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে জনসভা' জনগণের বাঁচা-মরার দাবী বাস্তবায়নের সঙ্কল্প'। নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

৬-দফা বাস্তবায়নের দাবীতে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সভায় ৬-দফা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা-মরার দাবী বলিয়া মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি স্থানীয় টাউন ফুটবল মাঠে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবুল হাশেম মোক্তার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব সা'দ আহমদ এডভোকেট উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবীর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। জনাব সা'দ আহমদ বলেন, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়াছি। ইহাতে কাহারো আৎকাইয়া উঠার কিছু নাই। জনাব সা'দ আহমদ বলেন, শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ার জন্যই আমরা স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইতেছি। পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থা বিচার করিলে ভিন্ন কোন পথ নাই।

বগুড়ার জামগ্রাম হাট প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৬-দফার দাবীতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব বি, এম, ইলিয়াস বলেন, আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। শেখ মুজিবর রহমানকে জেলে পুরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী নস্যাৎ করা যাইবে না। অতঃপর তিনি ৬-দফা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, কে মুজিবর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ গদি চায়না– আওয়ামী লীগ আপামর জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ঘরে বসিয়া রাজনীতি করে না। তিনি ৬-দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ৪ মে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যশোর নওয়াপাড়ায় ৬ দফার সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় নেতৃবৃন্দ ছয়দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবি বলে অভিহিত করেন। জনসভায় ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুখী, শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং ছয়দফার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান হয়। এ সংক্রান্ত একটি খবর ৭ মে ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'নওয়াপাড়ায় ৬-দফার সমর্থনে জনসভা'। যশোরের নওয়াপাড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গত বুধবার এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মশিহুর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কৃষক, মজুর,

> মধ্যবিত্ত তথা পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের বাঁচার দাবী। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রদেশের প্রত্যন্ত কোণ পর্যন্ত ৬-দফার যে দাবী অনুরণিত হইতেছে তাহা সময়সাপেক্ষ হইলেও বাস্তবায়িত হইবেই।
>
> অত্র জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রওশন আলী ৬-দফার বিশদ বর্ণনা করিয়া ঘরে ঘরে ছয়-দফার বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ৬ মে নাটোরের চলনবিলে এক কৃষক সমাবেশে ছয়দফা দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে হয়রানি বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। এ সংক্রান্ত খবর ৮ মে দৈনিক ইত্তেফাকের ভেতরের পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'নাটোরে কৃষক সমাবেশে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন।' নাটোর থেকে প্রাপ্ত এই খবরটিতে বলা হয়:

> অদ্য এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে সিংড়া নামক স্থানে চলনবিল এলাকার এক বিরাট কৃষক সমাবেশে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক এর বিরুদ্ধে মামলা

ইত্তেফাকসহ ৪টি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আনীত মামলার রায় প্রদান করেন প্রেস কোর্ট অব অনারের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আমিরউদ্দীন আহমদ। এ সংক্রান্ত খবর ১৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'চারটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলায় প্রেস কোর্ট অব অনারের রায়'। বার্তা সংস্থা এপিপি এর বরাত দিয়ে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (বুধবার) প্রেস কোর্ট অব অনারের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আমিরউদ্দীন আহমদ স্থানীয় ৪টি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আনীত মামলার রায় প্রদান করেন। গত ২১ শে ও ২৩ শে মে ঢাকায় সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। রায়ের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।
>
> (সম্প্রতি) পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রেস কোর্ট অব অনারের নিকট ঢাকা হইতে প্রকাশিত ৪ খানি বাংলা দৈনিক যথা (১) আজাদ, (২) আওয়াজ, (৩) সংবাদ এবং (৪) ইত্তেফাক-এর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের নীতিমালা ভংগের অভিযোগ দায়ের করেন।
>
> প্রেস কোর্ট (আদালত) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির নিকট যথাযথ নোটিস প্রদান করেন এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক এই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে ইহার নিম্নরূপ মতামত ব্যক্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন:

১। দৈনিক আজাদ: এই পত্রিকাখানির বিরুদ্ধে ইহার ১৮ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৬৬) শহর সংস্করণে প্রকাশিত "শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ডঃ মাহমুদকে প্রহারকারী ছাত্ররা সম্ভবতঃ লাটভবনে আশ্রয় লইয়াছে" শীর্ষক সংবাদের ব্যাপারে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, এই সংবাদটি মিথ্যা। এ-ধরনের সংবাদ প্রকাশ করিয়া পত্রিকাখানি জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এবং বিরোধীয় বিষয়ের সঙ্গে প্রশাসন যন্ত্রকে জড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে। পত্রিকাখানি এই কার্যের মাধ্যমে সংবাদপত্র নীতিমালা সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে ইহার ২ (ঘ) ও ৩ অনুচ্ছেদের বিধান লংঘন করিয়াছে। তাই সংবাদটি মানহানিকর এবং মিথ্যা অভিযোগপূর্ণ। এ-ধরনের সংবাদ প্রকাশনা সংগতও নহে ও বস্তুনিষ্ঠও নহে। সংবাদপত্র নীতিমালায় ২ (ঘ) অনুচ্ছেদে সংবাদপত্রসমূহের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মানহানিকর বা মিথ্যা অভিযোগ প্রকাশে বিরত থাকার এবং ৩ অনুচ্ছেদে উহাদিগকে ন্যায় ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য ঘটনা পরিহার না করার আহ্বান জানানো হইয়াছে।

বিবাদী পত্রিকাখানি এই অভিযোগের কৈফিয়ত দিতে গিয়া বলেন যে, "লাট ভবন" কে "গভর্নস হাউজে", ভাষান্তরিত করা ঠিক হয় নাই। ইহার নির্ভুল অনুবাদ শব্দটি হইবে "গভর্নমেন্ট হাউজ", "গভনর্স হাউজ" নহে এবং পত্রিকাখানি শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। সংবাদটির পরিবেশনা ন্যায়নিষ্ঠ ও বস্তনিষ্ঠ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করা হয় নাই। কোন ঘটনাপ্রবাহ ও পরিস্থিতির পটভূমিতে এই বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছিল, কৈফিয়তে উহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা হয় যে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) ঢাকা হাই কোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান ডঃ মাহমুদ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরও ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত আদালত অপমান সংক্রান্ত মামলার রায় প্রদান করেন। রায় ঘোষণার পর ডঃ মাহমুদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগণে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। তিনি সংগে সংগেই প্রহারকারীদের নামধামসহ থানায় এজাহার দেন। কিন্তু হামলাকারীদের পরিচয় ও ঠিকানা সংগে সংগেই দেওয়া সত্ত্বেও কয়েক দিনের মধ্যেও কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় না। ফলে জনমনে হতাশা- নৈরাশ্য দেখা দেয়। আর এই নিষ্ক্রিয়তার দরুন নানা ধরনের গুজবও রটিয়া যায়। অত:পর যে "গভর্নমেন্ট হাউজ" প্রতিশব্দের ব্যাপারে বিবাদী আপত্তি করিয়াছেন উহার অনুবাদকে সমর্থন করিয়া কৈফিয়তে আরও বলা হয় যে, একটি বিরাট এলাকার উপর গভর্নমেন্ট হাউজটি প্রতিষ্ঠিত। ইহার একাধিক প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। সম্প্রতি ইহার কিছু সংখ্যক অধিবাসীর সুবিধার্থে ইহার উত্তর-পশ্চিম

কোণে আর একটি অতিরিক্ত প্রবেশপথ খোলা হইয়াছে। সুতরাং এই বিরাট এলাকারই কোন এক অজ্ঞাত ও অজানা স্থানে প্রহারকারীদের আশ্রয় লইয়া থাকিতে পারে বলিয়া সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৈফিয়তের উপসংহারে বলা হয় যে, দৈনিক আজাদ কোন প্রকার মতলব বা দুরভিসন্ধি লইয়া এই সংবাদ পরিবেশন করে নাই। সংবাদটি সরল বিশ্বাসে এবং একটি স্বাধীন দেশের সংবাদপত্রের স্বাভাবিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই পরিবেশন করা হইয়াছে। কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ বা প্রশাসন যন্ত্রের সুনাম ক্ষুণ্ন করা বা কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার খারাপ ধারণা সৃষ্টির ইচ্ছা লইয়া ইহা করা হয় নাই। তবে সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশনার দ্বারা যদি কাহারও সুনামহানি বা অমর্যাদা করা হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে সে-জন্য আজাদ পত্রিকা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

আদালত বলেন: এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, "লাট ভবনের" আক্ষরিক অনুবাদ "গভর্নস হাউস" হইবে। রাজ ভবনের প্রতিশব্দ যেমন, "গভর্নমেন্ট হাউজ।" অবশ্য সাধারণ আলাপ-আলোচনায় লাট ভবনকে গভর্নমেন্ট হাউজও বলা হয়। শেখ মুজিবর রহমান, ছাত্ররা কোন একটি বিশেষ স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকিতে পারে, এই মর্মে যে-বিবৃতি দিয়াছেন উহাকে নিছক আনুমানিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তদুপরি পুলিস গত কয়েক দিনের মধ্যে কাহাকেও গ্রেফতার করে নাই, এক মাত্র এই তথ্য উল্লেখ করা ছাড়া এমন আর কোন তথ্য দেওয়া হয় নাই–যাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দুষ্কৃতিকারীরা কোন একটি বিশেষ স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং বিবৃতিটি বস্তুনিষ্ঠও নহে।

অভিযোগ অনুযায়ী আপত্তিকর শব্দটির অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকায় বিবাদী পক্ষ প্রদত্ত কৈফিয়তের শেষভাগে আদালতের নিকট দ্ব্যর্থহীনভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আদালত যেহেতু মনে করেন যে, বিবাদী কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ বা কাহারও সুনাম ক্ষুণ্ন করার মতলব না লইয়া সরল বিশ্বাসে সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন, সে-জন্য আদালত বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খারিজ করিয়া দিতেছেন।

২। আওয়াজ : এই পত্রিকার বিরুদ্ধে "পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার তদন্তের জন্য জাতিসংঘ কমিশন গঠনের দাবী : চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের ঘোষণা "এইরূপ পূর্ণ পৃষ্ঠা শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের ব্যাপারে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

সংবাদে বলা হয় যে, স্পীকার আরও বলেন যে, দুই, অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং যেহেতু সরকারী বা বেসরকারী তদন্ত কমিশনের উপর (সরকার কর্তৃক গঠিত) কেহই নির্ভর করিতে পারে না সেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ও পূর্ব

পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচারের বিষয় তদন্ত করার জন্য জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ সমবায়ে তদন্ত কমিশন গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদে আরও বলা হয় যে, স্পীকার সরকারকে জাতিসংঘ তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।

অভিযোগে বলা হয় যে, এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রের নীতিমালার ১০ ধারা লংঘন করা হইয়াছে।

বিবাদী পত্রিকার পক্ষ হইতে প্রদত্ত ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, এই সংবাদ প্রকাশ পর্যন্ত তাহারা সংবাদপত্রের নীতিমালার স্বাক্ষরকারী ছিলেন না এবং তাহারা নীতিমালার ধারা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না।

তাঁহারা আরও বলেন যে, ইহা কোন প্রকার মন্তব্য বিবর্জিত একটি সাধারণ সংবাদ মাত্র। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতির সংহতিকে ক্ষুণ্ন করার কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ইহাতে ছিল না।

বিবাদী পত্রিকার পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, এখন তাহারাও নীতিমালায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাহারা নীতিমালা মানিয়া চলারও প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখযোগ্য যে, নীতিমালার ১০-ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, এমন সংবাদ প্রকাশ হইতে বিরত থাকার বিধান রহিয়াছে।

আদালত বলেন যে, এই প্রসঙ্গে প্রবণতাই বড় কথা। উদ্দেশ্য ইহার সঙ্গে ততটা প্রাসঙ্গিক নহে। আদালত বলেন যে, সংশ্লিষ্ট সংবাদে উক্ত ধারা লংঘনের প্রবণতা রহিয়াছে। আদালত উক্ত পত্রিকাকে ভবিষ্যতে আরও সতর্কতা অবলম্বনের হুঁশিয়ারি দান করেন।

৩। সংবাদ: "চট্টগ্রামের ১৮ জন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর বিবৃতি বিভেদপন্থীদের চক্রান্তই সংগঠনের ঐক্য বিনষ্টের কারণ" এই শিরোনামায় গত ৩০শে মার্চ প্রকাশিত সংবাদটির ব্যাপারে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

অভিযোগে সংবাদটির শেষ দুই অনুচ্ছেদে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদ দুইটিতে একই সংগঠনের একটি গ্রুপ কতিপয় ঘটনার ব্যাপারে অপর গ্রুপকে সমালোচনা করিয়া ছাত্র সমাজের প্রতি নিরন্ন, বিবস্ত্র ও নির্যাতিত কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে ডিক্টেটরের শৃংখল হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করার এবং সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হইতে দেশকে রক্ষা করার আহ্বান জানান।

অভিযোগে আরও বলা হয় যে, দীর্ঘ বিবৃতিতে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কথাই বলা হয় নাই। অভিযোগে বলা হয় যে, ইহাতে সংবাদপত্রের নীতিমালার ১৫(খ) ধারা লংঘন করা হইয়াছে। এই ধারা মোতাবেক যে সমস্ত সংবাদ শিক্ষা বহির্ভূত ব্যাপারে ছাত্রদের উত্তেজনামূলক কার্যকলাপে উৎসাহিত করিতে পারে উহার প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

এই প্রশ্নে ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বিবাদী সংবাদপত্রটির পক্ষ হইতে বলা হয় যে, পত্রিকার একটি অনুল্লেখযোগ্য স্থানে প্রকাশিত উক্ত সংবাদে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অনৈক্যের নিন্দা করা হইয়াছে এবং ছাত্রদের ২২-দফা শিক্ষাদাবী আদায় ও দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করার জন্য অত্যাবশ্যক ঐক্যের আহ্বান জানান হইয়াছে। সুতরাং বিবাদীপক্ষ নীতিমালার ১৫(ঘ) ধারা লংঘনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। আদালত সমগ্র বিবৃতিটি পড়েন। ইহাতে সর্বত্র ছাত্র ইউনিয়নের দুরবস্থার বর্ণনা অনৈক্যের নিন্দা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কোন দেশ বা জাতির নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণ অর্থে কোন স্থানে "গণতন্ত্র" বা "সাম্রাজ্যবাদী" শব্দ ব্যবহার করিলে উহাকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলা যাইবে না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সংবাদটি নীতিমালার ১৫(ঘ) ধারার আওতায় পড়ে না। অতএব আদালত অভিযোগ বাতিল করিয়া দেন।

৪। ইত্তেফাক: আদালত গত ২৩ শে মে'র বৈঠকে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করেন এবং প্রিলিমিনারী পয়েন্টে অভিযোগ নাকচ করিয়া দেন। ইতিমধ্যেই ইহার ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেও ছয়দফা আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

বন্ধ হয়ে গেলো ইত্তেফাক

ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়ার কারণে আইয়ুব সরকারের রোষানলে পড়ে দৈনিক ইত্তেফাক। যে কারণে ইত্তেফাক বন্ধ হয়ে যায় এবং মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনার ধারাবাহিকতা খুঁজতে গেলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। এ সময় পুলিশ ও ইপিআর এর গুলিতে তেজগাঁও, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে ১০ জন নিহত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবর ৮ জুন ছাপানো যায়নি। ৯ জুন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে এই খবর ছাপা হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত'। সে কারণে ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করে সরকার। আর সেই সঙ্গে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। শুধু তাই নয়, ইত্তেফাকের নিউ নেশন প্রেসও বাজেয়াপ্ত করে দেয়া হয়। এ সময় ১৯৬৬ সালের ১২ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত ঢাকার ৩২ নম্বর শরৎগুপ্ত রোডের অনুপম প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাক। পরে সরকারি নির্দেশে এই প্রেস থেকেও ইত্তেফাক ছাপানো বন্ধ হয়ে যায়।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার গ্রেপ্তার হওয়ার খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশ করতে পারেনি। কারণ ১৭ জুন থেকে ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই খবর অন্যান্য দৈনিকে প্রকাশিত হয়। এই খবর ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন গ্রেপ্তার।' সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রত্যুষে ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনকে পুলিশ পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৩২ (১) খ ধারা বলে গ্রেফতার করিয়াছে।
>
> জনাব হোসেন ইতিপূর্বে দুইবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, জনাব হোসেন আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার সভাপতি এবং প্রেস কোর্ট অব অনারের সেক্রেটারী।

রাজনৈতিক নির্যাতনের উদ্দেশ্যে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২ নং ধারার ১ উপধারায় (বি) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নামে হাইকোর্টে রিট করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৫ জুলাই ঢাকা হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার হেবিয়াস কর্পাস রিটের আবেদনের শুনানি শুরু হয়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন ড. কামাল হোসেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ফকির শাহাবুদ্দিন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, জনাব ফরিদ উদ্দীন আহমদ ও জনাব কে এস নবী। এ সংক্রান্ত খবর ১৬ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক নির্যাতনের পন্থা হিসাবেই জনাব তফাজ্জল হোসেনকে আটক করা হইয়াছে; হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী শুরু।' ইত্তেফাকের বিশেষ রিপোর্টার প্রদত্ত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (শুক্রবার) ঢাকা হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চে ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী শুরু হয়। বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম আর খান, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দিন, বিচারপতি জনাব সায়েম ও বিচারপতি জনাব আব্দুল্লার সমবায়ে উক্ত বিশেষ বেঞ্চটি গঠিত হইয়াছে।
>
> উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ১৬ই জুন ভোর রাত ৪টার সময় জনাব তফাজ্জল হোসেনকে তাঁহার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন হইতে

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২নং ধারার ১ উপধারার (বি) ক্লজ মোতাবেক গ্রেফতার করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়।

জনাব তফাজ্জল হোসেন আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিটিউটের পাকিস্তান শাখার চেয়ারম্যান এবং 'প্রেসকোর্ট অব অনার'-এর সেক্রেটারী।

গতকাল আবেদনকারীর পক্ষে প্রধান কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেন সওয়াল জবাবকালে প্রতিরক্ষা বিধির সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন যে, প্রতিরক্ষা বিধি অনুযায়ী কাহাকেও আটক করিতে হইলে উহা একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের সন্তুষ্ট সাপেক্ষ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উপরোক্ত আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর উক্ত ক্ষমতা অন্য কোন স্তরে হস্তান্তর করা আইনের দৃষ্টিতে মন্দ।

তিনি শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা অবৈধভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক জনাব তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতারের আদেশ ও তাহাকে আটক রাখা অবৈধ হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ডেপুটি কমিশনারের 'ব্যক্তিগত ধারণার' উপর ভিত্তি করিয়া জনাব তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

তাঁহার এই ব্যক্তিগত ধারণার সহিত বস্তুগত কোন সম্পর্ক নাই। তদুপরি ডেপুটি কমিশনারের বেলায় বিষয়গত সন্তুষ্টি (সাবজেকটিভ স্যাটিসফ্যাকশান) আদৌ প্রযোজ্য নহে। এই সন্তুষ্টি অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ (অবজেকটিভ) হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত আদেশদানকালে সুষ্ঠু চিন্তার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। তদুপরি প্রতিরক্ষা বিধি অনুযায়ী কাহাকেও আটক করিতে হইলে কোথায় তাহাকে আটক রাখা হইবে, উহা নির্ণয় করা হয় নাই বিধায় এই আটক সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি আরও বলেন যে, উপরোক্ত আটকাদেশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। জনগণের ন্যায্য অভাব অভিযোগ তুলিয়া ধরার ফলে 'রাজনৈতিক নির্যাতনের' পর্যায়ে এই পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

আবেদনে বলা হয় যে, জনাব তফাজ্জল হোসেন তাঁহার পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের দাবী দাওয়া তুলিয়া ধরিতেছিলেন এবং বিশেষ করিয়া তিনি পাকিস্তানের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর (৬ দফা কর্মসূচী) প্রতি জোর সমর্থন জ্ঞাপন ও উহার প্রচার করার ফলে সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছেন।

সরকার উক্ত ৬ দফা কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ বিরূপভাবে গ্রহণ করিয়া উক্ত আন্দোলন ও কর্মসূচীকে ধ্বংস করার ব্রত ঘোষণা

করিয়াছেন। জনাব তফাজ্জল হোসেনের বর্তমান বয়স প্রায় ৫৪ বৎসর এবং তিনি একজন বহুমূত্র রোগী এবং সময় সময়ে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। আবেদনপত্রে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে বলিয়াও উল্লেখ করা হয়।

জনাব মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী উক্ত হেবিয়াস কর্পাস আবেদনটি পেশ করেন।

গতকাল আবেদনকারীর পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন সওয়াল জবাব শেষ করিলে সরকার পক্ষে এটর্নী জেনারেল পীরজাদা শরিফ উদ্দীন তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর আবেদনকারীর পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন পাল্টা জবাব দান শুরু করিলে গতকালের মত আদালতের কাজ শেষ হইয়া যায়।

ডঃ কামাল হোসেন আগামী সোমবার পুণরায় সওয়াল জবাব করিবেন। ডঃ কামাল হোসেনের বক্তব্যের জবাবে এটর্নী জেনারেল জনাব শফিউদ্দিন পীরজাদা বলেন যে, পাকিস্তান দেশরক্ষা অর্ডিন্যান্সের ৪ ও ৫নং ধারা বৈধ আইন এবং শাসনতন্ত্রের ভাবার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৩২নং বিধি মোতাবেক আটকাদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে অবৈধতার কিছুই নাই।

জনাব পীরজাদা বলেন যে, আটকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত সূত্রটি বিষয়গত এবং এই ক্ষেত্রে আটকাদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ আটকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্তুষ্ট চিত্তেই আটকাদেশ দিয়াছেন। এমতাবস্থায় আটকাদেশ বৈধ ও আইনসঙ্গত হইয়াছে। তিনি আটকের কারণের অস্পষ্টতার কথাও অস্বীকার করেন।

অর্ডারে সাইক্লোইষ্টাইল কপি এবং অর্ডারে দেশরক্ষা বিধির ৩২নং ধারার ভাষার যান্ত্রিক পুনরুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই কারণে আটকাদেশ অবৈধ হইতে পারে না, যদি সংশ্লিষ্ট অর্ডারটি আইনানুগভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এটর্নী জেনারেল জনাব পীরজাদার বক্তব্য পেশের পর আদালতের অধিবেশন গতকল্যকার মত সমাপ্ত হয়। আগামী সোমবার জনাব কামাল হোসেন এটর্নী জেনারেলের বক্তব্যের জবাব দান করিবেন।

ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ডঃ কামাল হোসেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করেন জনাব মইনুল হোসেন, ফকির শাহাবুদ্দিন, জনাব আমিরুল ইসলাম, জনাব ফরিদ উদ্দীন আহমদ ও জনাব কে, এস নবী।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এটর্নী জেনারেল জনাব শরীফউদ্দিন পীরজাদা এবং তাঁহাকে সাহায্য করেনে জনাব টি এইচ, খান. জনাব কে, বাকের , জনাব এস, এম, আব্বাস ও জনাব নূরুল্লাহ।

জনাব তফাজ্জল হোসেনকে হাজির করার আবেদন অগ্রাহ্য।

গতকাল পূর্বাহ্নে আবেদনকারীর প্রধান কৌসুলী বর্তমানে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনকে কোর্টে হাজির করার নির্দেশ দানের জন্য একটি আবেদন পেশ করিলে বিশেষ বেঞ্চ উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ঢাকার ডেপুটি কমিশনারকেও আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দানের জন্য অপর একটি আবেদনও অগ্রাহ্য করা হয়। প্রথম আবেদনটির সমর্থনে কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, জনাব তফাজ্জল হোসেনের আটক আইনসঙ্গত কিনা বা তাহাকে কারাগারে আইনগতভাবে রাখা হইয়াছে কিনা তা সম্পর্কে তিনি আদালতকে সর্বাধিক জ্ঞাত করিতে পারিবেন। ঢাকার ডেপুটি কমিশনার 'ব্যক্তিগত ধারণার' বশবর্তী হইয়া জনাব তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দান করায় তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য তাহাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দানের আবেদন করা হয়। আদালত এই দুইটি আবেদনই অগ্রাহ্য করেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে আশ্বাস দান করেন যে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের উভয়কে কোর্টে হাজির করার নির্দেশ দান করা হইবে, উহার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে না।

ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার হেবিয়াস কর্পাস রিটের আবেদনের শুনানির জবাব দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৮ জুলাই তারিখেও অব্যাহত থাকে। এ সংক্রান্ত খবর ১৯ জুলাই ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ডেপুটি কমিশনারের 'সন্তুষ্টি' দেশরক্ষার সহিত সম্পৃক্ত হইতে হইবে, ইত্তেফাক সম্পাদকের হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী অব্যাহত।' ইত্তেফাকের বিশেষ রিপোর্টার প্রদত্ত এই খবরে বলা হয়:

> গতকাল (সোমবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ও মালিক জনাব তফাজ্জল হোসেনের রীট আবেদনের শুনানীর দ্বিতীয় দিবসেও আবেদনকারীর কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেনের সওয়াল জবাব অব্যাহত থাকে। বিগত ১৬ই জুন দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী জনাব তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব এম আর খান, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দীন, বিচারপতি জনাব সায়েম ও বিচারপতি জনাব আবদুল্লাহ সমবায়ে উক্ত বিশেষ বেঞ্চটি গঠিত হয়।

আবেদনকারীর প্রধান কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেন এইদিন শাসনতন্ত্রের বিবিধ আর্টিকেল হইতে বহু নজির পেশ করিয়া প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যকার পার্থক্য পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁহার কার্যক্রমের কতিপয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সুস্পষ্টভাবে আলাদা এবং প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমবায়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত ম্যাণ্ডেট নির্ধারিত ব্যক্তিকে এককভাবে পালন করিতে হইবে এবং এই ক্ষমতা হস্তান্তর করা চলে না। তিনি বলেন যে, এমন কতিপয় ক্ষমতা রহিয়াছে যাহা প্রেসিডেন্টের একক একতিয়ারভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্ডিন্যান্স জারি, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের জজ নিয়োগ, বিল ইত্যাদিতে সম্মতি দান শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টই করিতে পারেন–কেন্দ্রীয় সরকারের উহাতে কোন ক্ষমতা নাই। ডঃ কামাল হোসেন আরও বলেন যে, শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের উপর আরোপিত এই সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টই প্রয়োগ করিতে পারেন। এমন কি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্সে কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান নাই।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্সের ৩ ধারার ৪ ও ৬ উপধারায় প্রাদেশিক সরকারের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপের ব্যাপারে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে প্রেসিডেন্টের মৌলিক আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা পরিহারের শামিল এবং ইহা শাসনতন্ত্রের বিরোধী। কাজেই এইরূপ হস্তান্তর আইনের দৃষ্টিতে খারাপ। তিনি আরও বলেন, প্রতিপক্ষের এফিডেভিটে এ কথা দাবী করা হয় নাই যে, পাকিস্তান রক্ষা বিধির অধীনে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে প্রাদেশিক সরকারের পরোক্ষ অনুমোদনও গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রশাসনিক ক্ষমতার সাব ডেলিগেশনের প্রশ্নে ডঃ বলেন হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণকারীর পুনরায় উক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষমতা নাই।

আবেদনকারীর কৌসুলী বলেন, পাকিস্তান রক্ষাবিধির অধীনে প্রেসিডেন্ট তাহার সর্বময় ক্ষমতা যথা- অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা ও কতিপয় প্রশাসনিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার হস্তান্তরের মাধ্যমে গৃহীত ক্ষমতা পুনরায় হস্তান্তর করিতে পারেন না। কাজেই উল্লিখিত ধরনের হস্তান্তর আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি বিশেষভাবে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অধস্তন কর্মচারীর নিকট সাব ডেলিগেশনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন।

আবেদনকারীর কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেন মহামান্য আদালতের নিকট এই মর্মে আর্জি পেশ করেন যে, বস্তুনিষ্ঠ সন্তুষ্টির ব্যাপারটি পর্যালোচনা করার ক্ষমতা ও সুযোগ আদালতের রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সন্তুষ্টি যদি যথেষ্টও হয় তবুও মহামান্য অদালতের নিকট গ্রেফতার সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র পেশ করিয়াছে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আটকের উদ্দেশ্যের সহিত বাস্তবিকপক্ষে সংগতিপূর্ণ কিনা উহা আদালতের বিচার্য বিষয়। তিনি বলেন, বর্তমান ক্ষেত্রে আদালত উপরোক্ত সন্তুষ্টির সম্পূর্ণতার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারেন না। কারণ আটকের আদেশে রেকর্ডকৃত কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। আদেশে কেবল মাত্র গ্রেফতারের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। আবেদনকারীর কৌসুলী বলেন যে, জনাব তফাজ্জল হোসেনের গ্রেফতারের কারণসমূহ আদালতকে অবহিত করা হয় নাই। ডঃ কামাল হোসেন বলেন, সরকার এই মর্মে কোন আবেদন পেশ করেন নাই যে, সরকারের হাতে গ্রেফতারের কারণ রহিয়াছে, তবে উহা প্রকাশ না করার অধিকার সরকারের রহিয়াছে।

এই পর্যায়ে বিচারপতি জনাব সিদ্দিকী সরকার পক্ষের মাধ্যমে প্রদেশের অস্থায়ী এডভোকেট জেনারেলকে তলব করেন। অস্থায়ী এডভোকেট জেনারেল জনাব জানে আলম আদালতে হাজির হইলে বিচারপতি জনাব সিদ্দিকী তাঁহার কাছে জানিতে চাহেন যে, সরকার পক্ষ জনাব তফাজ্জল হোসেনের আটক সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র আদালতে পেশ করিতে প্রস্তুত আছে কিনা। জনাব জানে আলম এই প্রশ্নের জবাবের জন্য সময় প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্নে অস্থায়ী এডভোকেট জেনারেল আদালতে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পেশ করিলে মাননীয় বিচারপতিগণ দেখিয়া উহা ফেরৎ দেন।

ইহার পর জনাব তফাজ্জল হোসেনের কৌসুলি ডঃ কামাল হোসেন আদালতে নিবেদন করেন যে, রেকর্ডপত্র দেখিতে না পারায় সরকারের কাছে তাঁহার মক্কেলের আটকের পক্ষে কি প্রমাণ আছে তাহা তিনি জানেন না।

১৯৬৬ সালের ১৯ জুলাই তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার হেবিয়াস কর্পাস রিট আবেদনের শুনানি সমাপ্ত হয়। এ সংক্রান্ত খবর ১৯৬৬ সালের ২০ জুলাই ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'ইত্তেফাক সম্পাদকের হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের সওয়াল-জবাব সমাপ্ত, হাইকোর্ট বিশেষ বেঞ্চে রায়দান স্থগিত।' ইত্তেফাকের বিশেষ রিপোর্টার প্রদত্ত এই খবরে বলা হয়:

> ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চে ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের পক্ষ হইতে শাসনতন্ত্রের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পেশকৃত এক রীট আবেদনের তিন দিবসব্যাপী শুনানী গতকাল (মঙ্গলবার) সমাপ্ত হয়। বিশেষ বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন। জনাব তফাজ্জল হোসেন বর্তমানে পাকিস্তান রক্ষাবিধির ৩২ ধারার খ অনুচ্ছেদের ১ উপবিধি মোতাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রহিয়াছেন। গত ১৬ই জুন তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।
>
> সরকার পক্ষের কৌসুলী জনাব শারিফুদ্দীন পীরজাদার যুক্তির উত্তরে জনাব তফাজ্জল হোসেনের কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেন (মঙ্গলবার) তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে শুরু করেন। ডঃ কামাল হোসেন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে সংশ্লিষ্ট গ্রেফতারী আদেশটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বিভিন্ন আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি জোরের সহিত বলেন যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া অভিযোগ করা হইলে আদালত ইহার তদন্ত করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এই ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে কি ব্যক্তিগত কারণে প্রযুক্ত হইয়াছে, আদালতকে তাহা দেখিতে হইবে। তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আদেশটিকে খুঁটিনাটি দিক দিয়া আইনসঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইলেও খুঁটিনাটি দিক দিয়া আইন সঙ্গত কিনা উহা দেখাই বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি বলেন যে, খুঁটিনাটি বৈধতার জন্য নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হওয়া উচিত নয় এবং খর্ব হইতে পারে না।
>
> ঢাকার ডি,সি জনাব পি,এ নাজিরের স্বাক্ষরিত সংশ্লিষ্ট আদেশটির কাঠামো ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, উক্ত আদেশ বিধিবদ্ধ আইন, অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার (ডি,পি,ও এবং ডি,পি,আর-এর যে উদ্দেশ্য) উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।
>
> ডঃ হোসেন বলেন যে, উক্ত আটক নির্দেশে জনাব তফাজ্জল হোসেন কি করিতেছিলেন বা তাঁহার কি করার আশঙ্কা ছিল সে

সম্পর্কে আভাস মাত্রও দেওয়া হয় নাই। উক্ত নির্দেশে শুধু বলা হইয়াছে: "জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা রক্ষা ও দেশে প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও কাজকর্ম অব্যাহত রাখার পরিপন্থী হইতে পারে এইরূপ কাজ করিয়াছেন বা করিতে পারেন বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।"

ঢাকার ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট নির্দেশে আরও বলেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, "জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা রক্ষা ও দেশের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও কাজকর্ম অব্যাহত রাখার পরিপন্থী কাজ করা হইতে জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে বিরত করার জন্য উক্ত জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে অত্র নির্দেশ দানের পর হইতে ৩ মাস আটক রাখা হইবে এবং তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকিবেন।"

ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, সরকার যে সময়ে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নস্যাৎ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা ঘোষণা করেন ডেপুটি কমিশনার সেই বিশেষ সময়ে বিরাজিত রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলিয়া সরকার পক্ষের এফিডেভিটে উল্লেখ করিয়াছেন। ডেপুটি কমিশনারের এই বক্তব্য সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক গৃহীত পরবর্তী ব্যবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আন্দোলনের সমর্থনে লিখিয়া জনাব তফাজ্জল হোসেন হয়ত কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছেন।

আদালত সমীপে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, প্রতিপক্ষের এফিডেভিটে সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, আটক ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা নিজে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত আছেন কিনা তৎসম্পর্কে সরকারের কোন তথ্য জানা নাই। সরকার দাবী করিয়াছেন যে, আটক ব্যক্তি তাঁহার সংবাদপত্রে স্বীয় উদ্দেশ্য ও একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য লিখেন। তিনি তাঁহার লেখার মাধ্যমে দেশের সংহতি বিনষ্ট করিতেছেন। ডাঃ কামাল হোসেন বলেন, এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, জনাব তফাজ্জল হোসেন লিখনীর মাধ্যমে স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করা ব্যতিরেকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত নহেন। সরকার আটক ব্যক্তির প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়া কার্যত: সকল ভাবে তাঁহার সংবাদ পত্রের প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সরকার তাহার মতামত প্রকাশের মাধ্যম কাড়িয়া লইয়াছেন এবং কাজেই তাঁহাকে আটক করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বহির্ভূত ব্যবস্থা গ্রহণ আটকাদেশ মন্দ প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তিনি বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়া কার্যত: দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা অসম্ভব করিয়া তোলার মাধ্যমে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইল তাহাতে পত্রিকাকে পঙ্গু করিয়া দেওয়াই সরকারের মতলব তাহা দিবালোকের মতই পরিষ্কার হইয়া উঠে। এইভাবে 'বিড়াল ঝোলার বাহিরে আসিল।"

তিনি বলেন, ৩২ নং বিধি চরম ব্যবস্থা। কদাচিৎই ইহার প্রয়োগ কাম্য, আইন ও শৃংখলা রক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যে ইহার আশ্রয় গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার সামগ্রিক বঞ্চনা একটি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, জনাব তফাজ্জল হোসেন যে একজন বিশেষ সম্মানিত ও দেশভক্ত নাগরিক সরকারী এফিডেভিটে একথা মোটেও অস্বীকার করা হয় নাই। বিগত যুদ্ধের সময় জনাব তফাজ্জল হোসেন তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীর মনোবল সমুন্নত রাখিয়া দেশরক্ষার কাজে সরকারের সাথে যে একান্তই সহযোগিতা করিয়াছেন এফিডেভিটে উহাও অস্বীকার করা হয় নাই। জনাব তফাজ্জল হোসেন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য কিনা অথবা কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত আছেন কিনা সরকার সে সম্পর্কেও অবহিত বলিয়া এফিডেভিটে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এফিডেভিটে শুধু ইহাই বলা হইয়াছে যে, জনাব তফাজ্জল হোসেন লেখনীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং একমনা ব্যক্তিদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন এবং দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছিলেন।

সরকারী এফিডেভিটের এই পটভূমিকার জের টানিয়া ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, জনাব তফাজ্জল হোসেনের প্রেস বাজেয়াপ্ত ও তাঁহার পত্রিকার প্রকাশনা অসম্ভব করিয়া তুলিবার মাধ্যমে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার অর্থাৎ জনাব তফাজ্জল হোসেনের মত প্রকাশের মাধ্যমকে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। উপরন্তু তাঁহাকে আটক করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা হইয়াছে; কাজেই আইনের চোখে তাঁহার আটক মূল্যহীন।

ডঃ হোসেন বলেন যে, জনাব তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেপ্তার এবং তাঁহার প্রেস বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকার রাতের আঁধারে নৈশ অভিযান চালনা করেন। কারণ সরকারও উপলব্ধি করেন যে, এই ধরনের ব্যবস্থা দিবালোকে গ্রহণ করার মত নয়।

আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হলফনামায় 'শাসনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের' অভিযোগ করিয়া সরকার কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ডঃ হোসেন সে সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এই অভিযোগ ধারণাতীত।

গ্রেফতারের আদেশ প্রদান করিতে যাইয়া ডেপুটি কমিশনার যে স্বকীয় মনন শক্তি প্রয়োগ করেন নাই, তাহা নির্দেশ করিয়া ডঃ হোসেন উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি সারা প্রদেশে আটক সকল ব্যক্তির বেলাতেই একই ধরনের সাইক্লোষ্টাইল করা আদেশপত্র এবং একই ধরনের আদেশনামার ব্যবহার করা হইয়াছে এমন কি প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযোগগুলোও অভিন্ন।

সরকার পক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান জনাব তফাজ্জল হোসেনের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নাই; কারণ তাঁহার মতে দেশপ্রেম কাহারো একচেটিয়া কারবার নয়।

জনাব খান বলেন যে, আটকের কারণ প্রকাশ করা ৩২ নম্বর বিধি মোতাবেক অত্যাবশ্যক নয় এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কোন আইন প্রয়োগ করা হইবে, তাহা একমাত্র ডেপুটি কমিশনারের সন্তুষ্টির উপরই নির্ভরশীল। শুনানী সমাপ্তির পর ডঃ কামাল হোসেন মাননীয় বিচারপতি মণ্ডলীর সুবিধা সাপেক্ষে মামলা দুইটির (জনাব তফাজ্জল হোসেনের আটক ও নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত আশু রায়করণের) প্রার্থনা জানান। ইহার কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, প্রায় তিনশত কর্মচারীর পরিবারও উৎকণ্ঠার মধ্যে রহিয়াছেন বলে পত্রিকার জীবন মৃত্যুও দোদুল্যমান রহিয়াছে।

মামলা পরিচালনায় ডঃ কামাল হোসেনকে মেসার্স মঈনুল হোসেন বার-এট-ল, ফকির শাহাবুদ্দিন, আমিরুল ইসলাম, কে এস নবী ও ফরিদ উদদিন সহায়তা করেন।

ইত্তেফাক বন্ধ হওয়া নিয়ে পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, সিপিএনই ও এপিএনএস এর নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট আহ্বান করেন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেন। তবে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে ধর্মঘট স্থগিত করেন। এ সংক্রান্ত খবর ইত্তেফাকে ১৯৬৬ সালের ২০ জুলাই প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'দৈনিক ইত্তেফাক প্রসঙ্গ, পত্রিকা ধর্মঘট স্থগিত হইলেও আজ হইতে সাংবাদিকদের কালো ব্যাজ ধারন।' রাওয়ালপিণ্ডি থেকে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়:

> দৈনিক ইত্তেফাকের বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে আগামীকাল ২০শে জুলাই হইতে ফেডারেল ইউনিয়নের পরবর্তী করাচী বৈঠক পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানের কার্যরত সাংবাদিকদের কালো ব্যাজ ধারণ করার জন্য পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আসরার আহমেদ আজ এক আহ্বান জানাইয়াছেন।

ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে গঠিত সি,পি, এন, ই, এ, পি, এন, এস ও পি, এফ, ইউ, জের যুক্ত কমিটি আলাপ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখার জন্য পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্র শিল্পে ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পি,এফ, ইউ, জে সভাপতির বিবৃতি

পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আসরার আহমেদ আজ এক বিবৃতিতে বলেন: পি, এফ, ইউ, জে কর্তৃক নিযুক্ত আপোষ-কমিটি সংশ্লিষ্ট ৩টি সংস্থার বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে সি, পি, এন, ই, এ, পি, এন, এস, ও পি, এফ, ইউ, জে কর্তৃক যুক্তভাবে আহূত ২০শে জুলাইর ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে সম্মত হইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য অনুমোদিত সকল ইউনিয়নকে সংবাদপত্র শিল্পে ব্যাপক ও দৃঢ় ঐক্য গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইতেছি।

'ইত্তেফাক ও ইত্তেফাক সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবাদে আগামীকাল ২০শে জুলাই হইতে ফেডারেল কার্যনির্বাহক পরিষদের পরবর্তী–করাচী বৈঠক অনুষ্ঠান পর্যন্ত আমি পাকিস্তানের সকল ইউনিয়নভুক্ত মেহনতী সাংবাদিকদের কালোব্যাজ ধারণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি। সি, পি, এন, ই, এ, পি, এন, এস, ও পি, এফ, ইউ, জে'র যুক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই করাচী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

সংবাদপত্র ধর্মঘট স্থগিত

পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ, নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সমিতি ও পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের যুক্ত কমিটি ২০শে জুলাই আহূত ধর্মঘট "পরবর্তী নোটিস প্রদান না করা পর্যন্ত" স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া যুক্ত কমিটির এক প্রেস রিলিজে ঘোষণা করা হয়।

প্রেস রিলিজে বলা হয়, সি, পি, এন, ই, এ, পি, এন, এস, ও পি, এফ, ইউ, জে'র যুক্ত কমিটি গত ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের উপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর মালিক আমীর মোহাম্মদ খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

যুক্ত কমিটি গত ১৮ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খানের সহিতও সাক্ষাৎ করেন এবং এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করেন। দুই গভর্নরের সহিত বৈঠকের পর

কমিটি রাত্রিব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই সম্পর্কে পুংখানুপুংখ আলোচনা করেন।

শেষ পর্যন্ত পরবর্তী আলাপ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখার জন্য কমিটি পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্র শিল্পের ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যুক্ত কমিটি এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে করাচীতে সি, পি, এন, ই, এ, পি, এন, এস ও পি, এফ, ইউ, জের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে রাখে আইয়ুব সরকার। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ঐ বছর ১০ ফেব্রুয়ারি পুনরায় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা শুরু হয়।

সম্পাদকীয়

ছয়দফাকে সমর্থন জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে বেশ কিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ ছয়দফা প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল। সম্পাদকীয়তে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছয়দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করা হয় এবং এই আন্দোলন পরবর্তীতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিতি পায়। সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'লাহোর প্রস্তাবের আলোকে'। এতে লেখা হয়:

যে দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এই উপমহাদেশের ১০ কোটি মানুষের মনে এক স্বাবলম্বী ও স্বাধিকারসম্পন্ন জীবনের চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বছর পরিক্রমায় সেই দিনটি আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তৎপর্যপূর্ণ এই দিনে আমরা তাই ২৩শে মার্চের পুনরাবির্ভাবকে সুস্বাগতম জানাই।

তেইশে মার্চকে বলা হয়, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের ঐতিহাসিক দিবস। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই দিবসের বৈশিষ্ট্য কি? লাহোর প্রস্তাব কি শুধুমাত্র সাবেক ভারতের দশ কোটি মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদ? না, প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্বলকে রক্ষার, সকল কৃষ্টি ও স্বাধিকার-চেতনার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষাসহ স্বেচ্ছাসম্মিলনের একটি অঙ্গীকারপত্র? ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন, লাহোর প্রস্তাবের মূল

বিষয়বস্তুই ছিল, স্বায়ত্তশাসনাধিকার ও স্বেচ্ছাসম্মিলন। তাই উক্ত প্রস্তাবে সজ্ঞানভাবেই সাবেক ভারতের মুসলিম-সংখ্যাগুরু সমবায়ে স্টেটসমূহ গঠনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং এই স্টেটসমূহের স্বেচ্ছাসম্মিলনের রাষ্ট্রীয় নামকরণই পরে করা হইয়াছিল 'পাকিস্তান'।---

আমরা কাহারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি না। শুধু বিগত আঠারো বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দুঃখ, বঞ্চনা ও বেদনার স্মৃতি মন্থন করিতেছি মাত্র। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যে স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অঙ্গীকার ঘোষিত হইয়াছিল, সেই অঙ্গীকারের মর্যাদা, লাহোর প্রস্তাবের মর্যাদা রক্ষিত হইলে একটি সুখী, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরূপে আজ হয়ত আমাদের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশের কোন অবকাশই দেখা দিত না।

ইহাকে ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া কি বলিব, ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যেখানে আজিকার পাকিস্তানভুক্ত প্রদেশসমূহের মধ্যে একমাত্র সাবেক বাংলাতেই মুসলিম লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল এবং এই সেদিনও পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও পূর্ব পাকিস্তানীরা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেম সম্পর্কেই আজ কথায় কথায় কটাক্ষ করা যেন রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে।

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ফেডারেল ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনাধিকারসহ পূর্ব পাকিস্তানীদের বসবাসের আকাংক্ষাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে। এবারের তেইশে মার্চে তাই লাহোর প্রস্তাবের আলোকেই দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও পরিবর্তিত রাজনীতি বিচার-বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিচার-বিশ্লেষণেই ধরা পড়িবে, পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি কোন পথে আরো দৃঢ় হইতে পারে।

বস্তুতঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই লাহোর প্রস্তাবকে আজ আমাদের রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। স্বাধীনতা লাভের আগে প্রণীত ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এই সর্বজনস্বীকৃত সনদকে এড়াইয়া ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমত জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের কোন প্রয়াস সফল হইতে পারে না। তাতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দুর্বল হইবে মাত্র।

পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ৬-দফা দাবীকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লাহোর প্রস্তাবেরই সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন বলা যাইতে পারে। স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সনদের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখিয়া স্বাধীনতা-উত্তর গত ১৮ বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে এই ৬-দফা দাবী প্রণীত হইয়াছে মনে হয়। এই প্রস্তাবের মধ্যেও লাহোর

প্রস্তাবের সেই অমর মূলমন্ত্রই উচ্চারিত হইয়াছে। Live and let live–বাঁচো এবং বাঁচিতে দাও। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্তরিকভাবেই চায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হউক, সেই সঙ্গে তাহাদের জীবনেও এই সুখ ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগুক। লাহোর প্রস্তাবে একদিন সকলের জন্য এই সমান অধিকার ও সমান সমৃদ্ধির অঙ্গীকার ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহা দশ কোটি মানুষের মুক্তি সনদে রূপান্তরিত হইতে পারিয়াছিল। এই মুক্তি-সনদের অঙ্গীকারের আলোকেই আজ আবার পাকিস্তানের জনগণকে তাহাদের স্বাধীন, সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গঠনের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। আজিকার তেইশে মার্চ এই শপথ গ্রহণ ও তাহা ঘোষণারই দিন।

১৯৬৬ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ছয়দফা প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে ছয়দফা কর্মসূচিতে যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে তা সমর্থন করা হয়। ছয়দফার বিরোধিতাকারীদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানোর পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ববর্তী উনিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসনের নামে শোষণ প্রক্রিয়া পূর্ববাংলার জনসাধারণের চোখ খুলে দিয়েছে। বাঙালি অতীতেও পরাধীনতা মেনে নেয়নি, ভবিষ্যতেও নেবে না বলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কেন'। এতে লেখা হয়:

ভারত রাজী হবে কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর। তবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছে, তা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ 'বৃহত্তর বাংলা গঠনের' কল্পনাও কোন পূর্ব পাকিস্তানীর মাথায় নেই, তাদের মাথায় শক্তিশালী কেন্দ্র নয়– শক্তিশালী পাকিস্তানের স্বপ্ন। তাই পূর্ব পাকিস্তানীর বক্তব্য শোষণের বিরুদ্ধে, শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার, অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের, শক্তির ধমকের বিরুদ্ধে বাস্তব সত্য উপলব্ধির–তথা বুভুক্ষা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সুখ-সমৃদ্ধি ও বাঁচার। এ বাঁচার দাবীর প্রণেতার পরিচয় বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে, পরিকল্পিত পথ শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও শক্তিশালী পাকিস্তান রচনার পক্ষে কতদূর সহায়ক। যদি সহায়ক বলে দেশবাসী সমর্থদান করেন, তাহলে সে আর দলবিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের পরিকল্পনা থাকে না। জাতির পরিকল্পনায় পর্যবসিত হয়। শেখ মুজিবের ছয়দফা আজ আর কোন ব্যক্তি বিশেষের বা দলবিশেষের নয়, ইহা সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর।

পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্র হিসাবে শেখ মুজিব ছয়দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রদেশবাসী তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছে। তথাপি কোন স্বার্থান্বেষী মহলের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহলে তারা জনতার দরবারে হাজির হয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে পারেন। শেখ মুজিবের উত্থাপিত ছয়দফা নূতন কিছু নয়, তাতে কারো আতঙ্কিত হওয়ারও কিছু নেই। এ দাবী বহুকালের। শেখ মুজিব পুরনো কথাটা নতুন করে বলেছেন এই যা। যাঁরা ছয়দফায় বিস্ময় বোধ করেছেন, ইতিহাসের দিকে তাঁদের একবার ফিরে তাকানো উচিত। সে ইতিহাস অত্র পত্রিকার বহু প্রবন্ধেই আলোচিত হয়েছে। মোদ্দাকথা, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আনকোরা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এতে 'বৃহত্তর বাংলা গঠনের', 'বাঙ্গালী মুসলমান শুধু ইংরেজের নয়–হিন্দুরও গোলাম', 'গৃহযুদ্ধ" শুরু হওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি অভিযোগ কিভাবে উত্থাপিত হতে পারে, তা সত্যি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইতিহাস সাক্ষী, বাঙ্গালী কোনদিন ভীরুর মত পরাধীনতা স্বীকার করে নেয়নি। বাঙ্গালী সন্তান সিরাজুদৌল্লা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, তীতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরী করে দোর্দণ্ড প্রতাপে ইংরেজের মোকাবিলা করেছেন। অগণিত বাঙ্গালী মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত দিয়েছেন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের জঘন্য মন্তব্য নতুন নয়। যখনই এ অঞ্চলের মানুষ অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, তখনই তাদের দেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদের, আঞ্চলিকতাবাদের, সংহতি বিনষ্টের অপবাদ। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্নের ধূয়া তোলা হয়েছে। জন-নেতাদের 'শত্রুর চর' আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক মরহুম শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হককে শেষ বয়সে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়েছে, সর্বজনমান্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারারুদ্ধ ও দেশ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। তরুণ বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবসহ এতদঞ্চলের প্রায় তিন হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেদিন যেমন স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত সফল হয়নি, আজো হবে না, এ নিশ্চয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই কেন? এর একমাত্র এবং সহজ ও সোজা উত্তর হচ্ছে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য। কারণ, সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে মুখে রক্ত সঞ্চালনের নাম যেমন স্বাস্থ্য নয়, তেমনি বৃহত্তর জনসমাজকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং সকল মানুষকে অধিকারবর্জিত রেখে এক হস্তে এবং সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণের নাম উন্নতি নয়। স্বার্থান্বেষী মহল এই সহজ সরল ও বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে সমস্ত সম্পদ এক স্থানে এবং সমস্ত শক্তি একহস্তে

ধারণের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করছেন। কিন্তু বিগত উনিশ বৎসরের ভ্রান্ত শাসন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছে। বিগত উনিশ বছরে আমরা দেখেছি, কি করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের ধন সম্পদ লুণ্ঠনের সংরক্ষিত বাগিচায় পরিণত করা হয়েছে। এই শোষণক্রিয়ার ফলে অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের পূর্বে যেখানে দু'খানা লুঙ্গি ক্রয়ের সামর্থ্য ছিল, সে স্থলে আজ তাদের একখানা গামছা ক্রয়েরও সাধ্য নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক–তথা সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীরা আজ শুধু বঞ্চিত নয়, লাঞ্ছিত ও শোষিত।

উপসম্পাদকীয়

ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে দুটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া নিজের নামে একটি উপসম্পাদকীয় লিখেন। এই উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা কর্মসূচি নতুন কিছু নয়। ছয়দফা কর্মসূচি সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। কারণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে সম-অধিকার নিশ্চিত হবে। উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'বাস্তবতার আলোকে ৬-দফা কর্মসূচী'। এতে লেখা হয়:

> শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ও পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ৬-দফা কর্মসূচী কোন কোন মহলে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আর-যে যাই বলুন, আমি কিন্তু এই ৬-দফা পরিকল্পনায় নূতন কিছুই দেখি না। পরিকল্পনাটির সঙ্গে কেউ একমত হতে পারেন, আবার কেউ হয়তো ভিন্নমতও পোষণ করতে পারেন; তাই ব'লে একথা কেউই বলতে পারেন না যে, এই কর্মসূচীতে যা বলা হয়েছে তিনি আগে কখনও তা শোনেননি। মুজিবর রহমানকে এইটুকু কৃতিত্ব দেওয়া চলে যে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে জাতীয় সমস্যাবলী যখন নূতন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময়ে তিনি এই বিস্তারিত কর্মসূচীটি প্রণয়ন করে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ১৯৫০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কন্‌ভেনশনে লিয়াকত আলীর মৌলিক আদর্শ কমিটির সুপারিশের যে বিকল্প রিপোর্টটি গ্রহণ করা হয়, তার কথা যাদের মনে আছে, তারা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করবেন যে, ঐ রিপোর্টেও এই একই ধরনের দাবী সন্নিবেশিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর ১৯নং দফাটিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে স্থান

পেয়েছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সেদিন মুসলিম লীগই ক্ষমতায় আসীন ছিল এবং সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বয়স্ক-ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল সেদিন যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার, বিশেষ করে তার রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী দু'টির বিরুদ্ধে মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নেজামে ইসলাম দলও সেদিন যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল ছিল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলতে গিয়ে ক্ষমতাসীন লীগ দল সেদিন সরকারী ক্ষমতা ও অর্থ বল সব কিছুরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সর্বশক্তিতে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর প্রতি তারা সর্বতোরকমে ও সম্ভাব্য সব উপায়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। এমনকি, জনসাধারণকে হুঁশিয়ারির পর হুঁশিয়ারি জানিয়ে এমন ঘোষণাও তাঁরা করেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচীর প্রতি জনসাধারণ যদি সমর্থন জানায় তাহলে "ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন" হয়ে পড়বে। এত প্রচারণা, এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও জনগণের আদালতের বিচারে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল সেদিন সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্ট দল নির্বাচনে শতকরা ৯৭টি আসন দখল করে। বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্টের সেদিনকার এই বিজয় সারা এশিয়ার বুকে এক নজিরহীন ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রথম নির্বাচনী সংগ্রামে বিরোধী দলের মোকাবিলা করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন কোন দলের এমন করে উৎখাত হওয়ার ঘটনা এশিয়ায় আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। স্বভাবতঃই কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম দলকে আজ যখন শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচীকে অভাবিতপূর্ব বা আকস্মিক একটা কিছু বলে গণ্য করে হৈ-চৈ করতে দেখি, তখন বিস্মিত হতে হয় বৈ কি! ১৯৫৪ সালে প্রত্যক্ষ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে জনগণ যে সুস্পষ্ট রায় দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কেউ সহজেই একথা বলতে পারেন যে, আলোচ্য কর্মসূচীর জনগণ-স্বীকৃত ভিত্তি সম্পর্কে নূতন করে প্রশ্ন তুলবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আর কারও নেই (অবশ্য বিস্তারিত খুঁটিনাটি সম্পর্কে মতানৈক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়)। এতদসত্ত্বেও, একজন উদারমনা গণতন্ত্রী হিসেবে এবং জনগণের প্রতি অবিচল আস্থা আছে বলেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিতে নূতন করে আলোচনার সূত্রপাত হওয়ার ব্যাপারে আমার অমত নেই, অবশ্য যদি এ প্রশ্নে সরাসরি গণভোট অথবা প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাইর ব্যবস্থা করা হয়। যা-ই হোক, কেবল যে পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি লাহোর প্রস্তাবেই একথার উল্লেখ ছিল তাই নয়, পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে

প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের সুস্পষ্ট রায় জানিয়ে দিয়েছে, নূতন করে সেই প্রশ্নটিকে কেউ আবার তুলে ধরতে চাইলে তাঁর এ উদ্যমের পিছনে দুরভিসন্ধি আবিষ্কার করতে গেলে সত্যের প্রতি চরম অবিচারই করা হবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের অধিকার স্বীকৃত; কিন্তু যে প্রশ্নে একবার জনমত যাচাই করা হয়েছে, সে প্রশ্নে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে জনমতের সেই রায়কে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যেকের উচিত পরস্পর সহযোগিতা করা। রাষ্ট্রভাষা ও যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্নে এই ধরনের গণতান্ত্রিক মনোভাবই আমরা লক্ষ্য করেছি। স্বভাবতই প্রশ্ন করা যেতে পারে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সেই একই মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না কেন? আগে বহুবারই আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে কেউই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব পোষণ করেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও, বিচ্ছিন্নবাদিতার যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তার লক্ষ্য কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বাঞ্চিত করে রাখা। কে না জানে বা কে না বুঝে যে, পারস্পরিক স্বার্থে ও পারস্পরিক অস্তিত্বের খাতিরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক হয়েই বসবাস করতে হবে। দেশের উভয় অংশকেই সমান ভাবে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। একতরফা উপলব্ধির কোন অবকাশ সেখানে নেই। ভৌগোলিক কারণেই পাকিস্তানের জীবনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের। অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা। দিয়েছে। এ দাবীর মোদ্দা অর্থ, দেশের উভয় অংশকে সমান স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতার অধিকারী কর- খাস করে পূর্ব পাকিস্তানকে কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, যখনই কোন ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া এমনকি উর্দুর পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ৫ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার মত নির্দোষ দাবী নিয়েও যখন এই প্রদেশবাসী উত্থাপন করেছে, তখনই দেখা গিয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের। কিছু লোক সে প্রশ্নে হৈ- চৈ শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন-- এমনকি যারা সে দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে 'শত্রুর চর' বলে আখ্যায়িত করেছন; আর সেই সঙ্গে অত্যাচার আর নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে। শত শত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রকে কারান্তরালে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তারই পাশাপাশি পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে তিন-তিনটি ছাত্রকে অকালে প্রাণও দিতে হয়েছে। আবার যখন যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে, তখনও ঠিক এই একই অবস্থা দাঁড়ায়। দেশবরেণ্য নেতা ও জনগণকে লক্ষ্য করে তখন কেবল গালিগালাজই করা হয় না, জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবনের উপরও নৃশংস হামলা চালানোর চেষ্টা চলে। বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যা' কিছুই বলা বা করা হোক না কেন, সে সম্পর্কে পূর্ব-

পরিকল্পিত একটা বিশেষ মানসিকতা নিয়ে এমনতরই ধুয়া তোলা হয়, এমনতরই অত্যাচার আর নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়। অথচ, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু কিছু লোকের এই মনোভাব কোন কালেই জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতির অনুকূল হতে পারে না। আমার অনুরোধ হলো, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসম্বলিত যে ৬-দফা কর্মসূচী সম্প্রতি দেশবাসীর সামনে পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সেই একই নিয়মে আবার যেন সেই ভ্রান্ত মনোভাবই প্রয়োগ না করা হয়। একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি দেশের আইন বইতে আজ স্থান পেলেও শুরুতে এই সব দাবীদাওয়া দাবিয়ে দেয়ার জন্য এদেশের শত শত, এমনকি কখনো কখনো হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রকে কারাগারে নিক্ষেপের মত অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একদিন যে তিক্ততার সৃষ্টি করা হয়েছে, আজও তার জের চলেছে। বিনা কারণে মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলে বা আদালতে বিচারের ব্যবস্থা না করে তার নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হলে মানুষের শরীর ও মনের ওপর চরম নির্যাতনই করা হয়। বলাবাহুল্য, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যমানের গোড়ায়ই কুঠারাঘাত করে। তবু, সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করবার মত লোকের আজও অভাব নেই। অত্যাচার-নির্যাতন যতই কঠোর হোক, সংগ্রামী মানুষকে তা হতোদ্যম করতে পারে না, বরং অত্যাচার-নির্যাতনের কঠোরতা যতই বৃদ্ধি পায়, সংগ্রামী মানুষের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ততই আরও জোরদার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসই এ-কথার সত্যতার সাক্ষী। অতএব দেখা যাচ্ছে, যে সমস্যার আজ আমরা সম্মুখীন হয়েছি, অত্যাচার নির্যাতন বা দমনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে সে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না বা সে ব্যবস্থাতে ৬-দফা কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে তারও কোন সুরাহা হবে না। একই দেশের নাগরিক হয়ে একে অপরের আন্তরিকতার বা দেশপ্রেমের প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। অতীতে একশ্রেণীর মানুষে এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এদেশের মানুষে-মানুষে এবং বিশেষ করে দেশের দূরাস্তৃত দুই অংশের জনসাধারণের ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষিয়ে তুলেছিল। যারা একদিন শেরে-বাংলা ফজলুল হককে "বিশ্বাসঘাতক" বলে অভিহিত করেছিল, তাদেরকেই কিছুদিন যেতে না যেতে তাঁকেই আবার "দেশপ্রেমের মানসপুত্র" বলে অভিনন্দিত করতে হয়েছে। আর যাঁরা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেশপ্রেমে সন্দেহ করেছেন, তাঁরা দেশের তো নয়ই, নিজেদেরও কোন মঙ্গল করেন নি। সংশ্লিষ্ট মহলকে তাই আমরা অনুধাবন করতে বলি যে, যখন আমরা দেখি পূর্ব পাকিস্তানে

এমন কোন নেতা নেই–যাঁকে কোন না কোন সময় 'দুর্নীতিপরায়ণ' বা 'শত্রুর চর' বলে আখ্যায়িত করা হয়নি, তখন আমাদের মনোভাব কি দাঁড়ায়? জিজ্ঞাসা করি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ধন-দওলত বা বিষয়-সম্পত্তি বলতে কি রেখে গিয়েছেন? পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে হেয় প্রতিপন্ন ও খাটো করার জন্য মহল বিশেষে আমরা একটি বিরামহীন প্রবণতা লক্ষ্য করে আসছি। অথচ, বাস্তব অবস্থা এই যে, মুসলিম বাংলার নেতৃত্ব ও এই প্রদেশের রাজনীতি-সচেতন মানুষ না হলে আদপে পাকিস্তানই অর্জিত হতো না। পাকিস্তান কারও দান নয়, কিংবা যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত রাষ্ট্রও নয়; কেবলমাত্র জনগণের দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য ইচ্ছার বলেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। সংগ্রামের সূত্রে আমরা এমন অনেককে চিনেছি-যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের নিন্দা করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাচ্ছিল্য করতে চান। এঁরা সেই শ্রেণীরই লোক, যাঁরা কোন ন্যায্য দাবী উঠলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন। সাধারণভাবে রাজনীতিকদের উদারতার সুযোগে পাকিস্তানে 'কায়েমী স্বার্থের' একটি চক্র গড়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে। এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেই কায়েমী স্বার্থবাদী মহলটিই এখন সেই রাজনীতিকদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে চলেছেন। বিশ্বের "নির্যাতিত মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গ করতেও পিছ-পা নন বলে তারা প্রচার করেন; অথচ নিজ দেশের জনগণের অধিকার প্রদানের প্রশ্নে তারাই আবার মারমুখী। স্বার্থবাদী এই চক্রটির পীঠস্থান হলো পশ্চিম পাকিস্তান। অবশ্য, এ পাদপীঠ পূর্ব পাকিস্তানে হলেও তাঁদের কার্যকলাপের কোন তারতম্য হতো না; কারণ, স্বার্থবাদী চক্রের দৃষ্টিভঙ্গী সবখানেই এক। এখন প্রশ্ন হলো, কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতেই আমরা পালিত হব, না সুস্থ মানসিকতা, যুক্তিধর্মিতা এবং জনগণের ইচ্ছাঅভিলাষকেই আমরা রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হতে দেব? কায়েমী স্বার্থী মহল হয়তো মনে করতে পারেন যে, দেশের আপামর জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের ভূমিকাকে কেবল পিছনে ফেলে দিতে পারলেই নিজেকে অস্তিত্ব বজায় রেখে তারা ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারবেন। এই যখন অবস্থা, তখন কায়েমী স্বার্থীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা–এই দুইটির মতো আজ একটিকেই আমাদের বেছে নিতে হবে।

আমার স্থির বিশ্বাস, জনগণের ইচ্ছাকে যদি প্রতিফলিত হতে দেয়া হয়, তবে ৬-দফা কর্মসূচী বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোনটি সম্পর্কেই কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ আর থাকবে না। কেননা, এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতার বিধান হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের এতে আপত্তি থাকতে পারে কি?

জবাবে বলব, না। পাকিস্তানের এমন কে আছেন–যিনি চান না যে, দেশের উভয় অংশই সমানভাবে উন্নত হোক, এবং উভয় অংশই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করুক?

৬-দফা পরিকল্পনার কোথাও যদি কোন আপত্তিকর কিছু থাকে, পাকিস্তানের সংহতি বিপর্যস্ত হতে পারে, এমন কিছুও যদি তাতে থাকে, তা হলে দেশের দুই অংশের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে সহজেই সে প্রশ্নের ফয়সালা করতে পারেন। আমার বিবেচনায় ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের এই-ই সর্বোত্তম পথ। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দোষারোপ করার আগে স্মরণ রাখা উচিত যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছে। এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই দেশের অখণ্ডতা এবং উভয় অংশের জনগণের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আন্তরিকতার প্রমাণ মিলবে। দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তা আজ আর কারও অজানা নয়। কেবল আশ্বাসবাণী দিয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে এই পাহাড়-প্রমাণ বৈষম্য দূর করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে উভয় অঞ্চলের অবস্থা যাতে সমানুপাতে আনয়ন করা যায়, তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট, আত্ম-পরিচালিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ৬-দফা কর্মসূচীটি বিবেচনা করে দেখার জন্য আহ্বান জানাই। আসুন, কে এই ৬-দফার প্রণেতা, আপাততঃ তা ভুলে গিয়ে আমরা পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার আলোকেই ৬-দফা কর্মসূচীর গুণাগুণ বিচার করে দেখি। স্বায়ত্তশাসনের দাবী বা ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি এখানকার জনগণের কোন সমর্থন নেই এবং এ কর্মসূচী কোন আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিক মহলের দুরভিসন্ধিপ্রসূত, এরূপ ধারণা পোষণ করে আত্ম-প্রবঞ্চনার কোন অর্থ নেই। বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী একটি অত্যন্ত জীবন্ত দাবী। এখানকার মানুষ এ দাবীকে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন বলেই গণ্য করে। এ প্রশ্নে যাঁদের সন্দেহ আছে বা যাঁরা এখনও অজ্ঞতায় ভুগছেন, তাঁরা জনগণের দরজায় গিয়ে তাঁদের মতামত যাচাই করুন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং উভয় অঞ্চলই যদি সমান রাজনৈতিক অধিকার পায়, তবে আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে না, বরং পাকিস্তান তাতে আরও শক্তিশালীই হবে।

সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জওয়ানরা তাদের শৌর্য ও বীর্যবত্তার প্রমাণ দিয়েছে এবং বাঙ্গালীরা সাহসী ও যোদ্ধার জাত নয় বলে এতদিন যে বানোয়াট অপবাদ রটনা করা হয়েছে তারও অবসান ঘটিয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ৬-দফা কর্মসূচী দেখে আঁৎকে উঠার বা ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আসুন আমরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মন নিয়ে প্রকৃত অবস্থা বিচার করি। সংশ্লিষ্ট সকলে পরস্পর পরস্পরের বক্তব্য বা মতামত বুঝবার ও সম্যক উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন। প্রত্যেক ব্যাপারে যাঁরা আমাদের সন্দেহ করেন, তাঁদের কাছে আমি একটি পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পশ্চিম পাকিস্তান যদি আজকের এই পর্বত-প্রমাণ বৈষম্যের শিকার হত, তা হলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হত?

তাই তাদেরকে বলব, ধৈর্যশীল হউন, যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছু বিচার করুন। আমি তাঁদের আহ্বান জানাই "নিজে বাঁচুন, অপরকেও বাঁচতে দিন"–এই নীতি বাক্য কেবল কথায় নয়, কাজেও বিশ্বাস স্থাপন করুন। তাহলেই কেবল পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই পূর্ণ সহযোগিতা ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সন্দেহ ও দমননীতির দ্বারা কিছু হাসিল করা যাবে না- তাতে বিরোধের মাত্রাই কেবল বাড়বে।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। উপসম্পাদকীয়টি লিখেন এ কে রফিকুল হোসেন। এই উপসম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ছয়দফা দাবি বাস্তবায়ন শুধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের পথই বন্ধ করবে না, বরং বিগত ১৮ বছরের বঞ্চনা ও শোষণেরও অবসান হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঞ্চিত ও শোষিত জনগণের ছয়দফা দাবি মানার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'জনগণের এ সংগ্রাম চলিবেই'। এ উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত ও আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত "ছয় দফা" পাকিস্তানের একটি বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন শাসনতন্ত্রের দাবী। ইহার অর্থঃ পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও অবস্থান এক ও অভিন্ন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার যার, তার তার। ইহার ফলে পাকিস্তানের এক অঞ্চলের পক্ষে অন্য অঞ্চলকে শাসন ও শোষণ করার প্রবণতা ও সুযোগ থাকিবে না বা এইরূপ করা হইতেছে বলিয়া একে অন্যকে সন্দেহও করিবে না। এই ব্যবস্থায় অঞ্চলদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, একে অন্যের দুষমনে পরিণত হইবে বা এক অঞ্চলের বিরুদ্ধে অন্য অঞ্চল দুষমনের সঙ্গে হাত মিলাইবে এইরূপ মনে করা শুধু অসুস্থ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিন্তাধারারই পরিচায়ক নয়, পরন্ত পাকিস্তানের বাস্তবতায় অবিশ্বাসেরই নামান্তর।

সমালোচকদের প্রতিপাদ্যের মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায়– পাকিস্তান একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র এবং ইহাকে টিকাইয়া রাখিতে হইবে একটি বিশেষ ধরনের শাসনতন্ত্রের মারপ্যাঁচে। তাই, জনগণ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রের মারফত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে পাকিস্তান দুর্বল হইবে–ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে বা অঞ্চলবিশেষ স্বীয় স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় দুষমনের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে(!) এদেশের একটি মহলকে এই 'বিশ্বাসে' পাইয়া বসিয়াছে।

অঞ্চলবিশেষের একটি মহলবিশেষ যে কি স্বার্থে এই অপপ্রচারণায় মাতিয়া উঠিয়াছেন তাহা আজ জনসাধারণের কাছে দিবালোকের মতই স্পষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিশেষ মহলটিই যে গত আঠার বৎসর যাবৎ জনগণের স্বহস্তে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিভিন্ন কৌশলে হাতের মুঠায় আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আজ আর কাহারো অজানা নাই। ১৯৪৭ সালে যে গণপরিষদ দশ কোটি পাকিস্তানীর পক্ষে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিল উহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল স্বাধীনতার সনদ শাসনতন্ত্র রচনাকরতঃ তার ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন করিয়া জনগণের কাছে স্বাধীনতা হস্তান্তর করা। কিন্তু তাহা না করিয়া সেই গণপরিষদ উক্ত বিশেষ মহলের শোষণের হাতিয়ার হিসাবে অগণতান্ত্রিক একদলীয় শাসন কায়েম করিতে প্রয়াস পায়। ইহারই প্রতিবাদে ও প্রতিকারার্থে ১৯৪৯ সালে স্বাধীন পাকিস্তানের মাটিতে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসাবে সর্বপ্রথম জন্ম নেয় আওয়ামী লীগ। জবাবে আওয়াজ উঠে 'ছের কুচাল দেঙ্গে' কিন্তু বাস্তবে তাহা সম্ভব হয় নাই। আওয়ামী লীগ তার প্রথম কর্তব্য নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল প্রতিষ্ঠা ও ইহার স্বীকৃতি আদায় করতঃ শুধু বাঁচিয়াই থাকে নাই, বর্তমানে এককভাবে জনগণ রচিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের সংগ্রামে নামিয়াছে। ইহাতে স্বার্থবাদী মহলের নাভিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা যে পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী চক্রের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইবে তাহা ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মুখচেনা স্বার্থবাদী সেই মহলটির স্বার্থের পরিপূরক শাসনতন্ত্রের খসড়া মূলনীতি রিপোর্ট বাহির হয় ১৯৫০ সালে। জনগণ তাহা প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সনের গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন। উক্ত কনভেনশন শাসনতন্ত্রের যে মূলনীতি ঘোষণা করে তাহা জনগণের শাসনতন্ত্র আদায়ের প্রথম পদক্ষেপ এবং উক্ত ঘোষণাকেই আওয়ামী লীগের বর্তমান ৬-দফার উৎস বলা যাইতে পারে। ইহার পর সেই স্বার্থবাদী চক্রটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ১৯৩৫

সালের শাসনতন্ত্রকেই (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাহাকে বিলাতে বসিয়া পাক-ভারত উপমহাদেশকে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিত) আরও কঠিনতর করিয়া করাচীতে বসিয়া ব্যবহার করিতে থাকে। সাত বৎসর পর্যন্ত দেশে সাধারণ নির্বাচন তো দূরের কথা উপ-নির্বাচন পর্যন্ত তাহারা বন্ধ রাখে। অবশেষে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদার প্রধানতম বিধান স্বায়ত্তশাসনের দাবী জনগণের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে। এই কারণেই তৎকালে উক্ত চক্রান্তটি সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়া যুক্তফ্রন্টকে ভাঙ্গিবার চক্রান্তে মাতিয়া উঠে এবং ভাঙ্গিয়াও দেয়। একই কারণে আজ জনসাধারণ মহলবিশেষের দৃষ্টিতে সরাসরি ভোটের অযোগ্য। যুক্তফ্রন্ট সেদিন হয়তো তাহাদের আতঙ্কের মূল কারণ ছিল না, কারণ ছিল ২১ দফার ১৯ নং দফায় বর্ণিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আর ছিল এই দফায় একনিষ্ঠ বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ দল। তাই দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ছাড়া শেরে বাংলা পান বাহবা, আওয়ামী লীগ সঙ্গে থাকিলে তিনি হন 'ট্রেটর'; আবার আওয়ামী লীগ সঙ্গে না থাকিলে 'ট্রেটরই' হন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। আবার যুক্ত থাকিলে যুক্তফ্রন্ট হয় বিশ্বাসঘাতক আর বিযুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঙ্গদলগুলি হয় কমবেশী দেশপ্রেমিক। ২১ দফায় ১৯নং দফার কারণেই হয়ত নিশীথ রাত্রের চক্রান্তে জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হন জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। নেপথ্যে থাকিয়া কলকাঠি ঘুরাইয়া স্বার্থোদ্ধারের কী অপূর্ব তরিকা।

যতদিন সাধারণ নির্বাচনের মারফত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হইবে ততদিন এই বিশেষ চক্রটির সার্থক মোকাবিলা সম্ভব নয় বুঝিতে পারিয়াই জনাব সোহরাওয়ার্দী জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের পরও সেদিন তাঁর প্রশংসা করিয়া তাঁরই পছন্দসই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র যাহাই হউক না কেন, উহা গ্রহণকরতঃ নির্বাচনের মাধ্যমে দশকোটি মানুষকে মঞ্চে না আনিতে পারিলে জনগণের স্বাধীনতাকে রাহুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। বিশেষ চক্রটিরও তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। ফলে নির্বাচনও হইল না আর জনগণও মঞ্চে আসিল না। আসিল "মার্শাল ল"। আপোষে গৃহীত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র তৎভিত্তিক সকল অধিকার ও সরকার বাতিল ঘোষিত হইল। আজ দেশে চলিতেছে জনাব আইয়ুব খান প্রদত্ত "দেশবাসীর মেধার উপযোগী" শাসনতন্ত্র। আমরা নাকি এর বেশী পাওয়ার যোগ্যও নই, আর এর বেশী পাইলে আহম্মকরা নাকি দেশকে

টুকরা টুকরা করিয়া শত্রুকে বিলাইয়া দিবে। কাজেই ইংরেজরা পৌনে দুইশত বৎসর আমাদিগকে 'মানুষ' করিবার চেষ্টা করিয়া যে টুকু বাকী রাখিয়া গিয়াছিলেন কেহ কেহ বহু তকলিফ স্বীকার করিয়া বুঝি তাহাই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং পাকিস্তানের বিগত আঠার বৎসরের ইতিহাস জনগণের ইতিহাস নয়। ইহা চক্রান্ত ও শক্তির মাধ্যমে ইংরেজ প্রণীত ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র ও তৎপরবর্তী যুগে ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রেরই ইতিহাস। এই উভয়বিধ অবস্থার পিছনে থাকিয়া যে গণস্বার্থ-বিরোধী চক্র পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষকে তাহাদের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, সেই চক্রের হাত হইতে জনগণের প্রণীত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে সত্যিকার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারই আজ দেশের দশকোটি মানুষের সমস্যা। একই মুদ্রার পিঠ পরিবর্তন করিয়া এই সমসার সমাধান সম্ভব নয়। আজ সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, উভয় দিকেরই মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাই আজ আওয়ামী লীগের ছয় দফার সমালোচনায় ১৯৩৫ সালর শাসনতন্ত্রের ধারক ও বাহক এবং বর্তমান শাসনতন্ত্রের সমর্থকদের কণ্ঠে একই আওয়াজ। এই ছয় দফার পিছনে যে পূর্ণ গণসমর্থন আছে এবং ইহারই মধ্যে যে জগণের সত্যিকার কল্যাণ নিহিত ইহা তাঁহারা জানে। ছয়দফ-বিরোধী প্রচারণা সুস্থ চিন্তাধারার পরিচায়ক কি-না, সমালোচনাকারীরা নিজেরাই তাহা ভাবিয়া দেখুন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানী যদি পাকিস্তানের অমঙ্গল ঘটাইতে চায় তবে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসিয়া কিম্বা একটি বিশেষ শাসনতন্ত্রের ম্যার-প্যাঁচ দ্বারা কি তাহা রক্ষা করা সম্ভব? বিগত যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তান কি কাহারো উপদেশ বা কোন বিশেষ শাসনতান্ত্রিক বন্ধনের ফলে দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল? ৬-দফার সমালোচনাকারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, ছয় দফায় বর্ণিত ব্যবস্থা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়,–অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে। এই ব্যবস্থা শুধু স্বার্থান্বেষী চক্রের শোষণের পথই বন্ধ করিবে না, পরন্ত বিগত আঠার বৎসরের বঞ্চনা ও শোষণের দ্বারা পাকিস্তানের অঞ্চলে অঞ্চলে, ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ ঘটান হইয়াছে তাহাও দূরীভূত হইবে। আমি আশা করি মুখে তাঁহারা যে পরিমাণ পাকিস্তানদরদ প্রকাশ করেন তার অনুমাত্রও যদি সত্য হয় তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া আওয়ামী লীগ তথা পাকিস্তানের বঞ্চিত ও শোষিত জনগণের ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতে জনগণের ১৮ বৎসর পূর্বে অর্জিত স্বাধীনতাকে স্বার্থান্বেষী মহলের খপ্পর বা হিমাগার হইতে জনগণকে হস্তান্তরিত করিতে তাঁহারা আগাইয়া আসিবেন। আর এই হস্তান্তর পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীর আজিকার এ সংগ্রাম চলিবেই।

কলাম:

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি 'মোসাফির' ছদ্মনামে কলাম লিখতেন। তাঁর এই কলামের শিরোনাম নাম ছিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে 'মোসাফির' ছদ্মনামে তাঁর বেশকিছু কলাম প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' শিরোনামে একটি কলাম প্রকাশিত হয়। এই কলামে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে কায়েম রাখার জন্যই ছয়দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে পাকিস্তানের দুই প্রদেশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দান করার আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

> লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় সম্মেলন এবং এতদসংক্রান্ত শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতি সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমরা বিস্তারিত মন্তব্য করিতে চাই না। তবে তাসখেন্দ ঘোষণা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আমাদের মতামত একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছি এবং তাসখেন্দ ঘোষণার প্রতি আমাদের সমর্থন অপরিবর্তিত রহিয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান বিরোধী দলীয় ঐক্য বিধানের জন্য যে ৬-দফা প্রোগ্রাম পেশ করিয়াছেন, তার কতটুকু অন্যান্য বিরোধীদল গ্রহণ করিতে পারেন কি পারেন না, তাহা নিয়ে বিতর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু সম্মেলনে তাসখেন্দ ঘোষণার উপর যে ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আওয়ামী লীগ তাতে অংশীদার হইলে আমরাই তার বিরোধিতা করিতাম। তদুপরি আজ বিরোধীদলসমূহে সাধারণভাবে যে নিষ্ক্রিয়তা বিরাজমান তার অবসান না হইলে ঐক্য গঠনে বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রসঙ্গতঃ জনগণের ভোটাধিকার ফিরাইয়া না পাইলে নিয়মতান্ত্রিক পথে কোন দলের কোন প্রোগ্রাম কার্যকরী করার সুযোগ নাই। বিরোধী দলসমূহের ঐক্য অনেকের নিকটই কাম্য; কিন্তু মত ও পথের মিল না থাকিলে এবং নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তি উদ্ভাবিত না হইলে বাহ্যতঃ এই ঐক্য গঠন যত সহজ বলিয়াই মনে হউক, আদতে উহা তত সহজ নয়। তাছাড়াও বর্তমান শাসনব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে প্রধান অন্তরায়, তাহাও না বলিয়া পারা যায় না। কেননা, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রোগ্রাম ও কর্মসূচী জনগণের কষ্টি পাথরে যাচাই করার ব্যবস্থা নাই সেখানে কোন দলের প্রোগ্রাম ও কার্যকলাপ জনসমর্থন লাভ করিতেছে কি করিতেছে না, তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কি সরকারী

দল কি বিরোধী দল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মসূচী ও কার্যকলাপকে সঠিক বলিয়া প্রচার করিলে বাধা কোথায়? জনগণের হাতে উহা প্রত্যাখ্যানের কিংবা মিথ্যা প্রমাণের কোন হাতিয়ার তো নাই। বলাবাহুল্য, যে পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রোগ্রামের উপর সরাসরি জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হয়, সে পর্যন্ত দেশের জনমতও সুষ্ঠু পথে প্রবাহিত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হইবে কি হইবে না, সে প্রশ্ন বাদ দিয়াই দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে তাহাই আজ বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে দেশের সাধারণ রাজনীতি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। দেশে ৪৪ মাস সামরিক শাসন প্রচলিত ছিল এবং সেই সময় রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ এবং অপরাধমূলক ছিল। ১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক শাসনের অবসান হইলেও দেশে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল তাতে সাধারণ গণতন্ত্রের প্রচলন হইল না, বরং পরোক্ষ ভোটে বি, ডি সংস্থা-কাম-ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে যে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রচলন করা হইল তাতে গণতন্ত্রের মূলনীতি অর্থাৎ জনগণের সরাসরি ভোটে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান বাতিল করা হইল। এই 'মৌলিক' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহা প্রধানতঃ অর্থ ও অন্যান্য অবৈধ প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইল, তার খবর দেশবাসী তো রাখেনই, ক্ষমতাসীন মহলও রাখেন। প্রসঙ্গতঃ এই সঙ্কুচিত ভোটেও প্রাদেশিক পরিষদের ক্ষমতাসীন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে ব্যর্থ হইলেন; বিরোধী দলেরও এ ব্যাপারে বিজয়ের গৌরব অর্জন করা সম্ভব হইল না–কেননা দলীয় ভিত্তিতে নয়, বহু ক্ষেত্রে অর্থের আনুকূল্যে প্রার্থীরা জয়ী হইলেন। কোন ধরনের রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিরও এই দুর্বলতা রহিয়াছে, কিন্তু জনগণের সরাসরি ভোটের পরিবর্তে সঙ্কুচিত ও পরোক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে সেখানে দুর্নীতি ব্যাপকাকার ধারণ করে, এই পুরানো অভিজ্ঞতাই আমরা নূতনভাবে অর্জন করিয়াছি। পাকিস্তানের ১০ কোটি নাগরিকের মধ্যে যেখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অন্ততঃ ৫ কোটি ভোটার হইতেন সেখানে প্রচলিত 'মৌলিক' গণতন্ত্রের বিধান মতে মাত্র ৮০ হাজার ভোটার দেশের ভাগ্য নির্ণয় করিবার ক্ষমতা লাভ করিলে দুর্নীতি এবং অবৈধ প্রভাব বিস্তারের অবকাশ না থাকিয়া পারে না। তাই দেশে যখন রাজনীতির এবং নির্বাচনের ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করিতেই হইল (এবং স্বাধীন দেশে রাজনীতির প্রচলন না করিয়া উপায়ও নাই) তখন এমনি ব্যবস্থা প্রচলন করা উচিত ছিল না যেখানে নির্বাচনে দুর্নীতি ও অবৈধ প্রভাব অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই ব্যবস্থাধীনে জনমত প্রতিফলিত হইবার উপায় তো নাই-ই, পক্ষান্তরে, এই সঙ্কুচিত ও 'নিয়ন্ত্রিত' গণতন্ত্রের বদৌলতে আজ দেশে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহা ইতিপূর্বেকার

সকল আমলকে ছাপাইয়া গিয়াছে–যে-কোন নিরপেক্ষ মানুষ তাহা স্বীকার করিবেন। আমরা কিছুক্ষণ পূর্বেই বলিয়াছি, কোন ধরনের রাজনীতিই দুর্নীতিমুক্ত হইতে পারেনা। কেননা, সমাজ ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সকল প্রকার চরিত্রের লোক নিয়া গঠিত। কোন রেডিমেড্ বিধান দ্বারা অথবা মন্ত্রবলে মানব চরিত্রের দোষত্রুটি ও স্বার্থপরতা দূর করা যায় না। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু জনমত গঠন করিতে হয় এবং দেশে নিয়মিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে সমাজের গলদ তথা অশুভ শক্তির প্রভাব আস্তে-ধীরে দূর হইতে থাকে। কিন্তু দেশের শাসন-ব্যবস্থায় যেখানে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে না–সেখানে কি সংবাদপত্র, কি রাজনৈতিক দল কাহারও পক্ষে জনমতকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত ও সুসংগঠিত করা সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, এহেন ব্যবস্থায় জনমতের ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য বিরাজ করে এবং করিতেছেও। এই অবস্থায় সুষ্ঠু রাজনীতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আর যেখানে সুষ্ঠু রাজনীতি অনুপস্থিত এবং বিভিন্ন সমস্যার উপর জনমত যাচাই-এর কোন উপায় থাকে না সেখানে রাজনীতিকদের চিন্তাধারাও উগ্রপথে পরিচালিত হইবার আশঙ্কা থাকে। যার যা খুশী বলেন এবং স্বভাবতঃ অনেকেই দায়িত্ব সহকারে আচরণ করেন না। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রদের বিবৃতি-বক্তৃতা কিংবা দলীয় প্রোগ্রাম যদি জনমতের কষ্টি পাথরে বিচারের ব্যবস্থা থাকিত অর্থাৎ জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দলীয় প্রোগ্রাম এবং বিবৃতিবক্তৃতা রচনা করিতে হইত। আর যাঁরা তার ব্যতিক্রম করিতেন, নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যদিয়া তাঁরা সমুচিত শিক্ষা পাইতেন। বস্তুতঃপক্ষে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এই ব্যবস্থারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ভিন্নপথে যাহা করা যায়, তাহা জবরদস্তিমূলক কিংবা দলীয়স্বার্থ বা ব্যক্তিস্বার্থ প্রণোদিত বলিয়াই গণ্য হয়। ইহার পরিণতি কোন দেশের পক্ষেই শুভ হয় নাই। যে-সকল দেশে আজ গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত, সেই সকল দেশেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছিল; সে সকল দেশেও প্রথম দিকে বহু রাজনৈতিক দল ছিল, নানা ধরনের কোন্দল ছিল–এমন কি মারামারি কাটাকাটিরও ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সকল দেশের নাগরিক কিংবা রাজনৈতিক দল কেহই সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। কিন্তু কালক্রমে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে একদিকে যেমনি সুষ্ঠু জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, জনগণের চেতনা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত রাজনৈতিকদলগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যাঁরা সচেষ্ট হইয়াছিলেন, বন্ধুররাষ্ট্র প্রতিবেশী ইন্দোনেশীয়া তাদের

অন্যতম। সুকর্ণের মত স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও জনপ্রিয় নেতা ইন্দোনেশিয়ার 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে গিয়া আজ যে আন্তর্জাতিক খেলার দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হইয়াছেন এবং তথায় গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে তার শেষ কোথায়, কে জানে? আমাদের ঘরের দুয়ারে এই ধরনের অন্যান্য দেশের অবস্থাও কম গুরুতর নয়। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন করেনা।

পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে এই পর্যন্ত শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাধীনে জনমত প্রতিফলিত হইতে পারে নাই, রাজনীতিক দলগুলিও সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে, জনগণের সরাসরি ভোটের পরিবর্তে যে বিকল্প ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, তাতে সর্বত্র স্বার্থের হানাহানি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং সুষ্ঠু রাজনীতির পরিবর্তে বিকৃত উগ্র রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা শুধু কেবল ক্ষমতাসীন দল সম্পর্কেই নয়, বিরোধী দলগুলি সম্পর্কেও একই মত পোষণ করি। কেননা, যেখানে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় জনমত যাচাইয়ের নিয়মিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত, সেখানে দায়িত্ব সহকারে কথাবার্তা বলার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য বিরাজমান থাকায় জনগণও আজ সকলের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছেন। জনমতের এই গুমট অবস্থা কোন জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ কি চলিয়াছে তাহা হইতেও আমাদের চক্ষু মুদিয়া থাকা উচিত নয়। বলা বাহুল্য, জনগণের আস্থা অর্জন করা যে-কোন রাজনৈতিক দলের গর্বের বস্তু এবং শক্তির উৎস। পাকিস্তানের শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আমলেও যখন স্বৈরাচারী ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হইত, তখনও জনমত স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে ৩৫টি উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখা এবং সাধারণ নির্বাচন পিছাইয়া দিবার ব্যাপারে জনমত কি পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়া তার প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া গিয়াছিল। আবার ২ মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা এবং পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এই প্রদেশে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল– তাহাও কাহারও অজানা থাকার কথা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই প্রদেশবাসীর যে অসন্তুষ্টি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করা উচিত নহে। শুধু এই আমলেই নব-রাজনৈতিক আমলেও কেন্দ্র হইতে যখনই এখানে কোন প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বা শিখণ্ডী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিংবা ন্যায্য দাবী দাওয়াকে কদর্য করা হইয়াছে, তখনই এই প্রদেশে জনমত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। কেন্দ্র ও প্রদেশ কিংবা অঞ্চলে অঞ্চলে এই বিরোধ সৃষ্টি করা কোন দেশপ্রেমিকের কাম্য হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের

প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে এবং যিনি যে দাবী উত্থাপন করুন না কেন, তাকে এক কথায় নস্যাৎ করিয়া না দিয়া কিংবা কোন প্রকার দুরভিসন্ধি আরোপ না করিয়া উন্মুক্ত মনে আলাপ-আলোচনা করিয়া সমস্যাদি উপলব্ধি করিতে হইবে ও উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই মনোভাবই কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান করিয়া সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সামরিক শাসন কিংবা 'মৌলিক গণতন্ত্র' ইহার প্রতিকারের পথ নয়। বরং ইহা পরস্পর সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে আরো ঘনীভূত করিবে এবং মানুষের মনে নানা উগ্র চিন্তাধারার জন্ম দিবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আলাদা হইতে চায় এই ভ্রান্ত ধারণা কাহারও পোষণ করা উচিত নয়–বরং যে কোন মহল হইতে এই প্রচারণা চালান হইলে উহা জাতীয় সংহতিরই ক্ষতি সাধন করিবে। প্রসঙ্গতঃ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠিলে কোন কোন মহল ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া হোক কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই হোক, এই ধরনের প্রচারণা শুরু করিয়াছিল যে, ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত এবং ইহা 'যুক্ত বাংলা' গঠনেরই এক দুরভিসন্ধি। এই ভুল বা মতলবী ধারণার বশবর্তী হইয়াই এই প্রদেশের উপর অকথ্য নির্যাতন চালান হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই ভুল ধারণা দূর হইয়াছে এবং বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই নির্যাতনের তিক্ততা আজও মানুষের স্মৃতিপটে জাগরিত।

একটি দেশে মানুষে মানুষে এই ধরনের ভুল ধারণা থাকা কত অবাঞ্ছিত, তাহা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পরেনা। তাই নির্যাতনের পথ নয়, মতের আদান-প্রদান এবং সমঝোতার ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সমস্যা অস্বীকার করিয়া নয়, সমস্যার স্বীকৃতি দিয়াই পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সুবিচার করিতে হইবে। অবশ্য আমরা এই সুবিচার কোন ব্যক্তি বা কোন দল বিশেষের নিকট হইতে প্রত্যাশা করি না। দেশে নিয়মিত গণতন্ত্রের প্রচলন করা হইলেই অর্থাৎ জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়া পাইলেই নিয়মতান্ত্রিক পথে আঞ্চলিক বিরোধসহ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে বলিয়া আমরা দৃঢ় অভিমত পোষণ করি। অন্যথায় বাদানুবাদ বাড়িয়াই চলিবে, হয়ত নির্যাতনও নামিয়া আসিবে। কিন্তু তাতে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা আরও কঠিন আকার ধারণ করিবে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেশে নিয়মিত গণতন্ত্রের প্রচলন করিলে আমরা সকল সমস্যা গোটা পাকিস্তানের নাগরিকদের সুবিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। বর্তমান অস্বস্তিকর পরিবেশ ও রাজনৈতিক বিতণ্ডা অবসানের ইহাই একমাত্র পথ। প্রসঙ্গতঃ শুধু গদির স্বার্থে ক্ষমতার রদবদলের খেলায় আমরা কোনরূপ উৎসাহিত নই।

১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামটিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয়দফা কর্মসূচি প্রণেতাদের বিরুদ্ধে যে ধরনের অপ্রাসঙ্গিক এবং অবাঞ্ছিত কথাবার্তা বলেন তার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, যে সকল পরিকল্পনা কোন পূর্ব পাকিস্তানীর মাথায় ঘূণাক্ষরেও নেই, অহেতুক সেগুলোর অবতারণা না করার জন্য আইয়ুব খানকে পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে পাকিস্তানের উভয় অংশের স্বার্থ ও রাজনৈতিক অধিকার কোন পথে নিশ্চিত করা যায় সেদিকেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের চিন্তা ও কর্মশক্তি নিয়োজিত করার আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৬-দফা কর্মসূচী উত্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা ব্যথিত। দলীয় রাজনীতিতে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা কিংবা মনগড়া অভিযোগ আনয়ন করার নজির এদেশে অবশ্য রহিয়াছে; কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নন, তিনি রাষ্ট্রের প্রধানও বটে। এমতাবস্থায় তিনি যাহা বলেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী।
>
> অবশ্য কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবেই নয়, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবও তিনি যে- কোন দলের কর্মপন্থা বা আচরণের সমালোচনা করিতে পারেন। গণতন্ত্রের এই নীতি অনুসারে তিনি ৬-দফা কর্মসূচীর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিলেও তাকে রীতিনীতিবিরোধী বলা চলে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ সম্পর্কে কুমতলব আরোপ করা বিশেষতঃ তাঁদের দেশপ্রেমের উপর সন্দেহ প্রকাশ করা– বৈদেশিক দুষমনদের নিকট হইতে অর্থ লাভ করার মত গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা নিতান্ত অসঙ্গত ও বেদনাদায়ক। অবশ্য এই ধরনের অভিযোগও এ দেশে নূতন নয়। কিন্তু নূতন না হইলেও ইহার পরিণতি রাষ্ট্রের পক্ষে–বিশেষ করিয়া জাতীয় সংহতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।
>
> প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৬-দফার উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বহু অবাঞ্ছিত কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার এবং 'যুক্ত বাংলা' গঠনের এক ষড়যন্ত্র। তিনি আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, ৬-দফার উদ্যোক্তারা জাতির দুষমনদের নিকট হইতে প্রেরণা ও অর্থ লাভ করিতেছেন। প্রেসিডেন্ট কোন সূত্র হইতে এই ধরনের 'রিপোর্ট' না পাইলে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন না, ইহা যেমনই আমরা বুঝি, তেমনি এহেন 'রিপোর্টের' যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহাতীত না হইয়া কোন রাজনৈতিক দল এমনকি ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধেও এমনি গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনয়ন করা উচিত নয়।

এ দেশে এমন এক শ্রেণীর রাজনীতিক এবং গোপন খবর সরবরাহকারী এজেন্ট রহিয়াছেন যাঁরা অতীতেও ক্ষমতাসীনদের খুশী করার জন্য যে- কোন ধরনের ভুয়া কিংবা জাল রিপোর্ট প্রণয়নে 'পারদর্শিতা' প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দাবাইয়া দিবার জন্য ছাত্রদের উপর গুলী চালনা করাই নয়, ৫ শতাধিক ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীকে গ্রেফতার করাই নয়; ভাষা-আন্দোলনের মধ্যে শত্রুর হস্ত আবিষ্কার, নারায়ণগঞ্জে 'জয়-হিন্দ' ধ্বনি উত্থাপিত হইবার অলীক কাহিনী রচনা করিতেও দ্বিধা করেন নাই; এতটুকু বিবেকের তাড়না অনুভব করেন নাই।

১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রদানের প্রাক্কালে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে যখন নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক করা হয়, তখনও তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশী রাষ্ট্র হইতে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ করা হইয়াছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজ আমাদের মধ্যে নাই, তিনি আমাদের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিবেনও না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যে সূত্র হইতে এই খবর পাইয়াছিলেন, তাঁদের নিকট এক্ষণে তাঁরই জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই পার্থিব জগতে কি বিষয়-সম্পত্তি ও ধনদৌলত রাখিয়া গিয়াছেন? শহীদ সোহরাওয়ার্দী একজন গরীব পরিবারের লোক ছিলেন না; তিনি নিজেও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। তার উপর যদি তিনি আবার বিদেশ হইতেও অর্থ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁর সেই বিপুল অর্থ কোথায়, কিভাবে ব্যয়িত হইয়াছে, সেই অর্থের কি পরিমাণ তিনি কোথায় গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, এই যুগে একটি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী সরকারেরর পক্ষে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন নিকটতম অনুগামী হিসাবে আমরা যাহা দেখিতে পাইয়াছি তাহা হইল যে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর চিকিৎসার জন্য তাঁকে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত দেনা রাখিয়া তিনি এ পৃথিবী হইতে বিদায় নিয়াছেন। মানুষ অমর নয়, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে মত-বিরোধ থাকা অস্বাভাবিক নয় বরং একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত লোকের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সর্বনাশ সাধনের জন্য বিদেশী রাষ্ট্র হইতে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ অপেক্ষা হৃদয়-বিদারক আর কি হইতে পারে। তাই যিনি বা যে সূত্র তাঁর সম্পর্কে এহেন কুৎসিত বানোয়াট অভিযোগ কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করিয়াছিলেন, আজ সেই ব্যক্তিকে বা সে সূত্রকে তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণের জন্য বাধ্য করা, নতুবা কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। যাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বে এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন, তাঁদের ইহাও বিশ্বাস

করা প্রয়োজন যে, মানুষের প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করিতে হইবে। তাই আসুন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবদ্দশায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব না হইলেও অন্ততঃ মৃত্যুর পরে আজ সেই সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা চালাইয়া নিজেদের আত্মা ও বিবেককে সান্ত্বনা দেই। 'যুক্ত বাংলা' গঠনের পরিকল্পনাও অনুরূপ একটি অলীক অভিযোগ। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে এবং ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্ট ব্যাটেন প্লান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হইবার পূর্বে বাংলা বিভাগ রোধকল্পে কায়েদে আজমের সহিত পরামর্শ ও তাঁর অনুমোদনক্রমে দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করিয়া 'বৃহৎ বাংলা' গঠনের এক প্রস্তাব জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত হয় বটে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত বঙ্গীয় পরিষদের উপর বাংলা দেশ পাকিস্তানে না ভারতে যোগদান করিবে অথবা স্বাধীন থাকিবে– সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধানও সন্নিবেশিত করা হয়। কিন্তু সেই 'বৃহৎ বাংলা' পরিকল্পনায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে, এই কারণে কংগ্রেস উহাকে শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করে। সর্দার প্যাটেলের বক্তব্য ছিল যে, যুক্ত বাংলা পরিকল্পনা গোটা বাংলাদেশকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় একটি সুচতুর চাল মাত্র। বৃটিশ গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের শর্ত ছিল যে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস–উভয় দল সম্মত হইলেই বাংলা বিভাগ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিবেন এবং বৃহৎ বাংলা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন–অন্যথায় নয়। আর এই শর্তের সুযোগেই কংগ্রেস সম্মত হইল না এবং 'বৃহৎ বাংলা' পরিকল্পনাও আপনা আপনি পরিত্যক্ত হইল। ইহার পর মাউন্ট ব্যাটেন প্লান বিবেচনার্থ ১৯৪৭ সালের ১০ই জুন দিল্লীতে নিখিল পাকিস্তানের মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'বৃহৎ বাংলার' পরিকল্পনা আদৌ উত্থাপন করেন নাই। লীগ কাউন্সিল সম্মেলনের প্রস্তাবকে তিনি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে 'যুক্ত বাংলার' অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং এই পূর্ব পাকিস্তান হইতে তাঁকে বহিষ্কারও করা হইয়াছিল। বহিষ্কারাদেশের পর ক্ষোভে ও বেদনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করিয়া এই অলীক অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী একদা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন শুধু আপামর দেশবাসী নয়, তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর কত না প্রশংসা করিয়াছেন। আবার তাঁর পরলোক গমনের পরে দেশের উভয় অঞ্চলে এমন উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক ছিলেন না, যিনি তাঁর দেশপ্রেম, কর্মদক্ষতা এবং জাতীয় সংহতিমূলক ভূমিকার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন নাই। আফসোস, আজ তাঁর

মৃত্যুর পরে আবার সেই ভুয়া 'যুক্তবাংলা' পরিকল্পনার সহিত তার নাম যোগ করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য যাই হউক, ইহার দ্বারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার পরিবর্তে বিক্ষুব্ধ করা হয়; ইহা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে! পাকিস্তান অর্জনের পরে কায়েদে আজম এক বৎসর জীবিত ছিলেন। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী যদি পাকিস্তানকে বানচাল করিবার জন্য 'বৃহৎ বাংলা' পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেন তাহা হইলে কায়েদে আজমই তাহা ফাঁস করিয়া দিতেন। এই সৎ সাহস কায়েদে আজমের ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই একজন মৃতব্যক্তি সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া শুনিয়া এই ধরনের মারাত্মক অভিযোগ করা কোন ক্রমেই সমীচীন হইতে পারে না।

জাতির দুর্ভাগ্য যে, পাকিস্তানের মত একটি সমস্যাসংকুল দেশে জাতীয় সমস্যাদির ন্যায়সঙ্গত সমাধানে উৎসাহ প্রদর্শনের পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে মারাত্মক ধরনের অলীক অভিযোগ উত্থাপন করিয়া চলিয়াছেন। ইহার পরিণতির কথা কেহই ভাবিয়া দেখিতেছেন না; এই ধরনের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে আমরা যে একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি, ইহা যে জাতীয় সংহতির উপর আঘাত হানিতেছে–এইটুকু খেয়ালও যেন কাহারো নাই। 'যুক্তবাংলা' গঠনের বদ খেয়াল কাহারও নাই। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজেও বলিতেছেন যে, ভারত 'যুক্তবাংলা' গঠন করিতে দিবে না। তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে অলীক 'যুক্তবাংলা' প্রসঙ্গ নিয়া মাথা ব্যথার কি প্রয়োজন? পাগলা সাঁকো নাড়াইস না– আমাদের অবস্থা যেন সেই পর্যায়ে পৌঁছিতেছে। কংগ্রেস অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের ক্ষেত্রে যে ভুল করিয়াছিল আমরাও যেন অসতর্ক মুহূর্তে সেই ভুলেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটির উল্লেখ ছিল না। উহাতে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে খণ্ডিত করিয়া দুইটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত 'ষ্টেট' গঠনের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব পাস হইবার পরে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও তাদের সমর্থক পত্র-পত্রিকা সোরগোল শুরু করিল যে, ইহাই পাকিস্তান। তৎপর ১৯৪৬ সালের কেবিনেট মিশন প্লানও মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়ই গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস পরবর্তীকালে সমর্থন প্রত্যাহার করে। আবার যখন দেশ বিভাগের প্রস্তাব আসিল তখন বাংলা, পাঞ্জাব ও আসামকে বিভক্ত করিয়া তাঁরা পাকিস্তানকে এমনি পঙ্গু করিয়া দিতে চাহিল যাতে পাকিস্তান পাইলেও উহা টিকিয়া থাকিতে না পারে। কিন্তু তাদের কোন কলা-কৌশল সফল হয় নাই। পাকিস্তান টিকিয়া আছে এবং টিকিয়া থাকিবে। তাই প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিকট আমাদের অনুরোধ, যে-সকল পরিকল্পনা কোন পূর্ব পাকিস্তানীর মাথায় ঘুণাক্ষরেও নাই, অহেতুক সেগুলির যেন অবতারণা করা না হয়। পাকিস্তানের উভয়

অঞ্চলের স্বার্থ ও রাজনৈতিক অধিকার কোন্ পথে নিশ্চিত করা যায় সেদিকেই সকলের চিন্তা ও কর্ম শক্তি নিয়োজিত করা হউক। এই প্রসঙ্গে আমরা আরেকটি কথা বলিব। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে (জনসাধারণের সঙ্গে নয়) পূর্ব পাকিস্তানীদের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এখানকার কোন নেতা পশ্চিম পাকিস্তানী কোন নেতার দেশপ্রেম সম্পর্কেই কটাক্ষ করেন নাই। এমনকি, ১৯৫৯ সালে ভারতের সহিত যুক্ত রক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হইলে তাকে অনেকে ভুল প্রস্তাব বলিয়া মনে করিলেও কাহারও দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় নাই। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কথায় কথায় তাদের নেতাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যেন রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। এই যন্ত্রণাদায়ক ও অসহায় অবস্থার অবসান কবে ঘটিবে?

১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ৬ দফার প্রশ্নে চ্যালেঞ্জ প্রদান করায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয় এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে ছয়দফা প্রশ্নে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জকে সানন্দে গ্রহণ করার জন্য সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, পরিস্থিতি যতই ঘোলাটে করা হোক শীঘ্রই সব কিছুর অবসান ঘটবে। আশা প্রকাশ করা হয় যে, অতীতে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও যেভাবে শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়েছে, ৬-দফাও সেভাবে সন্তোষজনকভাবেই নিষ্পত্তি হবে। এতে লেখা হয়:

'পরিস্থিতি যত ঘোলাটে করা হোক কিংবা জেদাজেদির মনোভাব যতই প্রকট হইয়া উঠুক, অচিরে সব কিছুর অবসান হইবে এবং জাতীয় সমস্যাদিরও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে–এই আশাবাদী মনোভাবই আমরা পোষণ করি। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে এবং পাকিস্তান অর্জনের পরেও আমরা বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি; কোন কোন সময় হতাশায় মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই। মনে করিয়াছি, এই পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইবার কিংবা লক্ষ্যে পৌঁছিবার কোন পথ নাই। ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে বাংলার মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন এবং ইহার প্রত্যক্ষ পরিণতিতে কংগ্রেস-হিন্দুসভার প্রভাব বৃদ্ধি-পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় নৈরাশ্যই সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু মাত্র ১৬ মাসের মধ্যে সে নৈরাশ্য কাটিয়া গিয়াছিল। শুধু নৈরাশ্য কাটিয়া যাওয়া-ই নয়, ১৬ মাসের ঘাত-প্রতিঘাত-সংগ্রাম পাকিস্তান আন্দোলনকে দুর্বার করিয়া তোলার পক্ষে সহায়কই হইয়াছিল। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনকালে নির্যাতনের যে ষ্টিমরোলার চালানো হইয়াছিল এবং বাংলা ভাষার

বিরুদ্ধবাদীরা ইহার মধ্যে 'পাকিস্তান ধ্বংসের' ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতঃ যে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখনও দৃশ্যতঃ একইরূপ নৈরাশ্য বিরাজ করিতেছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে দু মাসের মধ্যে বরখাস্ত করিয়া শেরে বাংলা ফজলুল হককে স্বগৃহে অন্তরীণাবদ্ধ এবং শেখ মুজিবর রহমান ও আইন পরিষদের ত্রিশজন সদস্যসহ তিন সহস্র রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করতঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখার পরেও গণমনে একইরূপ নৈরাশ্য ও হতাশা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই নির্যাতন ভোগ বৃথা যায় নাই। দৃশ্যত: যাকে অনেকেই নৈরাশ্যজনক এবং বৃথা নির্যাতন ভোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কার্যতঃ উহা দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহায়তা করিয়াছে; রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামের প্রেরণা জোগাইয়াছে। ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ ছাড়া গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না, একদিকে এই সত্যকে প্রতিভাত করিয়াছে; অপর দিকে যাঁরা গণদাবীর বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁদেরকেও দায়ে ঠেকিয়া হোক কিংবা সুবুদ্ধি উদয়ের দরুনই হোক, গণদাবীকে মানিয়া লইতে হইয়াছে।

তাই ১৯৪১ সালের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের চূড়ান্ত সুফল আমরা লাভ করিয়াছিলাম ১৯৪৬ সালের পাকিস্তান ইস্যুর উপর অনুষ্ঠিত নির্বাচন যেখানে আজিকার পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ গো-হারা হারিয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; যেখানে সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগ মাত্র এক ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছিল; যেখানে পাঞ্জাবে শিখ ও ইউনিয়নিষ্টদের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব না হওয়ায় মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হইয়াছিল–সেস্থলে বাংলাদেশে শতকরা ৯৬টি মুসলিম আসন দখল করায় শুধু এই প্রদেশেই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হইল তাই নয়, এই প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফলের প্রত্যক্ষ সুফল হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানও পাকিস্তানভুক্ত হইতে পারিল। একইভাবে লক্ষ্যণীয়, ১৯৫২ সাল এবং ১৯৫৪ সালের নির্যাতন ভোগ ও সংগ্রামের ফলেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হইল, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীও বহুলাংশে সেই শাসনতন্ত্রে স্থান লাভ করিল। যুক্ত নির্বাচন প্রথা নিয়া কায়েমী স্বার্থী মহল কিছুটা ছক্কা-পাঞ্জা খেলার প্রয়াস পাইল; কিন্তু ১৯৫৭ সালে যুক্ত নির্বাচন বিধিও স্বীকৃতি লাভ করিল। এদেশের রাজনীতির সহিত যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিরাশ হইবার কিছু নাই। সামরিক শাসন বলবৎ থাকাকালে ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রদানের প্রাক্কালে জনাব সোহরাওয়ার্দীসহ ছাত্র ও রাজনীতিকদের উপর যে নির্যাতন, অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আজও যার জের চলিয়াছে

তাও বৃথা যাইবেনা–এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। এখানে ইহা উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, কংগ্রেসের 'লৌহ-মানব' সর্দার প্যাটেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পূর্বেও ঘোষণা করিয়াছিলেন: Heaven may fall, Earth may burst but we are not going to accept Pakistan; (অর্থাৎ, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, ধরণী বিধ্বস্ত হইতে পারে কিন্তু তথাপি আমরা কিছুতেই পাকিস্তান মানিয়া নিব না)।

যাই হোক, পূর্ব বর্ণিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে মিঃ ভুট্টোর বিবৃতি-বক্তৃতা অন্ততঃ এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। অন্য কোন বিষয়ে মিঃ ভুট্টোর ব্যুৎপত্তি ও অগাধ জ্ঞান থাকিতে পারে; কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকা কিংবা উহার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে কাহারো নিকট হইতে এই প্রদেশবাসীর শিক্ষা গ্রহণের কিছু নাই। তবে ছয় দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে উহার উদ্যোক্তাদের সহিত বাহেস করার খেয়াল ভুট্টো সাহেবের কেন হইল, জানি না। প্রগতির মার্কা-আঁটা কোন টেণ্ডলের স্তাবকতা ও উস্কানিতে তিনি পড়িয়াছেন কি-না, তাও জানি না। তবে তাঁর প্রস্তাব যদি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয় তাহা হইলে তাঁর প্রতি আমাদের সমর্থন দিতে আপত্তি নাই। এই ঢাকার পল্টন ময়দানেই অবিলম্বে অনুরূপ বাহেস-সভার আয়োজন করা যাইতে পারে। মিঃ ভুট্টোও ছয়দফা প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের পক্ষ হইতে যৌথভাবে এই সভা আহ্বান করা হইবে এবং পুলিস বেষ্টনী ও উত্তেজনাবর্জিত পরিবেশে উভয়পক্ষের বক্তব্য জনগণের নিকট উত্থাপিত হইবে–ইহাই যদি মিঃ ভুট্টোর প্রস্তাব হয় তাহা হইলে ইহাকে আমরা গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, এই পথও জনমত যাচাইয়ের একটি পথ। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আছে, 'আম্পায়ার' হইবেন কে এবং এই সম্পর্কে যদি ৬-দফার অনুকূলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমর্থন পাওয়া যায় তা'হলে ৬-দফা গ্রহণ করা হইবে কি-না তার নিশ্চয়তা কে দিবে? তাই এই ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠান করাই সুষ্ঠু ও গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলিয়া আমরা মনে করি। গণভোট অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে উভয় পক্ষই জনগণের নিকট তাঁদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ পাইবেন, সেখানে কাহারো পক্ষে গণ্ডগোল সৃষ্টির কিংবা ইস্যু অমীমাংসিত রাখা সম্ভব হইবে না। ভুট্টো সাহেবের 'চ্যালেঞ্জ' হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জনগণের উপর আস্থাশীল, তাহা হইলে 'বাহেস' অনুষ্ঠানের পরিবর্তে গণভোট অনুষ্ঠানই বাঞ্ছনীয়; কেননা, শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যালটের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ফলাফল জানিবার সুযোগ মিলিবে।

এই লেখা শেষ করিবার পূর্বে আমাদের একটি জরুরী বক্তব্য আছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গত পরশু কনভেনশন লীগ কাউন্সিলের

সভায় জাতিকে 'গৃহযুদ্ধের' জন্য প্রস্তুত থাকার যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাকে আমরা একান্ত অপ্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত পরিতাপজনক বলিয়া মনে করি। এই প্রসঙ্গে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের যে নজির উত্থাপন করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। পাকিস্তানে আজ যাহা নিয়া রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইল জনগণের ভোটাধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য অবসানের জন্য কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইহার মধ্যে এক অঞ্চল অপরাঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আভাস-ইঙ্গিতও নাই। বরং ভৌগোলিক-বিচ্ছিন্ন উভয় অঞ্চলকে অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া পাকিস্তানকে অধিকতর শক্তিশালী করার সদিচ্ছাই প্রকাশ পায়। যে মুষ্টিমেয় পরিবার পাকিস্তানের অর্থনীতি তথা ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্স-পুঁজির উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করিয়াছেন তাঁদের পক্ষে 'দুনিয়া গেল, 'পাকিস্তান ধ্বংস' হইল বলিয়া চীৎকার করা স্বাভাবিক হইতে পারে; কিন্তু যাঁরা পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের জনগণের কল্যাণ, সমতা এবং উন্নয়নে বিশ্বাস করেন তাঁদের পক্ষে বিচলিত হইবার কোন কারণই আমরা দেখি না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলিয়াছেন এবং আমরাও বিশ্বাস করি যে, 'গৃহযুদ্ধ' এক মারাত্মক ব্যাপার। পাকিস্তানে 'গৃহযুদ্ধ' সংঘটিত হইতে পারে–এ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বর্তমান সংগ্রাম বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সংগ্রাম নয়, এক অঞ্চল কর্তৃক অন্য অঞ্চলের বিরুদ্ধেও এ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রাম বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এই নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে রক্তপাত বা গৃহযুদ্ধের আশংকা কোথায়? একমাত্র কায়েমী-স্বার্থীরা শেষ রক্ষার জন্য এহেন উস্কানি দিতে পারেন। কিন্তু সজাগ-সচেতন এই অঞ্চলে তাও ব্যর্থ হইবে– এই আশ্বাস আমরা সকলকে দিতে পারি। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে; নিয়মতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্রে গণঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। নগণ্য সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী, কায়েমী স্বার্থীরা গণদাবী ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে 'ভিন্ন পথের' কথা চিন্তা করিতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ এ ধরনের আগুন নিয়া খেলা বরদাশত করিবে না।

পক্ষান্তরে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে–এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইলে উহা দুশমনদের হস্তে পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারণা চালাইবার 'গোলাবারুদ' তুলিয়া দিবার সামিল কি-না, অতি বিনীতভাবে সংশ্লিষ্ট মহলের নিকট আমরা সেই প্রশ্নই উত্থাপন করিতে চাই। আমাদের তরফ থেকে বলিতে পারি, এইরূপ অবস্থা আমরা কল্পনাও করি না; বরং আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী যে, অতীতে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া প্রচণ্ড বিরোধিতার

সম্মুখীন হইয়াও যেরূপে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়ার ভিত্তিতে সমাধান হইয়াছে, ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আজিকার বিরোধিতাও সেইরূপ একই পথে সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

১৯৬৬ সালের ৭ এপ্রিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে 'মর্নিং নিউজ' এর সম্পাদক মি. সুলেরীর লেখা একটি প্রবন্ধের সমালোচনামূলক জবাব দেওয়া হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারি ধরনের শাসন ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নীতিও গৃহীত হয়েছিল এবং পূর্ণাঙ্গ না হলেও যথেষ্ট পরিমাণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল। তাই যে কোন ধরনের ছেলেমানুষী যুক্তি, অসার এবং উদ্ভট কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য মি. সুলেরীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

> দশ দিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়া গত পরশু সন্ধ্যায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে–বিশেষতঃ রক্তের চাপ সম্পর্কে মনে যে সংশয় দেখা দিয়াছিল, স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সে আশংকা কাটিয়া গিয়াছে; খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হইবে না বলিয়া ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ হাসপাতালে অবস্থানকাল ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্যের নিকট হইতে যে যত্ন পাইয়াছি, এই সুযোগে তাঁদেরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের মত গণ-জীবনের সমস্যাদি সমাধানের প্রশ্নে মত-পার্থক্য কিংবা পরস্পর সন্দেহ-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে জনমত যাচাইয়ের মধ্য দিয়া সঠিক অবস্থা নির্ধারণপূর্বক উহার প্রতিকার বিধান করাই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের দেশে এই সোজা পথের পরিবর্তে আঁকা-বাঁকা পথ অবলম্বনের প্রবণতা যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাতে জাতীয় জীবনে সমস্যাদির সমাধান তো সম্ভব হইতেছে না; বরং বিরোধ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন ব্যাধিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মানুষের চলার পথে অহেতুক রোড-ব্লক সৃষ্টি করা হইলে আপাততঃ তার গতি বিঘ্নিত হইতে পারে; কিন্তু অনাদিকাল হইতে মানুষ যেখানে হিংস্র বাঘ, ভল্লুক, সিংহের মোকাবিলা করিয়া বন্য অঞ্চলকে মানুষের আবাসস্থানে পরিণত করিয়াছে, সেখানে আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মানুষের স্বাভাবিক গতিপথে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টির কোন অর্থই হয় না। বরং এই বাধা-বিঘ্ন মানুষের আগাইয়া চলার সংকল্পকে আরও দৃঢ় ও অপরাজেয় করিয়া তোলে।
>
> হাসপাতালে অবস্থানকালে আমার দুইজন বিশিষ্ট বন্ধুর ভাষ্য পাঠ করিয়া আমি মনঃপীড়া ভোগ করিয়াছি। রাজনীতিতে তথা দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মত ও পথের পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক

নয়, অবাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু যে দুইজন বন্ধুকে পাকিস্তানের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমরা বিশিষ্ট স্থান দিয়া আসিয়াছি, তাঁদের লেখনী কিংবা বক্তব্যের মধ্যে সত্যের অপলাপ কিংবা আবোল-তাবোল কথাবার্তার অবতারণা হইতে দেখিলে তাতে ব্যথিত না হইয়া উপায় নাই। এই দুইজন বন্ধু হইলেন 'ডনের' প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমানে পাকিস্তানের শিল্প মন্ত্রী মিঃ আলতাফ হোসেন ও মিঃ জেড, এ, সুলেরী।

গত ৩১শে মার্চ তারিখের 'মর্নিং নিউজে মিঃ সুলেরী 'শক্তিশালী' কেন্দ্রের পক্ষে 'Anatomy for strong centre' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের সকল বিষয়বস্তু লইয়া এই মুহূর্তে আলোচনার ইচ্ছাও নাই, সুযোগও নাই। মিঃ সুলেরী আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত সংখ্যা সাম্য মানিয়া নিয়া জাতীয় সংহতি এবং স্থিতিশীলতার প্রতি তাঁদের ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ব পাকিস্তানীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে গিয়া মিঃ সুলেরী বলিয়াছেন যে, কলিকাতার ঘটনাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করার কারণেই তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের ভাইলরয় লর্ড ওয়াভেল ভারত বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর নাই বলিয়া মনঃস্থির করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রশংসা করার জন্য মিঃ সুলেরীকে অশেষ ধন্যবাদ। এ প্রসঙ্গে তাঁকে আর একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ৭২ জন সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানের প্রথম গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা ছিল ৪৪, আর পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ-মিলিয়া হিস্যা ছিল ২৮। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান তার কোটা হইতে পশ্চিম পাকিস্তান অবস্থানকারী ৬ জন অবাঙ্গালীকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছিল। যে সার্বভৌম গণ-পরিষদ মেয়ে লোককে পুরুষ আর পুরুষকে মেয়েলোক করা ছাড়া সব কিছুই ভোটের জোরে অর্জন করিতে পারিত, সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে নিজেদের কোটা হইতে অপর অঞ্চলের ৬-জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা কম উদারতা ও ত্যাগের নিদর্শন নয়।

যাই হোক, মিঃ সুলেরীর প্রবন্ধে যাহা আমাদের নিকট 'ধোঁকামূলক' বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর তাঁর মন্তব্য। এবং যেহেতু তিনি এই প্রসঙ্গে ইত্তেফাক সম্পাদকের বক্তব্যকে বিকৃত করিয়াছেন, সেই কারণে উহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ সুলেরী বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনাকালে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় এবং সেখানেই উহা চূড়ান্ত যবনিকাপাত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: "Actually the question of provincial autonomy has long been disposed of As Mr. Tafazzal Hossain, Editor

"Ittefaq," rightly points out Mr. Mujib's six-points are no new doctrine but spring from 21-point programme whose popularity was vindicated by 1954 elections in which the rulling party was completely routed." [বঙ্গানুবাদ: "প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটির ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। কারণ, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক মিঃ তফাজ্জল হোসেন যথার্থই বলিয়াছেন যে, শেখ মুজিবের ৬-দফা কোন নূতন রাজনৈতিক মতবাদ নহে; বস্তুতঃ, ২১-দফা হইতেই ইহার উৎপত্তি; এবং বিগত ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের শোচনীয় ও চূড়ান্ত পরাজয়ের ভিতর দিয়াই এই ২১-দফার জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হইয়াছিল।" মিঃ সুলেরী আলোচ্য-প্রবন্ধে আরও কতিপয় ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি গণ-পরিষদে যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধি গ্রহণে অসম্মত হন, মিঃ গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পর পূর্ব পাকিস্তানকে গণ-পরিষদে পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। মিঃ গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দিনকে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাস স্বৈরাচারীপন্থায় প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে বরখাস্ত করেন। আর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয় ১৯৫৪ সালর মার্চ মাসে। এই ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য মিঃ সুলেরীর স্মৃতি-বিভ্রাট দায়ী না। মিঃ গোলাম মোহম্মদের 'উদারতা' প্রমাণের জন্য ইহার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহার পর মিঃ সুলেরী বলিয়াছেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল কৃষক-শ্রমিক পার্টি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনা করেন। সেই শাসনতন্ত্রে আওয়ামী লীগ স্বাক্ষর প্রদান করিতে অসম্মত হইলেও পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে উক্ত শাসনতন্ত্রকে তাঁরাও গ্রহণ করেন। এই 'তথ্য' পরিবেশন করিয়াই মিঃ সুলেরী নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন;

Therefore, as issue of provincial autonomy raised by Mr. Mujib is not, as Mr, Tafazzal Hossain says, new, neither can it be raised now having been fully dealt with and disposed of by a body which represented both the sections of the triumphant 1954. Jugto Front which fathered the 21-points."

বঙ্গানুবাদ: "কাজেই, মিঃ মুজিব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, মিঃ তফাজ্জল হোসেনের মতে তা' নূতন নহে; এবং যেহেতু ২১-দফার জনক এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ীর মুকুটধারী যুক্তফ্রন্টের উভয় দল কর্তৃক প্রশ্নটির চূড়ান্ত ফয়সালা হইয়া গিয়াছে, সে কারণে এক্ষণে নূতনভাবে প্রশ্নটি আর উত্থাপিত হইতে পারে না।"

মিঃ সুলেরীর এই মন্তব্য পাঠ করিয়া মাথায় হাত দিয়া ঠাঁয় বসিয়া পড়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে তার সহিত আমাদের অনেক সময়ই মতের মিল হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে মিঃ সুলেরীকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা এই ধরনের বক্তব্যের বিকৃতি করা কিংবা ছেলেমানুষী যুক্তি উত্থাপন করিতে দেখি নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁকে মাত্র একটি প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট : ১৯৫৬ সালের সেই শাসনতন্ত্র কোথায়? আজ তার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব আছে কি? সুতরাং যে শাসনতন্ত্রের অস্তিত্বকেই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে সেই শাসনতন্ত্রে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার মর্মানুসারে স্বায়ত্তশাসনের দাবী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং সেইহেতু উহা পুনরায় উত্থাপনের প্রশ্ন নাই–এইরূপ যুক্তি মিঃ সুলেরীর মত সুস্থ প্রকৃতির লোকের পক্ষে খাড়া করা কিরূপে সম্ভব হইল, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দেশবাসীকে নিরেট বোকা না ঠাওরাইলে কিংবা তাদের স্মৃতিশক্তির প্রতি অনাস্থা না থাকিলে অথবা নিজের মতিভ্রম না ঘটিলে এই ধরনের উদ্ভট অসার কথা-বার্তায় অবতারণা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী ধরনের শাসনব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নীতিও গৃহীত হইয়াছিল এবং পূর্ণাঙ্গ না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইয়াছিল–একথা আমরা বহুবার স্বীকার করিয়াছি। উক্ত শাসনতন্ত্রে ২১-দফা মাফিক পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করার দরুনই আওয়ামী লীগ উক্ত শাসনতন্ত্রে সহি প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে বলিয়াই পরবর্তীকালে উক্ত শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া যাইবার আগ্রহেই উক্ত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে কাজ করিতে সম্মত হয়। তাঁদের শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জননিরাপত্তা আইনের নিয়মিত মৃত্যু ঘটে। তাঁদের শাসন আমলে একজন রাজনৈতিক কর্মীকেও গ্রেফতার বা বিনা বিচারে আটক করা হয় নাই। সেই শাসন আমলেই শিল্প ও অন্যান্য বহু বিষয়ের কর্তৃত্ব কার্যতঃ প্রদেশের বিকট হস্তান্তরিত করা হয়। এই হস্তান্তরের ভিত্তিতেই 'ওয়াপদা', আই, ডব্লু, টি এ'।

১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ছয়দফা প্রশ্নে ঢাকায় এক মোকাবেলা সভার আয়োজন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এই মোসাফির কলামে লেখা হয়:

ভুট্টো সাহেব ভালই করিয়াছেন। দুষ্ট লোকেরা যাহাই বলুক, শেষ পর্যন্ত তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। অবশ্য দুষ্ট লোকেরা বলিবে যে, এবার তিনি যখন ঢাকায় আসিয়া শেখ মুজিবরের সহিত ছয় দফার উপর কনফ্রন্টেশনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন- বিশেষ করিয়া শেখ মুজিব কর্তৃক গত ১৩ই এপ্রিল তাঁর প্রস্তাব গ্রহণের পর তিনি ২৪শে'র স্থলে ১৭ই এপ্রিল 'মোকাবিলা সভা' অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছিলেন তখন ইহা সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, তিনি সময়ের সংক্ষিপ্ততা এবং 'আইন ও শৃংখলা' প্রভৃতির প্রশ্নে নিজ দলীয় সংশ্লিষ্ট লোকজনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াই এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শেখ মুজিবই বরং মিঃ ভুট্টো নির্ধারিত ১৭ই তারিখ সম্পর্কে সঙ্গত ওজর দেখাইতে পারিতেন। কেননা, বহুপূর্বে ঐ তারিখে তাঁর মফস্বল প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা হইয়াছিল। তথাপি ভুট্টো সাহেবের সুবিধার জন্যই তিনি ১৫/১৬ই তারিখের মফস্বল প্রোগ্রাম পালন করতঃ ১৭ই তারিখে খুলনার প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া হইলেও ঢাকায় জনাব ভুট্টোর সহিত মোকাবিলা সভায় উপস্থিত থাকিতে সম্মত হন। সুতরাং 'মোকাবিলা সভার' প্রশ্ন নিয়া এতদূর অগ্রসর হইবার পরে গতকল্য সাড়ে বারটায় যে অজুহাতে তিনি প্রস্তাবিত মোকাবিলা সভা অনুষ্ঠানে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেকের নিকটই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে না।

অবশ্য এই জন্য আমরা মিঃ ভুট্টোকে বেশী দোষারোপ করিতে চাই না। তিনি হয়ত ছয়-দফা প্রোগ্রাম রাজনৈতিক সমস্যা বিধায় সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উহাকে 'রাজনৈতিক পর্যায়ে' মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর ফ্যাসাদ হইল যে, তিনি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষতঃ ছয় দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিফহাল নন। এই প্রদেশের তাঁর সহযোগীরা ছয় দফাকে যেভাবে ফুৎকারে উড়াইয়া দেন তাহা হইতেই হয়ত তাঁর ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ছয় দফার বিপক্ষেই জনমত প্রবল এবং একজন নামকরা বাগ্মী হিসাবে তিনি 'মোকাবিলা সভায়' শেখ মুজিবকে সহজেই পরাজিত করিয়া এক অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হইবেন। মিঃ ভুট্টো একজন ভাল বক্তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত হন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনীত প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল হইলেও রাজনীতিতে তিনি নূতন। তিনি যদি এদেশের রাজনীতির খবর রাখিতেন তাহা হইলে এই অঞ্চলে তাঁর সহকর্মীরা জনমত সম্পর্কে যাহাই বলুন না কেন, তিনি নিজে স্মরণ রাখিতেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার অধিবাসীরাই কার্যকরীভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তিনি স্মরণ রাখিতেন যে, এই অঞ্চলের জনগণ ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই ক্ষমতাসীনদের অন্ধ স্তাবকতা করে না। তাই ১৯৪৯

সালে যখন মুসলিম লীগ কেন্দ্র ও প্রদেশে সর্বত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেই সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর টাঙ্গাইলের প্রথম উপনির্বাচনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী জনাব শামসুল হক দোর্দণ্ড প্রতাপ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীকে পরাজিত করেন এবং সেই পরাজয়ের পর মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আর বিরোধী দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে সাহসী না হওয়ায় আইন পরিষদের ৩৫টি উপ-নির্বাচন স্থগিত থাকে। তিনি স্মরণ রাখিতেন যে, ১৯৫০ সালে লিয়াকত বি,পি,সি রিপোর্ট প্রকাশ হইবার পর এই প্রদেশ হইতেই উহার তুমুল বিরোধিতা করা হয় এবং একটি সর্বদলীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠান করিয়া যে বিকল্প বি,পি,সি প্রস্তাব রচিত হয় তারও প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই ছিল যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রধান কর্মসূচী। সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট শতকরা ৯৭টি আসন দখল করিয়াছিল, একথাও মিঃ ভুট্টোর মনে পড়িত। তাঁর মনে পড়িত, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কথা। আজও পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন রাজনৈতিক দল নাই যাঁরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিতেছেন। এমনকি কনভেনশন লীগকেও (অন্তত:মুখে) বলিতে হইতেছে যে, বর্তমানে পূর্বাপেক্ষ অধিক স্বায়ত্তশাসন এই অঞ্চল ভোগ করে। [যদিও ইহা সত্য নয়, কেননা প্রচলিত প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; বর্তমানে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা সেখানে নাই এবং গভর্নর ও মন্ত্রীরা কেহই জনগণ এমনকি আইন পরিষদের নিকটও দায়ী নন।] এমতাবস্থায় এদেশের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষত: এই অঞ্চলের দাবী-দাওয়া ও জনমত সম্পর্কে ভুট্টো সাহেবের যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকতি তাহা হইলে কস্মিনকালেও তিনি ছয়-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর কিছুতেই 'বাজী' রাখিতে পারিতেন না। তাঁর অজ্ঞতাপ্রসূত চ্যালেঞ্জের তাই স্বাভাবিক পরিণতিই ঘটিয়াছে।

এবার মিঃ ভুট্টো ঢাকা পৌঁছিয়া আবার 'মোকাবিলা সভার' প্রস্তাব দিলে আমরা অবাক বনিয়া গিয়াছিলাম। ভাবিতে ছিলাম যে, রাজনীতিকরা–বিশেষতঃ ক্ষমতাসীনরা নিজেদের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কিংবা অন্য যে-কোন বিষয় সম্পর্কে মুখে যত বাগাড়ম্বর করুন না কেন, প্রকৃত অবস্থা রিপোর্ট করার জন্য যে-সকল সরকারী ইনটেলিজেন্স সার্ভিস রহিয়াছে তাঁরা আজকাল করেন কি? রাজনৈতিক আমলে দেখিয়াছি তিনটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস যথা– মিলিটারী ইনটেলিজেন্স, সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ও প্রাদেশিক ইনটেলিজেন্স দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত 'গোপন রিপোর্ট' প্রেরণ

করিতেন। আর্মি ইনটেলিজেন্স রিপোর্টের অন্তত: শতকরা ৯০ ভাগ এবং সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের রিপোর্টের শতকরা ৬০/৭০ ভাগ প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন করিত। এ-ব্যাপারে আমার কিছুটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। একমাত্র প্রাদেশিক ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট অনেকটা ধামাধরা গোছের হইত এবং তারও কারণ ছিল যে, প্রাদেশিক সরকারকে তাঁহারা চটাইতে চাইতেন না। তাই রাজনৈতিক আমলে অন্তত: এই সকল গোপন সূত্রের মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার সুযোগ ছিল। আজ তার কি হইল সেই প্রশ্নই আমাদের মনে আসিতেছে। অবশ্য বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এবং অধস্তন ব্যক্তিদের পক্ষে সেই রিপোর্ট দেখিবার সুযোগ আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে এবং তাদের মনোভাব জানার আগ্রহ আছে তাঁরা জানেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনমত কত প্রবল। আওয়ামী লীগ বিশেষ সতর্কতার সহিত দাবী করিয়াছে যে, অন্যূন ৭০% উহার অনুকূলে। কিন্তু আমাদের ধারণা, স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে এই অঞ্চলের শতকরা পাঁচজন লোকও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে ভোট প্রদান করিবে না। যাঁরা অবশ্য জনগণের ধারে-কাছে যান না কিংবা জনমত গ্রহণে সাহসী হন না, তাঁদের মুখে লাগাম টানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে জনমত প্রতিফলনের ব্যবস্থা যেখানে নাই সেই বিচিত্র অবস্থায় যে-কেহ জনগণের সোল এজেন্ট সাজিলে তাকে কে বাধা দিতে পারে! এই বিচিত্র ব্যবস্থাধীনে কার্টেল তথা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অর্থে পরিচালিত কোন কোন পত্রিকা পর্যন্ত বামপন্থী বনিতে পারে, তাদের লেখনি এবং তাদের সংবাদ পরিবেশনের ভাবখানা যেন এই যে, যে-কোন মুহূর্তেই তারা এদেশে 'বিপ্লব' ঘটাইয়া চীনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিতে উদ্যত; শুধুমাত্র মার্কিন ঘেঁষা এক আধটি 'দালাল' পত্রিকা যেন তাদের 'বিপ্লব' ঠেকাইয়া রাখিতেছে। জনগণকে নিয়া এত রঙ-বেরঙের খেলা করার 'সৌভাগ্য' আর কোন দেশের হইবে কি না সন্দেহ।

তবে ভুট্টো সাহেব জ্ঞানী-গুণী লোক এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে বলিয়াও তিনি প্রকাশ করেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে তিনি তাঁর দলীয় কর্তাব্যক্তিদের বুঝাইবেন যে, একটি দেশের জনমত তথা দাবী-দাওয়া লইয়া বেশী খেলা করিলে দেশের সমস্যা বাড়ে বই কমে না। তিনি যে রাজনৈতিক পথে ছয়দফার মোকবিলা করিবার পক্ষপাতী সেই সর্বজনস্বীকৃত রাজনৈতিক পথেই আমরাও ছয় দফা সহ দেশের সকল সমস্যার সমাধানে প্রস্তুত। এই গণতান্ত্রিক পথেই আঞ্চলিক বিরোধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা–সব কিছুর সমাধান করিয়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করিয়া তোলা সম্ভব। মিছা বাগাড়ম্বর কিংবা প্রকৃত অবস্থাকে চাপা দিয়া অযথা কণ্ঠরোধ ও নির্যাতনের আশ্রয়

নিয়া কোন লাভ নাই, বরং তিক্ততা ও বিরোধ বাড়িয়াই চলিবে। পরিশেষে সমস্যার সমাধান যে পক্ষেই হউক, পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ভুট্টো সাহেবের অন্তত: অজ্ঞতা না থাকে আমরা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে চাই। কেননা, এই ধরনের অজ্ঞতা এ-দেশের বহু অনর্থ ঘটাইয়াছে। এই অজ্ঞতার দরুনই এই অঞ্চলের বশংবদদের উস্কানিতে শ্রদ্ধেয় নেতা শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং অন্যান্য নির্যাতিত নেতাকে 'বৈদেশিক চর' আখ্যায়িত করা হইয়াছে; বশংবদদের ভরসাতেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে বিদেশ হইতে টাকা গ্রহণের অপবাদ দিয়া গ্রেফতার করা হইয়াছিল এবং আশা করা হইতেছিল যে, তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইলে এ অঞ্চলে একটি কুকুরও ঘেউ করিয়া উঠিবেনা। একটি দেশের এক অঞ্চল সম্পর্কে অন্য অঞ্চলের কর্তাব্যক্তিদের এত অজ্ঞ থাকার পরিণতিই আজও আমরা ভোগ করিতেছি। সর্বাগ্রে এই অজ্ঞতার অবসান চাই।

১৯৬৬ সালের ১৯ এপ্রিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জনমত সম্পর্কে মোকাবেলা সভার হাস্যকর পরিস্থিতির পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই মোসাফির কলামে লেখা হয়:

সেদিন মুজিব-ভুট্টো 'মোকাবিলা সভা' প্রসঙ্গে ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর জনমত সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর অজ্ঞতার উপর মন্তব্য করার কালে বিভিন্ন সরকারী ইনটেলিজেন্সের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই আলোচনায় রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা, দেশরক্ষা সংক্রান্ত কোন গোপন তথ্যের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। জনমত সম্পর্কিত সেই আলোচনায় দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে জনমতের কথাই তোলা হইয়াছিল। বক্তব্যের মূল কথা ছিল যে, রাজনৈতিক আমলের ক্ষমতাসীনরা একমাত্র নিজ দলীয় লোকজনদের কথাবার্তা ও রিপোর্টের উপরই নির্ভর করিতেন না, শাসনযান্ত্রিক সূত্র হইতেও বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে জনমত সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল। আর জনমত সম্পর্কিত এই সরকারী রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ক্ষমতাসীন মহলের আলোচনা করা কিংবা উহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা অপরাধের কিছু তো নয়ই, বরং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে-কোন ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তির পক্ষে উহা নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু ঢাকায় একটি নূতন বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত এক পত্রে ইহাকে "গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন" বলিয়া অভিহিত করিয়া উক্ত তথ্য প্রকাশ করার জন্য মোসাফিরের প্রতি কটাক্ষ এবং রাজনৈতিক আমলের নিন্দা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে: "তথাকথিত রাজনৈতিক আমলে গোষ্ঠী রাজনীতি

রাষ্ট্র জীবনের কতদূর পর্যন্ত ডালপালা বিস্তার করিয়াছিল, জনাব মোসাফিরের স্বীকৃতি তাহারই স্বাক্ষর বহন করে।" ভাগ্যি, সহযোগীর পৃষ্ঠায় এই মর্মে অভিযোগ করা হয় নাই যে, আজ দেশের জনসাধারণের সরাসরি ভোটাধিকার পর্যন্ত নাই, তজ্জন্যও 'মোসাফিরের' এই আচরণ দায়ী। প্রথমে সহযোগীকে অতি সংক্ষেপে বলিতে চাই যে, তাঁর পূর্ববর্তীরা এই দেশের রাজনীতিকে ঘোলাটে করিয়া জনগণের দাবী-দাওয়া নস্যাৎ করিবার জন্য এই ধরনের সফল অস্ত্র ব্যবহার করিয়াও যেখানে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেখানে 'চায়ের কাপে ঝড়' সৃষ্টি করিয়া সেই একই "গোষ্ঠীভুক্ত' বাংলা সহযোগীর সুবিধা করিবার সম্ভাবনা নাই। বরং নিজের আসল ভূমিকাটি দেশবাসীর নিকট নিজেই ফাঁস করিয়া দিলেন। জনমত সম্পর্কে সরকারী-বেসরকারী সূত্রে রিপোর্ট সংগ্রহ করা যে কোন সরকারের পক্ষে– বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম যে, আজকালকার মন্ত্রীদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা জনমত সম্পর্কিত ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট দেখিবার সুযোগ রহিয়াছে কি না। এই প্রশ্ন তুলিয়া আমরা কি 'অপরাধ' করিয়াছি তাহা বুঝিতে অক্ষম। তবে আমরা যে শাসনামলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই আমলে ক্ষমতাসীনরা জনমত সম্পর্কে অতীব সজাগ থাকিতেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়, কাহাকেও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় নাই-এমনকি রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা-মোকদ্দমা আনয়ন করা হয় নাই। যাঁরা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যাঁরা জনগণের সহিত সরাসরি যোগাযোগ রাখেন এবং জনমত অনুসারে দেশের শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন, একমাত্র তাঁদের পক্ষেই এই রূপ বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে, সহযোগীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে এই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থারই নিন্দা করা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য আমরা বিস্মিত হই নাই। কেননা, জনমতকে বিভ্রান্ত করা এবং যেই রাজনীতিকদের কল্যাণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁদেরকে উঠিতে-বসিতে নিন্দা করা সুবিধাভোগীদের নিয়মিত কার্যে পরিণত হইয়াছে। আলোচ্য পত্রলেখকের না জানা থাকিতে পারে; কিন্তু সহযোগীর নিশ্চয় জানা থাকার কথা যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা জনস্বার্থে বহু গোপনীয় সরকারী তথ্য পর্যন্ত ফাঁস করিয়া দেন, এইরূপ অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কেনেডীর আমলে 'সি আই এ' কর্তৃক কিউবা আক্রমণের উদ্দেশ্যে 'বে-অব বিগ্‌স'-এ যে গোপন পরিকল্পিত প্রস্তুতি চালিয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রই তাহা ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। এজন্য সে দেশের কেহ সংবাদপত্র বা রাজনৈতিক আমলের নিন্দা করেন নাই। যাই হোক, সহযোগীর মতে সংবাদপত্রের চক্ষে

আমরা তো গাদ্দার; দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কোন কিছুই চিন্তা করি না। কিন্তু যে বাংলা সহযোগীর দেশের জন্য, জনগণের জন্য এত দরদ তার পৃষ্ঠায় অন্ততঃ জনগণের ভোটাধিকারটুকু ফিরাইয়া দিবার দাবীটি উত্থাপিত হইতে দেশবাসী দেখিতে পারে কি? আমরা বা রাজনীতিকরা শত অপরাধে অপরাধী হইতে পারি; কিন্তু দেশবাসী তো কোন অপরাধ করে নাই, কিংবা তারা তো পরগাছাও নয়।

রাজনীতিকদের সমালোচনা করা অপরাধের কিছু নয়, বরং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনা অনুচিত; কেননা উহা সমালোচনাকারীদের উদ্দেশ্য ও চরিত্রকেই উদঘাটিত করে। মিঃ সবুর বিরোধীদল এবং বিরোধী দলীয় পত্রিকা সম্পর্কে এখানে ওখানে ঢালাও অভিযোগ করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের উল্লেখ নাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, সেদিন পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানে দুইটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানার একটিতে ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হইয়াছে বলিয়া যে 'সু-সমাচার' প্রচার করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সিলেটের জনসভায় 'উৎপাদন কার্য শুরু হওয়ার' 'সু-সমাচারের' পরিবর্তে 'পরিকল্পনা গ্রহণের' পর্যায়ে নামিয়া আসিলেন, তজ্জন্য কি বিরোধী দল বা বিরোধী দলীয় পত্রিকা দায়ী ছিল? ঢাকার জনসভায় অস্ত্র নির্মাণ কারখানা সংক্রান্ত তাঁর ঘোষণা বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রের বানোয়াট খবর ছিল? না, সরকার সমর্থক তিনটি পত্রিকা ব্যানার হেডলাইনে উক্ত 'সু-সমাচার' প্রকাশ করিয়াছিল? মি: সবুর দাবী করিয়া চলিয়াছেন যে, কনভেনশন মুসলিম লীগই 'আদি ও অকৃত্রিম লীগ'; একমাত্র মুসলিম লীগই জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও দেশের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য অবিরাম কাজ করিয়া চলিয়াছে। অপর পক্ষে বিরোধী দলগুলি শুধু বিরোধ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, বিরোধী দল ক্ষমতায় গিয়া দেশের জন্য কি করিয়াছিলেন! মিঃ সবুরের কথিত মতে মুসলিম লীগই যখন 'আদি ও অকৃত্রিম দল' তখন একথাও তাঁকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগই প্রায় একটানাভাবে এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে বৈষম্য ও অন্যান্য অনাচারের জন্য মিঃ সবুর ও তাঁর দলীয় লোকেরা বিরোধী দল কিংবা পূর্ববর্তীদের দায়ী করেন, তাহাও প্রধানতঃ লীগ আমলের কীর্তি। বিশেষতঃ জনাব সবুরের মত 'আদি ও 'অকৃত্রিম' লীগ নেতাদের সম্পর্কে তো ইহা বলা যাইতেই পারে। প্রদেশের বিরোধীদল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্ট হইতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মুসলিম লীগই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল জনাব এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আর সেই

মন্ত্রিসভা ৩০শে মে বরখাস্ত করিয়া এই প্রদেশে ৯২(ক) ধারার বিধান মতে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। শুধু মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করাই নয়, এই প্রদেশের তিন সহস্রাধিক রাজনৈতিক নেতা পরিষদ সদস্য ও কর্মীকে গ্রেফতার করিয়া আটক রাখা হয়।

এই নির্যাতনের পর ১৯৫৫ সালের শেষদিকে যুক্তফ্রন্টের একটি অঙ্গদলকে লইয়া এই প্রদেশে মন্ত্রিসভা চালু করা হয়। এবং তৎপর কেন্দ্রেও একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে ১৯৫৬ সালে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন দলের কোয়ালিশনে বিভিন্ন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিতে থাকে। তৎপর ঐ সালের ৮ই অক্টোবর হইতে যারা ক্ষমতা দখল করিয়াছেন তাঁরা আজ মুসলিম লীগার বলিয়া দাবী করিতেছেন। অতএব, বিরোধী দল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্যন্ত মোট তিন বৎসরের কম (তাহাও বিভিন্ন দল) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাদের কাহারও আয়ুষ্কাল ছিল ১৬ মাস, কাহারও ১৩ মাস আর কাহারও বা মাত্র ৫৪ দিন। ঘন ঘন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা-গড়ার পিছনে কাদের হাত ছিল এবং প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের পথে কারা অন্তরায় ছিলেন, তাহা আজ আর কাহারও অজানা নাই। তাই মিঃ সবুর অন্যায় অযৌক্তিকভাবে এ দেশের দুরবস্থা-দুর্গতির ব্যাপারে বিরোধী দলের উপর অহেতুক দোষারোপ করিয়া চলিয়াছেন। মাত্র ১৩ মাস ক্ষমতাসীন থাকাকালে আওয়ামী লীগ এ দেশে যে নির্ভেজাল বাক্-স্বাধীনতা ও সহনশীল রাজনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁর নজির এশিয়া-আফ্রিকার কোন দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাদের শাসন আমলে সকল রাজনৈতিকবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, কোন রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীকে আটক রাখা হয় নাই এবং প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হইয়াছিল। অথচ মিঃ সবুরেরই জানা আছে যে, বিরোধী দলে থাকাকালে আওয়ামী লীগের শত শত কর্মী ও নেতাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারা জীবনের দুর্বিষহ জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরেও ১৯৫৪ সালের মে মাসে ৯২ (ক) ধারায় কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনকালে যে তিন সহস্র নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগপন্থী। আওয়ামী লীগ শাসন আমলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য বিপুল সাহায্য প্রদান, শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ, ওয়াপদা, আই ডব্লু টি এ, কুটির শিল্প, ফিল্ম কর্পোরেশন, ডি আই টি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন; সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি বিষয়গুলি সবুর সাহেবের নিকট আজ নাই বা বলিলাম। অবশ্য সেই সময় তাঁকেও আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় কার্যাবলীর প্রশংসা করিতে

শুনিয়াছি-এমন কি মুসলিম লীগের তদানীন্তন সভাপতি জনাব তমিজউদ্দিন খান পল্টনের এক জনসভায় মিঃ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই নীতি বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। জনাব সবুরের ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয় যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর ১৩ মাসের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে তিনি চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, সৌদী আরব, জর্দান প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গমন করিয়া বিভিন্ন দেশের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কতখানি তৎপর ছিলেন। তাই বন্ধুবর সবুর সাহেবকে রাজনীতিতে সহনশীল মনোভাব প্রদর্শনের অনুরোধ জানাইব। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন থাকাকালে আওয়ামী লীগ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল, অন্ততঃ সেটুকু তাঁরা অনুসরণ করিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, দেশ হইতে তিক্ততা হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হইয়াছে এবং আলাপ-আলোচনা ও গণতান্ত্রিক পথে সকল সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। নির্যাতনের পিচ্ছিল পথ কাহারও পক্ষে সুখকর বা নিরাপদ হইতে পারে না।

১৯৬৬ সালের ২৬ এপ্রিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ছয়দফা দাবির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে হয়রানি করার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা কর্মসূচি নিছক রাজনৈতিক প্রশ্ন তাই নির্যাতন বা হয়রানির পথে নয়, গণতান্ত্রিক পথেই এর সমাধান করতে হবে। ছয়দফা কর্মসূচি কোন ব্যক্তি বিশেষের দাবি নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় থাকুন বা জেলের বাইরে থাকুন জনসাধারণের জীবন মরণের দাবি এই ছয়দফা আদায়ের সংগ্রাম চলবেই। শাসন কর্তৃপক্ষকে ছয়দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

বন্ধুবর সুলেরী আবার আমার পিছনে লাগিয়াছেন। লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকায় আমার নাম উল্লেখ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইতিপূর্বেকার লিখিত প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করিয়াই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল বিধায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী পুনরায় উত্থাপনের কোন প্রশ্ন নাই, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনাকালে সে প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁর এই মন্তব্যের উপর একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়াছিলাম: সেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আজ কোথায়? আলোচ্য প্রবন্ধে মিঃ সুলেরী সেই সোজাসুজি প্রশ্নের জবাব না দিয়া এক ডাল ছাড়িয়া অন্য ডাল ধরিয়াছেন; ফ্যাঁকড়া তুলিয়াছেন যে, আইয়ুব শাসনতন্ত্রে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা অধিক 'স্বায়ত্তশাসন' প্রদান করা হইয়াছে। লা হাওলা ওয়ালা...

বন্ধুবর সুলেরী পেশাদার সাংবাদিক এবং বর্তমানে তিনি কলামনিষ্ট। তিনি সাংবাদিকতার স্বার্থে রাজনীতি করেন, আর আমি রাজনীতির স্বার্থে সাংবাদিকতা করি। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আর আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রাথমিক পার্থক্য এইখানে। তিনি প্রয়োজনবোধে "মোগলাই" রাজনীতির মহিমা কীর্তন করিতে পারেন, আর আমি সাদা-সিধা গণতান্ত্রিক রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি না। তিনি 'পাকিস্তান টাইমসের' প্রধান সম্পাদক থাকাকালে বর্তমান শাসনতন্ত্রকে 'আইয়ুব শাসনতন্ত্র' বলিতে গর্ববোধ করিতেন। এক ব্যক্তির হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিলে তিনি তাকে 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা'র উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া গণ্য করেন। পক্ষান্তরে, আমি জনগণকে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃত মালিক-মোকতার বলিয়া গণ্য করি; আমি ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্বের পরিবর্তে যৌথ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করি। তাই স্পষ্টতঃ তাঁর ও আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আমি শক্তিশালী পাকিস্তান চাই, আর তিনি চান 'শক্তিশালী কেন্দ্র'। পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থাধীনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করার আমরা বিপক্ষে, পক্ষান্তরে মিঃ সুলেরী 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' সমর্থক বলিয়া সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তথা একাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানেও যদি ফেডারেল রাজধানী স্থানান্তর এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়, তাহাও পাকিস্তানের আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে এবং জাতীয় সংহতি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে না; বরং আঞ্চলিক রেষারেষি বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি আমরা বিশ্বাস করি যে, জনগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক এবং জনগণের মতামত অনুসারেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চূড়ান্তরূপ প্রদান করা বিধেয়। আর মিঃ সুলেরী কোন নীতি ব্যতিরেকেই ব্যক্তির পূজারী। তাই বন্ধুবর সুলেরী ও আমাদের মধ্যকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এতই বিরাট ও বিপরীতমুখী যে, তাঁর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাপি মিঃ সুলেরী যেই রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করুন না কেন, তিনি যদি সেই মতবাদকে যাচাই করিবার জন্য জনমতের উপর নির্ভর করিতে সম্মত হন, একমাত্র তাহা হইলেই আমরা তাঁর সহিত 'মসি-যুদ্ধে' অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত আছি।

৬-দফা সম্পর্কেও আমাদের অভিমত একই। আমরা ইহাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া গণ্য করিলেও ইহার বিপরীত মত পোষণের অধিকার অন্যের আছে। কিন্তু

প্রথমতঃ এই বিতর্ক রাজনৈতিক পর্যায়ে রাখিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, এই মতানৈক্য ও বিতর্কের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে শেষ পর্যায়ে জনমত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, এই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করিবার পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদল 'ভিন্ন পন্থার' আশ্রয় নিতেছেন। এই রাজনৈতিক বিরোধে নিরাপত্তা আইন বা পাকিস্তান রক্ষা আইনের আশ্রয় নেওয়া আমরা কোন প্রকারে সঙ্গত মনে করি না। ৬-দফা নিছক রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং গণতান্ত্রিক পথেই ইহার সমাধান কাম্য। নির্বাচনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা ৬-দফার দাবীকে দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা অবাঞ্ছনীয় এবং অসম্ভবও বটে। শেখ মুজিবের উপর সম্প্রতি যে আচরণ করা হইতেছে তাকে আমরা নির্যাতনমূলক বলিয়া গণ্য করি। যে-কোন অপরাধীর নিয়মিত আদালতে বিচার হইতে পারে এবং দেশের আদালতের উপর দেশবাসীর পূর্ণ আস্থাও রহিয়াছে। কিন্তু শেখ মুজিবকে একই ধরনের বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করার ব্যাপারে শাসনকর্তৃপক্ষ যে 'বিশেষ তৎপরতা' দেখাইতেছেন তাকে একটি বালকও হয়রানিমূলক বলিয়া মনে করিবে।

এই ধরনের হয়রানি, নির্যাতন বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু শেখ মুজিবসহ আজ যাঁরা ৬-দফাকে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের এবং প্রকৃত জাতীয় সংহতি গড়িয়া তোলার উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তাঁরা কোন অপবাদে বা নির্যাতনে পশ্চাৎপদ হইবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই দাবী যে ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের দাবী নয়, ইহা গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনের কথা, তার প্রমাণও পাওয়া যায় ৬-দফার প্রতি জনসমর্থনের দিকে লক্ষ্য দিলে। গত পরশুকার পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, সভার পূর্বেই সকলের তাহা জানা ছিল; এই সভায় হোমরা-চোমরা কোন নেতা উপস্থিত থাকিবেন না তাহাও তাঁদের জানা ছিল। অথচ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করিয়া এই সভায় যে বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল আমাদের নিকট তার প্রধান কারণ, (১) শেখ মুজিবকে যেভাবে হয়রানি করা হইয়াছে জনগণ তার জন্য বিক্ষুব্ধ এবং (২) ৬-দফার দাবীকে তাঁরা নিজেদের বাঁচা- মরার প্রশ্ন বলিয়া গণ্য করেন।

যে-মহল যে পন্থা অবলম্বন করুক না কেন, তার পরিণতি তাঁদেরকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের হয়রানিমূলক আচরণের প্রতি অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতারা যে 'নীরব দর্শকের' ভূমিকা গ্রহণ করিলেন তাতে আমরা কিছুটা বিস্মিত বোধ করিয়াছি। কোন মহল ইহার কোন প্রতিবাদ করা দূরের কথা, বরং কাহাকে কাহাকেও অভিযোগের সুরে বলিতে শোনা গিয়াছে যে, ক্ষমতাসীন মহল অবিবেচকের মত কাজ করিয়া অহেতুক মুজিবকে 'হিরো' বনিবার সুযোগ দিতেছেন। ক্ষমতাসীন মহল মুজিবের জন্য 'মধু-চন্দ্রিমা'

উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন নাই; যে ব্যবহার তাঁর প্রতি করা হইয়াছে তাহা নির্যাতন ও হয়রানি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সস্তায় 'হিরো' বনিবার প্রশ্ন কোথায়? তাও যদি হয় তা হইলে তাহারা 'হিরো' বনেন না কেন?

রাজনীতি ক্ষেত্রে সকলের সহিত সকলে একমত হইবেন এইরূপ আশা করা যায়না। শেখ মুজিবের সহিত আমরাও সকল ব্যাপারে সর্বদা একমত নই। কিন্তু আমাদের দেশে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান– যেখানে কোন কথা বলিতে, কোন দাবী তুলিতেই বৈদেশিক এজেন্ট বলিয়া গালাগালি শুনিতে হয়–সেখানে এই ন্যক্কারজনক আস্থার অবসান কল্পে ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের জন্য প্রস্তুত না হইলে কেহই এই দেশে ইজ্জত নিয়া অবস্থান করিতে পারিবেন না, গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা। ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলেই বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্থান লাভ করিয়াছে। আজ দেশবাসী যেখানে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছেন তাও রাজনীতিকদের ত্যাগের বিনিময়ে। এই ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ব্যাপারে শেখ মুজিব কোন নেতার পেছনে তো নয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্যাতন ও হয়রানি ভোগ করিয়াছেন– এই কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। শেখ মুজিব বিভিন্ন শাসন আমলে প্রায় ৬ বৎসর কাল কারা প্রাচীরের অন্তরালে দুর্বিষহ জীবন যাপন করিয়াছেন। সামরিক শাসন আমলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রতারণা প্রভৃতি অভিযোগে ৬-৭ নম্বর ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং অশেষ হয়রানির পরে তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাই আজ যাঁরা সত্যিকার জনস্বার্থে রাজনীতি করিতে চান তাঁদেরকে নির্যাতন ও হয়রানি ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নির্যাতন যতই আসুক তাঁদের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হইবে। জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়িয়া তোলার ও বাঁচিয়া থাকার দাবী-দাওয়া আদায়ের ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। আজ এ-ব্যাপারে যাঁরা ব্যর্থ হইবেন, পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, তাঁরা 'ব্যাক নাম্বারে' পরিণত হইবেন। জনতার কাফেলা চলিবেই। পল্টনের জনসভাও সেই ইঙ্গিত দিয়াছে। আজ দেশবাসী এমন নেতৃত্ব চায় যাঁরা নির্যাতন ও হয়রানিতে হতোদ্দম হইবেন না এবং জনতার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আগাইয়া নিতে পিছপাও হইবেন না। বরং জনদাবী প্রতিষ্ঠান সংগ্রামে জেল জুলুম নির্যাতন হয়রানিকেই দেশসেবার সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

জাতীয় স্বার্থে কে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেন তাহাই ছিল দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রধান মাপকাঠি। কায়েদে আজম, শেরে বাংলা ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, লিয়াকত আলী প্রমুখের মত বহু নামকরা আইনজীবী বা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি অবিভক্ত ভারতে মুসলিম সমাজে অনেক ছিলেন। গান্ধীজী, নেহেরু, সুভাষ বসু, প্যাটেল, রাজা গোপালাচারা প্রমুখ কংগ্রেস নেতার মত জ্ঞানী-গুণী লোকও

ভারতে অনেক ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সকল নেতার নির্ভীক ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাই যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত এই নেতাদের অমর করিয়া রাখিয়াছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষাও ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভারতের বর্তমান কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তিনি তামিল ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না এবং তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীরও কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী ছিল না। চরিত্র, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং গণসংযোগ হইল রাজনীতিকদের জনপ্রিয়তার প্রধান বিচার্য বিষয়। মিঃ মাও-সে-তুং-এর সহিত অন্যদের মত-পথের ভিন্নতা থাকিলেও তিনি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং মহাচীনের মুক্তিদাতা মহান নায়ক, সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু তিনিও ছিলেন একজন গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক। বিভিন্ন দেশ হইতে এইরূপ ভুরিভুরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাই যাঁরা শুধু তথাকথিত শিক্ষাগত যোগ্যতাকেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করিতে উৎসাহ বোধ করেন তাঁদের এহেন চিন্তাধারা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা হইতে উদ্ভূত। সংগ্রামই রাজ-নীতি এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়াই রাজনীতিকদের নেতৃত্ব গড়িয়া উঠে; সংগ্রামের মধ্য দিয়াই নেতা ও জনতার মধ্যে মহা মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়াই বঞ্চিত-শোষিত মানুষের ঐক্য দৃঢ় হয়।

১৯৬৬ সালের ১০ মে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে দেশরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক ৬-দফা কর্মসূচির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, এই কর্মসূচির প্রবক্তাদের বিনা বিচারে আটক রাখা জনগণের কাছে ক্ষমতাসীনদের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। তাছাড়া নির্যাতনের পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। তাই ছয়দফা দাবির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে আলোচনা, সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই কলামে লেখা হয়:

> শেখ মুজিব এবং পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী তাজুদ্দিন, খোন্দকার মোশতাক আহমদ এ্যাডভোকেট, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং শ্রম-সম্পাদক জহুর আহমদ চৌধুরী, রাজশাহী আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মজিবর রহমান, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম.এ. আজিজ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাকে রবিবার দিবাগত

শেষরাত্রে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার পূর্বক আটক করা হইয়াছে। মফস্বল অঞ্চলের অন্য কোথাও এই ধরনের ধরপাকড় হইয়াছে কি-না, লেখার সময় পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। দেশরক্ষা আইনে হউক বা জননিরাপত্তা আইনে হউক, আমরা কাহাকেও বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে নীতি হিসাবেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি। অধিকন্তু বিগত যুদ্ধকালে দেশে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছিল সেই আইন এখনও বলবৎ থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই জরুরী অবস্থা আজ আর বিদ্যমান নাই। এমতাবস্থায় কাহারও বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগকে আমরা অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করি।

আমরা জানি এবং দেশবাসীও জানে যে, ৬-দফা কর্মসূচী নিয়া দেশে বর্তমানে তুমুল বিতর্ক চলিতেছে এবং এই বিতর্কের প্রধান হোতা হইলেন ক্ষমতাসীন দল। ৬-দফার প্রবক্তারা দাবী করেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী কার্যকরী করা হইলে আঞ্চলিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান হইবে এবং তার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রকৃত অর্থে দৃঢ়তর হইবে। অপরপক্ষে, ৬-দফার বিরুদ্ধবাদীরা–বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন দল ইহার বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন। ৬-দফা সম্পর্কিত এই মতবিরোধ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ৬-দফার বিতর্ক নিতান্তপক্ষে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মত ও পথ নিয়া বিতর্ক। ক্ষমতাসীন মহলও স্বীকার করেন যে, দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাঁরা ইহা দূরীকরণেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও যত্নবান। রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেও একইরূপ মতবিরোধ বিরাজমান। ৬-দফার উদ্যোক্তরা ত বটেই, দেশের অন্যান্য বিরোধীদলও মনে করেন যে, দেশের শাসন কাঠামো ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী ধরনের হওয়া আবশ্যক যাতে অঞ্চল নির্বিশেষে পাকিস্তানের সকল নাগরিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথা শাসন-ব্যবস্থার সম-অধিকার ভোগ করিতে পারে। তাঁদের দাবী হইল যে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার এবং শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব জনগণের সত্যিকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অর্থাৎ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর অর্পণ করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে, ক্ষমতাসীন দল ইহার বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন; তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমান ব্যবস্থাধীনেই দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব হইয়াছে–ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই মতবাদ পরস্পর বিরোধী হইলেও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এইরূপ মতবাদ পোষণের অবকাশ রহিয়াছে। তবে এই মত বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থাতেই। সুতরাং ৬-দফা সংক্রান্ত মতবিরোধ রাজনৈতিক পর্যায়েই বিচার্য এবং রাজনৈতিক পর্যায়েই উহার সুরাহা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উভয় পক্ষ সেই পথ অবলম্বন করিবেন, ইহাই ছিল আমাদের আশা ও কাম্য। নির্যাতন বা কণ্ঠরোধ করিয়া কোন

দাবী-দাওয়া দমাইয়া রাখার চেষ্টা চলিলে উহা মূল সমস্যা সমাধানের পথকেই কণ্টকাকীর্ণ করে। সেই পরিবেশে জনগণের পক্ষে নির্বিকারচিত্তে উদ্ভূত সমস্যা বা বিতর্ক সম্বন্ধে সুস্থভাবে চিন্তা করার অবকাশ থাকে না। যে কোন সমস্যা বা যে-কোন বিতর্ক দেখা দিলে দেশের সকল শ্রেণীর লোক শোনা মাত্রই উহার ভাল-মন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না। উভয় পক্ষ নিজেদের বক্তব্য বিশদভাবে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার পরেই দেশের রাজনীতি নির্লিপ্ত সাধারণ মানুষ উত্থাপিত দাবী দাওয়ার ভাল-মন্দ, উপকারিতা-অপকারিতা যাচাই করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া থাকেন। কিন্তু জনগণের নিকট সমস্যা বা দলীয় মতামত ব্যক্ত করিবার পরিবর্তে যদি কেহ অত্যাচার-নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন তা' হইলে জনমত সুষ্ঠুপথে প্রবাহিত হইতে পারে না। বরঞ্চ অত্যাচার-নির্যাতনের পটভূমিতে জনগণের মতামত বহুলাংশে একদিকে প্রবাহিত হয়। বলা বাহুল্য, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিককালে দেশরক্ষা আইনের বিধান মতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে যখন কয়েক নম্বর মামলা আনয়ন করা হয়–বিশেষতঃ তাঁর গ্রেফতার প্রসঙ্গ নিয়া যে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল, আমরা তার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু এই প্রতিবাদ করার ফলেও আদালতের বিচার সম্পর্কে আমরা আস্থা প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের এখনও অভিমত যে, রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তবে যদি কেহ এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে দেশের প্রচলিত আইনে নিয়মিত আদালতে তাঁর বিচার হইতে পারে। এই বিচারের ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়, কেননা, বাক-স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছ কাজের লাইসেন্স নয়। পক্ষান্তরে যে কোন নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করিতে হইলে দেশের সাধারণ আইনের মাধ্যমেই তার প্রকাশ্য বিচার হওয়া প্রয়োজন। নির্যাতনের পথ অনুসরণ করা হইলে উহা ক্ষমতার অপব্যবহারের নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়।

অধিকন্তু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যেখানে দেশরক্ষা আইনের বিধানমতে নিয়মিত আদালতে কয়েক নম্বর মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে, সেই সময় পুনরায় দেশরক্ষা আইনে বিনা বিচারে তাঁকে আটক রাখা কোনক্রমেই সঙ্গত হয় নাই। ইহা দ্বারা দেশবাসীর মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হইবে যে, ৬-দফার বিতর্কেই এই আটক রাখার মূল কারণ। সেক্ষেত্রে ৬-দফার প্রতি জনগণের মনোভাব পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা ত নাই-ই, বরং এই আটককে জনগণ নির্যাতনমূলক এবং ৬-দফা দাবীকে দাবাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা বলিয়া গণ্য করিবে। কোন ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে এই 'সোজা পথে' বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা

করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। অতীতেও দেখা গিয়াছে যে, কোন জনদাবী উঠিলেই ক্ষমতাসীন দল উহাকে এই সোজা পথে অগ্রাহ্য করিবার প্রবণতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহার পরিণতিতে কোন ন্যায্য দাবী দাবাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। তিক্ততার মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত উহা গৃহীত হইয়াছে। ইহা জাতীয় ঐক্য, সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছে। কেননা, একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে সকল রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা করা উচিত আলাপ-আলোচনা, সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক পথে। আজ আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই না কেন–তাহা আঞ্চলিক সমস্যাই হউক বা জাতীয় সমস্যাই হউক–তারও সমাধান খুঁজিতে হইবে একই পথে একইভাবে। ক্ষমতাসীনরা যদি ৬-দফাকে বা বিরোধী দলীয় অন্যান্য দাবী দাওয়াকে দেশের স্বার্থ ও জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলিয়া গণ্য করেন তাহা হইলে উহা বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে পারেন এবং সেই ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের সুযোগ-সুবিধার অভাব ত নাই-ই, বরং বিরোধীদল অপেক্ষা তাঁদের এই সুযোগ ও সম্পদ অতুলনীয়। রেডিও, টেলিভিশন এবং সরকারী বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি ত আছেই; তদুপরি দেশের সংবাদপত্রের ২/৪টি বাদে প্রায় সবগুলিই সরকার সমর্থক। [এই দুই-চারিটি পত্রিকাও ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে] এমতাবস্থায় তাঁদের মতামত জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার যে বিরাট সুযোগ রহিয়াছে, তার পরেও ৬-দফার প্রবক্তাদের দেশরক্ষা আইনে বা অন্য কোন নির্যাতনমূলক আইনে বিনা বিচারে আটক রাখা জনগণের নিকট ক্ষমতাসীনদের দুর্বলতা বলিয়াই গণ্য হইবে।

এই প্রসঙ্গে আজ আর আমরা অধিক কিছু লিখিতে চাই না। আশা করি, সরকার তাঁর ভুল নীতি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন এবং দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি প্রদান করিয়া উদ্ভূত সমস্যাদির মোকাবিলা ও সমাধানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইবেন। গণতান্ত্রিক পথে এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে ৬-দফাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলে তাতে ক্ষমতাসীনদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে না, বরং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইলে তাতে জনগণের নিকট মর্যাদাই বৃদ্ধি পাইবে। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থেও এই পথই একমাত্র পথ। আমাদের ধারণা মতে ৬-দফার প্রতি যে বিপুল জনসমর্থন রহিয়াছে সেই প্রশ্ন এখানে না তুলিয়াও বলা চলে যে, নির্যাতনের পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, বরং সমস্যা জটিল হয়। পরিশেষে যাঁরা রাজনৈতিক কারণে বিশেষতঃ জনগণের দাবী-দাওয়া তুলিতে গিয়া নির্যাতিত, নিগৃহীত হইতেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিল। জাতির জন্য কোন ত্যাগই বৃথা যায় না, ইহাই আজিকার সান্ত্বনা ও প্রেরণা।

১৯৬৬ সালের ১৪ মে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ৬-দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দলের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করা হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা দাবিকে স্তিমিত করার লক্ষ্যেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা যায় না। জনসাধারণের মত প্রকাশের অধিকার ও গণদাবি প্রতিহত করার পরিণতি মঙ্গলজনক হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। দেশের আইন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

> পত্রিকান্তরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তান রক্ষা আইনে সংশোধনী আনয়নপূর্বক সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করার ক্ষমতা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। এই খবর কতদূর সত্য, তাহা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু কোন কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলিতেছে বলিয়া বাজারে জোর গুজব রটিয়াছে। দেশে প্রেস সংক্রান্ত যে সকল আইন রহিয়াছে, তার বিধানমতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা নূতন কিছু নয়। পাকিস্তানে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে বলিয়া বহির্বিশ্বে প্রচার করা হইলেও প্রকৃত অবস্থা তা নয়।
>
> সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেশে বহুবিধ কড়া আইন প্রচলিত রহিয়াছে। তার উপরও বর্তমান সরকারের আনুকূল্যে প্রেস ট্রাস্ট গঠন করা হইয়াছে। তার আওতায় বহু সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই আনয়ন করা হইয়াছে; ইতিপূর্বে লাহোরের পাকিস্তান টাইমস পত্রিকা হুকুম দখল করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপন বণ্টন, বিশেষতঃ সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞাপন বণ্টনে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই সকল ব্যবস্থা স্বাধীন সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ। এতদসত্ত্বেও এদেশের কতিপয় সংবাদপত্র এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট রহিয়াছে। সংবাদপত্রের প্রতি বর্তমান সরকারের এই মনোভাব উপলব্ধি করিয়া সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলী সংবাদপত্র পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এই নীতিমালা রচনাকালে তাঁহারা সংবাদপত্রের উপর কতগুলি স্ব-আরোপিত বিধি নিষেধ আরোপ করিতেও সম্মত হন। এই নীতিমালার ভিত্তিতেই সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কোর্ট অনারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থার প্রতি সরকারও সমর্থন প্রদান করেন। আশা করা গিয়াছিল যে, সরকার অতঃপর কোর্ট অব অনারের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন পথেই সংবাদপত্রের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণারোপ অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, তাঁরা কোর্ট অব অনারকে চালু থাকিতে দিয়াও দেশরক্ষা আইনের বলে প্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন এবং আলোচ্য খবর অনুসারে সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করার অর্থাৎ সংবাদপত্র ব্যান্ড করার ক্ষমতাও অর্জন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, আজ পাকিস্তানে সংবাদপত্রের যে দশা, তাতে স্বাধীন সংবাদপত্র পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারী তরফ হইতে যেসব উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাতে দেশের শতকরা ৯৫টি সংবাদপত্র অবলীলাক্রমে সরকার সমর্থক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পরেও এই আওতার বাহিরে যে দুই-একটি সংবাদপত্র রহিয়াছে, তার কণ্ঠরোধ বা অস্তিত্ব বিলোপের সরকারী প্রচেষ্টা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রকট দুর্বলতারই নামান্তর।

সরকার কেন এই পিচ্ছিল পথ অনুসরণ করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গণতান্ত্রিক পথে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। পাকিস্তান অর্জনের পর বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দল এদেশের গণতন্ত্রকে বানচাল করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিয়া থাকুন না কেন, তাঁদের সেই অশুভ প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। এমন দিন ছিল যখন পাকিস্তানে বিরোধীদলীয় সংবাদপত্র বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এক মাত্র সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' বিরোধী মতবাদ প্রকাশ করিত। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর এহেন সুবিধা এবং বিরোধী দলের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তিমিত হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রকে তাঁদের সমর্থক হিসাবে লাভ করিবার পরেও বিরোধী মতবাদের একআধটি পত্রিকার অস্তিত্বকেও যদি বরদাশ্‌ত করিতে না পারেন তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় নাই। বরং আমরা এটুকু বলিতে পারি যে, এ পথ একান্ত পিচ্ছিল পথ। বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তিমিত করা যায় না বরং সংবাদপত্রের রাজ্যে যে অন্ধকার সৃষ্টি করা হয় তার পরিণতিতে গুজব সংবাদের স্থান অধিকার করে। আর গুজব যে কখনও মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না, তাহা না বলিলেও চলে।

আমরা জানি, ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি আজ যে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, তাকে স্তব্ধ করিবার জন্যই ক্ষমতাসীন দল নেতৃবৃন্দের ধরপাকড় শুরু করিয়াছেন এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে এমন কি অস্তিত্ব বিলোপে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জনমতের যেটুকু খবর রাখি, তাতে দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ কিম্বা অস্তিত্ব বিলোপ দ্বারা দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী কোনক্রমেই প্রতিহত করা যাইবে না। বরং জনমতের স্বাভাবিক গতিকে এই

স্বৈরাচারী পথে রুদ্ধ করিতে গেলে তার পরিণতি দেশের পক্ষেই অমঙ্গলজনক হইবে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পরে সর্বত্র সর্বমহল হইতে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে, বিশেষতঃ গত কল্যকার প্রতিবাদ দিবসে পল্টনে এবং প্রদেশের অন্যত্র যে প্রবল প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তাহা কোন সরকারেরই উপেক্ষা করা উচিত নয়। দেশের আইন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন থাকার ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু গণ-দাবী প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাতে ধর-পাকড় ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হইলে তাতে গণমনে চরম বিক্ষোভই দেখা দেয় এবং আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাত যে একটি বাহানা মাত্র, দেশবাসীর মনে সেই ধারণাই সৃষ্টি করে। ৬-দফা দাবীর প্রবক্তা আওয়ামী লীগ হইলেও এই দাবীর প্রতি এই প্রদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে। ক্ষমতাসীন দল যদি এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাহা হইলে একমাত্র জনমত যাচাই দ্বারা প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা যাইতে পারে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই পাড়িয়া তাঁরা যদি ধরপাকড়ের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিতে চান, তাহা হইলে আমরা বর্তমান সরকারের দৃষ্টি ইতিপূর্বেকার আন্দোলনসমূহের পরিণতির দিকে আকর্ষণ করিব। ঐসকল ক্ষেত্রেও নেতাদের ধরপাকড় করা হইয়াছে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু শত নির্যাতনের মুখেও অতীতের সেই সকল আন্দোলনকে প্রতিহত করা যায় নাই। বরং ক্ষমতাসীন দলের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে এমনি প্রবল জনমত গড়িয়া ওঠে, যার মুখে তাঁরা টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই, ক্ষমতার আসন হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

তাই আমরা আশা করিব, ক্ষমতাসীন দল 'সোজা পথে' গণদাবী দমাইয়া রাখার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন। ধরপাকড়ের আশ্রয় লইবেন না, যাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেবেন। ক্ষমতাসীন দল দেশে সংবাদপত্রের যে দশা বানাইয়াছেন তাতে সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের আর আস্থা নাই বলিলেই চলে। বলা বাহুল্য, যারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলিয়া চালাইয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করিতে চাহে, সে সকল সংবাদপত্রের প্রতি ক্ষমতাসীন দলের যত অনুকম্পাই থাকুক না কেন, তাদের প্রতি দেশবাসীর কোন আস্থা নাই। সংবাদপত্র যদি দেশের সমস্যাদি এবং জনগণের দাবী-দাওয়া সঠিকভাবে প্রতিফলিত না করে, তাহা হইলে সংবাদপত্র হিসাবে তার কোন মূল্যই থাকিতে পারে না। তাই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া ক্ষমতাসীন দলের কোন লাভ হইবে না, বরং দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসীকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকেই বেকায়দায় পড়িতে হইবে। রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া রাজনৈতিক

পর্যায়েই বিচার বিবেচনা করিতে হইবে এবং গণতান্ত্রিক পথেই তার সমাধান করিতে হইবে, ধরপাকড় কিম্বা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ দ্বারা নয়। গণতান্ত্রিক পথে যদি কোন রাজনৈতিক প্রশ্নের মোকাবিলা করা না হয়, তাহা হইলে তার পরিণতি কি দাঁড়ায়–এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি সদ্য স্বাধীন দেশে তার নজিরের অভাব নাই। নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে যাঁরা জনমত ও সংবাদপত্রের অধিকার হরণ করিয়া ছিলেন, সেই অধিকার যেমন তাঁরা নিজেদের করায়ত্ত রাখিতে পারেন নাই, তেমনি জনসাধারণকে ফিরাইয়া দেওয়ারও অবকাশ পান নাই। জনসাধারণের মত প্রকাশের অধিকার আবার নূতনভাবে নূতনপথে অপহৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁরা নির্যাতন করেন, যারা অপরের অধিকার হরণ করেন, আশেপাশের ঘটনা প্রবাহ এবং সমসাময়িক ইতিহাস হইতে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ক্ষমতা হাতে থাকিলে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া নির্যাতন চালানো কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু যাঁরা জনগণের সুখ-দুঃখের সাথী, তাঁরা নির্যাতনের ভয়ে নীতিচ্যুত হইতে পারেন না। কথা হইল যে-ই নির্যাতন করুক একদিন তাকে জবাব দিতে হইবে– কেন এই নির্যাতন? কি অপরাধ?

১৯৬৬ সালের ১৬ মে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামেও মি. সুলেরীর লেখায় ছয়দফা সম্পর্কিত বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়েছে। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ৬-দফার প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে মি.সুলেরী নিশ্চিত, তবে স্বীকার করতে নারাজ। ৬-দফার সঙ্গে যদি জনগণের সম্পর্ক না থাকে, এটা যদি কতিপয় জনসমর্থনহীন পেশাদার রাজনীতিকের ব্যাপার হয়, তাহলে তিনিই বা কেন ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পরেই বিরামহীনগতিতে কলম চালাচ্ছেন? কেনই বা দেশরক্ষা আইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে? কথার মারপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে ছয়দফা প্রস্তাবকে রাজনৈতিক পর্যায়ে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে ফয়সালা করার জন্য মি.সুলেরী এবং ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

কেন্দ্রীয় প্রচার সচিব খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেব উন্নতশীল সমাজে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে চট্টগ্রামে এক বৈঠকে ভাষণদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জাতীয় সংহতি অর্জনের জন্য সংবাদপত্রের উচিত, জনগণকে গঠনমূলক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা। মন্ত্রী মহোদয়ের মূল বক্তব্যের সহিত মত পার্থক্য থাকার কথা নয়। কিন্তু যেখানে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে মতানৈক্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিতর্ক উঠিলেই ক্ষমতাসীন মহল অধৈর্যের পরিচয় দেন। রাজনৈতিক বিতর্ক ও সমস্যা

উত্থাপনকারীদের উদ্দেশ্য ও দেশপ্রেমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে মানিয়া নেওয়াই সংবাদপত্রের 'গঠনমূলক' ভূমিকা বলিয়া পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় জনগণের নিকট সংবাদপত্রের কোন মূল্য থাকেনা। অবলীলাক্রমে দেশের সংবাদপত্রের অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে, আজ অধিকাংশ পত্রিকা পাঠ করিলে মনে হইবে যে, দেশে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোন সমস্যা নাই, শুধু উন্নতি আর উন্নতি। দেশের সমস্যা অপেক্ষা বিদেশী সমস্যা নিয়াই যেন সংবাদপত্রের বেশী মাথা ব্যথা। সংবাদপত্রের দ্বারা এই ধরনের প্রচার কার্য চালানো কষ্টকরও কিছু নয়। কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ- দৈন্য সমাজের অনাচার ব্যাভিচার এবং মানুষের রাজনৈতিক বাসনা কামনার প্রকাশ বন্ধ হইলেই জ্বলন্ত সমস্যাদি ঢাকা পড়িয়া যায় না। যে সকল সমস্যায় মানুষ ভোগে, যে-সকল দাবী-দাওয়া ও অধিকারের প্রশ্ন মানুষের মননে জুড়িয়া আছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাহা প্রকাশ বন্ধ হইলেই সমস্যা অথবা জনদাবী আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারিবে না, এইরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল। বরং এই ধরনের একতরফা খবর প্রকাশ করা হইলে সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের কোন আস্থা বা শ্রদ্ধা থাকেনা। ইহাতে সমাজে সংবাদপত্রের যে প্রভাব রহিয়াছে তাকেই খর্ব করা হয় মাত্র। ইহা দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, এমনকি ক্ষমতাসীনদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়না। জনগণের নিকট সংবাদপত্রের যদি কোন গুরুত্ব না থাকে তাহা হইলে যে কোন জাতীয় আপদকালে সংবাদপত্র জনমতকে প্রভাবিত করিতে পারে না এবং সংবাদপত্রের এই প্রভাবহীনতা তখন দেশের সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যাই হউক, সচেতন জনসাধারণ সংবাদপত্রের ভূমিকার প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা অথবা সংবাদপত্রের পক্ষে জনমতকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। সংবাদপত্র জনমতের বাহনরূপে টিকিয়া থাকিতে পারিলেই সংবাদপত্রের মূল্য থাকে। নিজেদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব একান্তভাবেই জনগণের সচেতনতার উপর নির্ভরশীল, সেই রূপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও একমাত্র জনগণের অতন্দ্র প্রহরার ফলেই অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে। Eternal vigilence is the price of freedom অর্থাৎ নিজেদের অধিকার তথা স্বাধীনতা সম্পর্কে সদা-নিয়ত জাগ্রত থাকাই স্বাধীনতার প্রধান রক্ষা কবচ।

দেশের সমস্যা নিয়া বিশেষতঃ ৬-দফা মোকাবেলা করার জন্য বন্ধুবর সুলেরী একটানাভাবে কলম চালনা করিতে শুরু করিয়াছেন। কিভাবে ৬-দফার দাবী পাশ কাটাইয়া যাওয়া যায়, কিভাবে ইহার মোকাবিলা করা যায় তাহা নিয়া তিনি যথেষ্ট মাথা ঘামাইতেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (উদ্ভট হইলেও) নানা ধরনের প্রস্তাবও দিতেছেন।

প্রথম দফায় তিনি ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, ২১-দফা বর্ণিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন শাসনতন্ত্র রচনাকালে পূর্ণ গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইয়াছিল এবং উহা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছিল। ইহার জবাবে আমরা যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র কোথায়, তখন মি. সুলেরী তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধে উহার সরাসরি জবাব প্রদান না করিয়া নূতন ফ্যাকড়া তুলিলেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা প্রচলিত শাসনতন্ত্রে (যাকে তিনি আইয়ুব শাসনতন্ত্র বলিতে গর্ববোধ করেন) অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইয়াছে। আমরা যখন জবাব দিলাম যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রে সকল ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত এবং গভর্নর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের নিয়োগ, বরখাস্ত প্রেসিডেন্টের একক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা 'বিডি' দ্বারা নির্বাচিত পরিষদের নিকটও দায়ী নন, তখন তিনি সম্পূর্ণ নীরব। এই প্রশ্ন আর তিনি উত্থাপনই করিতেছেন না। অবশ্য তাই বলিয়া তাঁর মসি চালনা বন্ধ হয় নাই।

বন্ধুবর সুলেরী এক্ষণে নূতন পথ ধরিয়াছেন। লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধে তিনি এন.ডি.এফ কেও একচোট নিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "By its headlong plunge into Provincialism the Mujib school has also set the pace for others. The NDF-the few leaders without a following but supported by a paper owned by one of them has helter- shelter taken up an obedient position behind it (6-point Programme). Thus the opposition in East Pakistan has at least the one which is active and heard practically abandoned its original motivation and demand for democratisation" [বঙ্গানুবাদ: মুজিবপন্থীরা প্রাদেশিকতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অন্যদেরও পথ দেখাইয়াছেন। অনুসারীবিহীন কতিপয় নেতা সমন্বয়ে গঠিত এবং অন্যতম নেতার মালিকানাধীন একটি পত্রিকার সমর্থনপুষ্ট এন.ডি.এফ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ইহার পশ্চাতে অনুগতভাবে লাইন ধরিয়াছে। এইরূপে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দল–অন্ততঃ যে দলটি সক্রিয় এবং যার কথা লোকে শুনে, উহা কার্যতঃ তাদের গণতন্ত্রায়নের আসল দাবী পরিত্যাগ করিয়াছে।]

মিঃ সুলেরীর প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি ৬-দফার প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত তবে স্বীকার করিতে নারাজ। বরঞ্চ ৬-দফার বিরুদ্ধবাদীদের মনোবল যাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তজ্জন্য সান্ত্বনা বাণী দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন: "The whole trouble is that since the political process has not truly got under way and the masses have not been involved, politics has become

monopolized in the hands of a few professional practitioners." [বঙ্গানুবাদ: আসল কথা এই যে, যেখানে সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক গতিধারা সৃষ্টি হয় নাই এবং যার সহিত জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট হয় নাই, সেখানে রাজনীতি একচেটিয়াভাবে গুটি কয়েক পেশাদার রাজনীতিকের কুক্ষিগত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত: মিঃ সুলেরীর এই বক্তব্যে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে। তিনি নিজস্ব মাপকাঠিতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মিঃ সুলেরীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছে হয় যে, ৬-দফার সহিত যদি জনগণের কোন সম্পর্ক না থাকে ইহা যদি কতিপয় জনসমর্থনহীন পেশাদার রাজনীতিকের ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তিনিই বা কেন ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পরেই বিরামহীনগতিতে মসি চালনা করিতেছেন? কেনই বা দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে? বন্ধুবর তবে কি মনে করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৭ কোটি লোক তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ঘুমাইয়া আছে? অবশ্য আমরা বুঝি, এ কথা না বলিলে বন্ধুবরকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। তবে তিনি যে কতখানি ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁর লেখাটা হইতেই অনুমান করা যায়। যে মিস জিন্নার নাম শুনিলে তাঁরা তেলে বেগুনে চটিয়া যান, বন্ধুবর সুলেরী অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : Here one cannot fail to think of Mohtarama Miss Jinnah. During the election the assumed the leadership of the combined Opposition parties and became their candidate for Presidentship... What is the position now? Have they abandoned her leadership or has the ceased to be interested in national politics? No public statement Indicating one position or the other has been made. The assumption, therefore, is that she is very much there to lead the Opposition and her writ runs among its constituents throughout the country. If so, one is surprised to see that she has taken no stand concerning the 6 points and one does not know whether or not the approves of that. The nation has a right to know her views on a question of such vital importance [বঙ্গানুবাদ: এখানে মোহতারেমা মিস জিন্নাহর প্রসঙ্গ আলোচনা না করিয়া পারা যায় না। নির্বাচনের সময় তিনি সম্মিলিত বিরোধী দলের নেত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হন। ... এখন সেই অবস্থা কি পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে? তাঁরা কি তাঁর নেত্রীত্ব পরিহার করিয়াছেন, না তিনি দেশের রাজনীতিতে আর আগ্রহী নন? এই দুইটি অবস্থার কোনটি সম্পর্কেই ইঙ্গিতসূচক কোন

প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। কাজেই এ কথা ধরিয়া লওয়া যায় যে, তিনি এখনও বিরোধী দলকে নেতৃত্বদানে প্রস্তুত এবং দেশের সর্বত্র অঙ্গদলগুলি তার আজ্ঞাবহ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর যে, ছয় দফা সম্পর্কে তিনি কোন নীতি ঘোষণা করেন নাই এবং তিনি ছয় দফা অনুমোদন করেন কি করেন না, তাহাও কেহ জানে না। এইরূপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাঁর মতামত জানিবার অধিকার জাতির রহিয়াছে।']

মিস জিন্নাহ ৬ দফার উপর সরাসরি মন্তব্য প্রকাশ না করিলেও বিগত বকরা ঈদে প্রদত্ত এক বাণীতে তিনি ইহাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং "অস্ত্রের ভাষা" দ্বারা ৬ দফার মোকাবিলা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। যাই হউক, মিস জিন্নাহ রাজনৈতিক আসরে নামিবেন কি না নামিবেন না, ইহা বড় প্রশ্ন নয়, বরং মৌলিক গণতন্ত্রের রাজনীতি বজায় থাকিলে এই বয়সে তাঁর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা বৃথা সেই অভিজ্ঞতা তাঁর হয়তো জন্মিয়াছে। প্রকৃত প্রশ্ন হইল, ৬-দফাকে রাজনৈতিক পর্যায়ে রাখা হইবে কি-না এবং গণতন্ত্র সম্মত পথে উহার ফয়সালা করা হইবে কিনা। এই প্রসঙ্গে মি. সুলেরী পূর্ব পাকিস্তানের কনভেনশন পন্থী লীগ ওয়ালাদের উপরও এক হাত নিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :[No one is coming forth to express the true feelings of the masses. The Muslim league leaders are conspicuous by their silence. Governor Monem has no doubt spoken but what about the others the Ministers office bearers and the whole lot of those who are not tired of avowing loyalty to the president, loyalty to a person without attachment to the cause that he espouses] [বঙ্গানুবাদ : জনগণের সত্যিকার মনোভাব প্রকাশের জন্য কেহই আগাইয়া আসিতেছে না। এই ব্যাপারে মুসলিম লীগ নেতাদের নীরবতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গভর্নর মোনেম অবশ্য মুখ খুলিয়াছেন। কিন্তু অন্যরা কি করিয়াছেন? মন্ত্রী দলীয় কর্মকর্তা এবং যেসব লোক প্রেসিডেন্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ক্লান্ত হন না, তাঁরা একজন লোকের বিষেষিত নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়া কেবল তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিতেছেন।]

৬-দফার উপর জনমত সম্পর্কে বন্ধুবর সুলেরীর যদি কোন বাধা থাকে তাহা হইলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করিলে আমরাই তা করিতে পারি। কিন্তু কনভেনশন লীগ ওয়ালাদের উপর খামাখাই তিনি চটিয়াছেন। তাঁরা যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন। কিন্তু মূল সমস্যা হইল: বিডি নির্ভর রাজনীতিতে যাঁদেরকে বিডিদের গুনগান ও তোষামোদ করিতে হয় সেই একই লোকের পক্ষে জনগণের সম্মুখে দাঁড়ান কিংবা জনগণকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না; এই সহজ ব্যাপারটি

মিঃ সুলেরীর উপলব্ধি করা উচিত ছিল। কেননা জনগণের জন্মগত অধিকার- ভোটাধিকার খর্ব করিয়া যেখানে সেই অধিকার বিডিদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে সেখানে বিডিদের সমর্থনকারী কনভেনশন লীগের কথায় জনসাধারণ কান দিতে পারে না। যাই হউক কথার মারপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়া ৬-দফা প্রস্তাবকে যাতে রাজনৈতিক পর্যায়ে রাখিয়া গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে উহার ফয়সালা করা হয় তজ্জন্য মিঃ সুলেরী তাঁর প্রভাব ক্ষমতাসীনদের উপর নির্ভর করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি। অন্যথায় তাঁর লেখালেখির কোন মূল্য নাই। ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র ।

১৯৬৬ সালের ১৯ মে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এতে দেশের রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ছয়দফা কর্মসূচি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের নানা ধরনের অসহযোগিতার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ধরাধরি কিংবা সাধা সাধি করে রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করা যায় না। তাই একই দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ঐক্য গঠন করে ছয়দফার সংগ্রামে বিনা দ্বিধায় অংশগ্রহণ করে আন্দোলনের পথে গণঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। কলামে ঐক্য গঠনের পথে বাধা-বিঘ্নর স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এতে লেখা হয়:

কোন কোন মহল হইতে বিরোধী দলীয় ঐক্য গঠনের কথা বলা হইতেছে। ইহা শুনিতে ভাল শোনায় এবং ঐক্য গঠন করিতে পারিলে ভালও হয়। কিন্তু এই ঐক্য গঠনের পথে কি সকল বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে, তাহা হয়ত সকলের খেয়াল নাই। নিয়মতান্ত্রিক পথে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং দেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রচলনের স্বার্থেও সংগঠিত বিরোধী দলের প্রয়োজন। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরাও একাধিকবার বিরোধীদলের ঐক্য গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে এইজন্য চেষ্টাও করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় প্রোগ্রামের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে বলিয়াই পৃথক পৃথক দল গঠনের যুক্তি থাকে। পাকিস্তানে বর্তমানে নিয়মিত গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত নাই; নিয়মিত গণতন্ত্রের স্থলে যে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' প্রচলন করা হইয়াছে, তাতে জনমত প্রতিফলিত হইবার উপায় নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক দলসমূহ রাজনৈতিক আমলের মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং প্রত্যেকটি দল ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ প্রোগ্রাম দেশবাসীর নিকট তুলিয়া ধরিতে অধিক আগ্রহান্বিত। ইহার উপরেও পরস্পর ঈর্ষা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রবণতা তো আছেই।

পাকিস্তানে কার্যতঃ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রচলন কখনও ছিল না। বলাবাহুল্য, সময়মত শাসনতন্ত্র রচনা করা হইলে এবং তৎপর নিয়মিতভাবে জাতীয় ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেশের রাজনীতিও স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হইতে পারিত; তাহা হইলে হয়ত আজিকার বৈষম্য, রেষা-রেষি এবং হিংসা-বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হইত না, বরং কোথাও কোন বৈষম্য ও অভিযোগ থাকিলে প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্ট এবং সরকারের মাধ্যমেই উহা প্রতিকার করা হইত। তাই আজ আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি, তার জন্য মূলতঃ দায়ী গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি গোড়া হইতে অবহেলা প্রদর্শন। এই অবহেলা ও ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত, না অনিচ্ছাকৃত এখানে সে বিতর্ক তুলিয়াও লাভ নাই। যে সমস্যা পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা সমাধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, তাহাই আজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো বৎসরের কার্যকলাপ আজ দেশে যে রাজনৈতিক সমস্যা, আঞ্চলিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে তার সমাধান শুধু শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন বা অন্য কোন গতানুগতিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। কেননা, অতীতে দেখা গিয়াছে যে, এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে ক্ষমতার হাতবদল এবং ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া মৌলিক সমস্যাবলী এড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, গণমনে এই ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, এই সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জনগণের আশা-আকাংখা পূরণের পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, জনগণকে ধোঁকা দিবার জন্যই এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য নয়। বরং দেখা গিয়াছে যে, এই ক্ষমতার হাতবদল ও ভাঙ্গা-গড়ার ফলে জনগণের সমস্যা, আঞ্চলিক বিরোধ সব কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই অবস্থার পটভূমিকায় বিরোধী দলের ঐক্য গঠন করিতে হইলে সর্বাগ্রে একটি সুষ্ঠু প্রোগ্রামের ভিত্তি খুঁজিতে হয়। কিন্তু এই ভিত্তি সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছা সম্ভব হয় নাই। বিরোধীদলসমূহের সর্বসম্মত কর্মসূচী রচিত না হইবার ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একপ্রকার অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বৎসরাধিককাল যাবত সংবাদপত্রে মাঝে-মধ্যে বিবৃতি প্রদান ছাড়া বিরোধীদলের কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। এই সকল অবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবী –সম্বলিত একটি কর্মসূচী রচনা করেন। আমাদের যতদূর জানা আছে, এই ৬ দফা প্রোগ্রাম জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করিবার পূর্বে বিরোধী দলীয় কোন প্রবীণ নেতাকে এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক, অন্যরা উহাতে সাড়া দেন নাই। তারপরই ৬ দফা প্রোগ্রাম লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় সম্মেলনে পেশ করা হয়, কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা উহাকে 'অবান্তর' বলিয়া প্রত্যাহার করেন।

ইহার পর লাহোর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফা পেশ করেন। ৬ দফার বিষয়বস্তু এইভাবে জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে থাকে। ৬ দফা প্রোগ্রাম পেশের পর আমরাও তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতি সমর্থন অথবা ইহার বিরোধিতা করি নাই। ধীর-স্থিরভাবে নিজেদের অভিমত গঠন করা ছাড়াও আমরা দেশের বুদ্ধিজীবী, যুব সমাজ, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, স্থানীয় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং সর্বসাধারণের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম যে, সরকারী তরফের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হইবার পূর্বেই কতিপয় বিরোধী দল ৬-দফা প্রোগ্রামের প্রতি আক্রমণ সুরু করিলেন। চৌধুরী মোহম্মদ আলী প্রমুখরা ৬-দফা প্রোগ্রামকে 'একদফা' প্রোগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং অভিযোগ করিলেন যে, ইহা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দুরভিসন্ধি। বুদ্ধিজীবী, যুব সমাজ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেও ইহার ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যে -সকল বিরোধী দলীয় মুখ চেনা নেতা ৬-দফার বিরোধিতায় কোমর বাঁধিয়া নামিলেন, তাঁদের শাসন আমলেই বৈষম্য এবং ঠকাঠকির গোড়াপত্তন হইয়াছিল, দেশবাসী তাহা সম্যক অবগত আছে। ৬-দফার বিরুদ্ধে যখন তাঁরা মারাত্মক অভিযোগ আনয়ন করিলেন, তখন ৬-দফা কর্মসূচীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য আওয়ামী লীগকেও বিশেষ তৎপর হইলেন এবং প্রদেশের জেলা হেড কোয়ার্টার ও সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান করিয়া তাঁরা ৬-দফার প্রতি জনসমর্থনের প্রমাণ হাজির করিলেন। ৬-দফা কর্মসূচী সবাই সমর্থন করুক আর না করুক, সত্যের খাতিরে সকলকে স্বীকার করা উচিত যে, ৬-দফা দাবীতে অনুষ্ঠিত শেখ মুজিবের প্রত্যেকটি জনসভায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ৬-দফার বিরোধীরা প্রদেশের কোথাও অনুরূপ জনসভা অনুষ্ঠান করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। প্রসঙ্গতঃ পররাষ্ট্র সচিব জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সহিত ৬-দফা ইস্যুতে 'মোকাবিলা সভার' (Confrontation meeting-এর) প্রস্তাব দিয়াও কিভাবে উহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইল,তাহাও দেশবাসীর চক্ষু এড়ায় নাই। যাই হউক, জনমত সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই ৬-দফার প্রবক্তারা গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়া সাবধানতার সহিত এই শর্ত আরোপ করিয়া ছিলেন যে, বিরদ্ধবাদীরা শতকরা ৩০টি ভোট লাভ করিলে তাঁরা রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। বস্তুতঃপক্ষে ৬-দফার প্রতি যে একটানা সমর্থন লক্ষ্য করা যায়, তাতে নিরপেক্ষ লোক একথা বলিতে পারেন যে, গণভোট অনুষ্ঠিত হইলে ৬-দফার অনুকূলে শতকরা অন্যূন ৯০টি ভোট লাভ করা সম্ভব হইবে। ৬-দফা প্রস্তাবের এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ অবশ্য কোন ব্যক্তি এমন কি কোন দল বিশেষ নয়। আজ দেশবাসীর সম্মুখে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আঞ্চলিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া

উঠিয়াছে ৬-দফার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের মধ্যেই বাঁচা-মরার সমস্যার সমাধানের পথ নিহিত রহিয়াছে, ইহাই সর্বশ্রেণীর জনগণের বিশ্বাস। ৬-দফার যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের প্রধান দুর্বলতা হইল যে, তাঁরা ৬-দফার বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিতেও ভয় পান; তাঁদের মুখে একটি মাত্র শ্লোগান যে, ইহা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবে। কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যালোচকরা লক্ষ্য করিতেছেন যে, ৬-দফা প্রোগ্রামে অপর কাহারও প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণের কিংবা অন্য কাহারও ন্যায্য স্বার্থে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রস্তাব নাই। ৬-দফা কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হইল যে, অতঃপর উভয় অঞ্চলকে সমান তালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সুযোগ দিতে হইবে। ৬-দফার প্রবক্তাদের অভিমত যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল স্ব স্ব মতবাদ দ্বারা সমান তালে উন্নতি-অগ্রগতি সাধনের সুযোগ লাভ করিলে এবং উভয় অঞ্চল রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করিলে তাহাই হইবে শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের পক্ষে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ।

তাই কর্মপন্থায় মিল না থাকিলে বিরোধী দলীয় ঐক্য গঠন মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমরা জনমতের যেটুকু খবর রাখি তাতে বলিতে পারি যে, জনগণও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে ঐক্য চান, শুধুমাত্র ঐক্যের খাতিরে অথবা অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য ঐক্য চান না। ইহা সকলকে উপলব্ধি করা উচিত যে, শেষ পর্যন্ত জনগণের সমর্থনের উপরই কর্মসূচী ভিত্তিক আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে। কতিপয় পরস্পর-বিরোধী মতাবলম্বী বিরোধীদলের সমন্বয়ে ঐক্য গঠিত হইলে তাহা আর যাই হউক, দেশবাসীর ইস্পিত কর্মসূচীর সাফল্য নিশ্চিত করিতে পারে না। বরঞ্চ যাঁরা ৬-দফার বিরোধী, তাঁদের সহ সকল বিরোধী, দলের ঐক্য গঠিত হওয়ার অর্থ দাঁড়াইবে ৬-দফাকে হিমাগারে গচ্ছিত রাখা এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও পুনরায় নিষ্ক্রিয়তা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। ৬-দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগ হইলেও তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহা কোন দলীয় প্রোগ্রাম নয়, ইহা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রামের প্রতি তাঁরা সকল দলের ও সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। ৬-দফার আন্দোলন কোন দল বিশেষের ক্ষমতাদখলের আন্দোলনও নয়; ইহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম। ৬-দফা দাবী প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে পরই দলীয় রাজনীতির প্রশ্ন উঠিবে। সে সময় ক্ষমতাসীন দল এবং সকল বিরোধী দল স্ব স্ব প্রোগ্রাম ও বক্তব্য লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে হাজির হইবার সুযোগ পাইবেন এবং কোন্ দলকে ভোট দিবেন না দিবেন, তার চূড়ান্ত মালিক হইবেন জনসাধারণ। সুতরাং, ৬-দফার আন্দোলনকে ক্ষমতা দখলের আন্দোলন বলিয়া

বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও কোন অবকাশ নাই। বিরোধী দলের মধ্যে এন, ডি, এফ এবং ন্যাপের প্রোগ্রামের সহিত ৬-দফার বহুলাংশে মিল রহিয়াছে। আজ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে যখন ধর-পাকড় শুরু হইয়াছে, তখন শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আওয়ামী লীগ ও এন, ডি, এফ-এর মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকিলে তারও অবসান হইয়া নূতন সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। ন্যাপের প্রধান সমস্যা হইল তার পররাষ্ট্র নীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও ন্যাপ নিজেই দ্বিধা বিভক্ত। পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা সকলেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের নিকট দেশের প্রধান সমস্যা হইল আভ্যন্তরীণ সমস্যা– যে সমস্যার জন্য দেশের অর্থনীতিতে অসাম্য ও সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে; দেশে জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকৃত রহিয়াছে। সেই আভ্যন্তরীণ সমস্যাকেই আমরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করি। অনুন্নত যে-সকল দেশে শুধু পররাষ্ট্রনীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া আভ্যন্তরীণ সমস্যাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেই সকল দেশে বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করিলে একচোখা পররাষ্ট্র নাতির উপর যাঁরা অধিক গুরুত্ব দেন, তাঁদের ভুল ভাঙ্গিবার কথা। অবশ্য যাঁরা সমস্যা এড়াইবার জন্য কিংবা সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিবার জন্য বাহানা তুলিতে চান, তাঁদের কথা ভিন্ন। তাই ন্যাপের চীনপন্থী ও রুশ-পন্থী বলিয়া কথিত গ্রুপ দুইটি যদি পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তাঁদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করিতে সম্মত হন তাহা হইলে তাঁরাও ৬-দফার সংগ্রামে বিনা দ্বিধায় অংশগ্রহণ করিতে পারবেন। ৬-দফার ভিত্তিতে যেখানে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হইয়াছে এবং ক্ষমতাসীনরা ধরপাকড় শুরু করিয়াছেন, তখন এই সংগ্রামের পথেই বিরোধী দলীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে। এই মুহূর্তে এই উদ্যোগ এন, ডি, এফ ও ন্যাপ গ্রহণ করিলেই শোভনীয় হয়। যে যে প্রোগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে তার গতি নির্যাতন কিংবা কাহারও অসহযোগিতার দরুন প্রতিহত করা যায় না। তবে একই দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ঐক্য গঠিত হইলে আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং লক্ষ্যে পৌঁছা ত্বরান্বিত হয়।

সর্বশেষে রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাসও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সাধিয়া-মাজিয়া, ধরিয়া-বাঁধিয়া রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করা যায় না। কর্মসূচী ও আন্দোলনের মধ্য দিয়াই গণঐক্য গড়িয়া উঠে। বৃটিশখেদাও আন্দোলনকালে কংগ্রেস শত চেষ্টা করিয়াও সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। কংগ্রেসের প্রোগ্রাম এবং ত্যাগী ও গতিশীল নেতৃত্ব কংগ্রেসকে গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে

পরিণত করে। একইভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কর্মসূচীর আকর্ষণ তৎকালীন মুসলিম লীগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

১৯৬৬ সালের ২৭ মে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পেছনে জনসমর্থন নেই বলে যারা সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ ও নিন্দা জানানো হয়েছে। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা দাবি আদায়ের পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে পাকিস্তানকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করতে এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া ছয়দফার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদানকারীদের জনমত যাচাই করার জন্যও পরামর্শ দেয়া হয়। এতে লেখা হয়:

> দেশবাসীর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের জন্যই যে কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য তাহাই নয়; বিদেশে দেশের মর্যাদার স্বার্থেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কেননা, বিদেশীরা কোন্ দেশে সংবাদপত্রের কি পরিমাণ স্বাধীনতা আছে কি নাই, তাদ্বারাই একটি দেশ সম্পর্কে অভিমত গঠন করেন। একটি দেশের সংবাদ বিভিন্ন দেশে প্রচার করার প্রধান মাধ্যম হইল সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। এক অর্থে সংবাদপত্র বিশ্ব পরিবারভুক্ত। কোন দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব অথবা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর হামলা করা হইলে সারা বিশ্বে সেই খবর ছড়াইয়া পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে স্বাধীনতাপ্রিয় বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই যাঁরা বিদেশে দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে চান, তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব কিংবা সংবাদপত্রের উপর হামলা করা হইতে বিরত থাকেন। অবশ্য যাঁরা নিজ স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন তাঁদের কথা আলাদা। সে সকল দেশে শুধু সংবাদপত্রের উপরই হামলা নয়, জনগণের স্বাধীনতার উপরও হামলা করা হয়। জনগণ এবং জনমতের বাহন সংবাদপত্রের উপর হামলার পরিণতি অবশ্য কাহারও জন্য মঙ্গলজনক হয় নাই। এই সকল দেশ সম্পর্কে স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাহাই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সেসব দেশে অশান্তি ও রক্তারক্তি চিরসাথী হইয়া রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকার দেশগুলির দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, সেখানে প্রায় সকল দেশেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক

অধিকার খর্ব করিয়া শাসককুল শান্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন এমন নয়; সেখানে প্রায়শঃই রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার রদবদল হইতেছে। যাঁরা যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, নিজ দেশের জনগণের ভয়েতে তাঁরা নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে কালাতিপাত করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার শেষ পরিণতি কি দাঁড়াইতে পারে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম আজ তার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে শত ভাঙ্গা গড়া এবং নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানি সত্ত্বেও আমরা বলিষ্ঠ আশাবাদী যে, পাকিস্তান গণতন্ত্রের সুগম পথ পরিহার করিয়া কোনক্রমেই সেই দুর্গম পথ অনুসরণ করিবে না– যে পথে অন্যান্য দেশ সংবাদপত্র ও জনগণের অধিকার খর্ব করিয়া দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে, যে পথে শাসক ও শাসিত সকলেই নিরাপত্তা হারাইয়াছেন এবং বিশ্ব দরবারে দেশের মান-মর্যাদা-প্রতিপত্তি বলিতে কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, সংবাদপত্র একটি বিশ্ব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কোথাও সংবাদপত্রের উপর হামলা আসিলে স্বাধীনতাকামী বিশ্বে তার ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাম্প্রতিককালে ঢাকা, এমনকি পিণ্ডি, করাচীতে জোর গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, যে- কোন মুহূর্তে ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। আরও কত কি। সম্ভবত: এই গুজবের মূল ভিত্তি ছিল, গত ৯ই মে তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেশরক্ষা আইনের একটি ধারার সংশোধনী। এই সংশোধনীতে বলা হইয়াছে যে, কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনের বিধান মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ডিক্লারেশন নাকচ অর্থাৎ প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। এই গুজব শুধু সারা দেশেই ছড়াইয়া পড়ে নাই, বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্র-পত্রিকায়ও এই গুজবকে ভিত্তি করিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে এই ধরনের সংবাদ প্রকাশ বা জল্পনা-কল্পনা হওয়া দেশের মর্যাদার অনুকূল নয়। এই কারণেই আমরা বারে বারে সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার প্রতি জোর দিয়া আসিয়াছি। সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না থাকিলে পাঠকদের যেমনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি আস্থা থাকে না তেমনি বিদেশেও দেশের কোন মর্যাদা থাকে না। তথাপি সমঝোতার খাতিরে দেশের সংবাদপত্র সম্পাদকদের প্রতিষ্ঠান সি.পি.এন.ই ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নীতিমালা রচনা করেন। এই স্বেচ্ছামূলক নীতিমালায় সংবাদপত্র সম্পাদকরা সংবাদ পরিবেশন এবং মন্তব্য প্রকাশের উপর নিজেরাই কিছুটা বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। শুধু নীতিমালা রচনা করাই নয়, এই নীতিমালা যাতে সংবাদপত্র কর্তৃক

নিষ্ঠার সহিত পালন করা হয়, তাহা সুনিশ্চিত করার জন্য একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি কোর্ট অব অনারও গঠন করা হয়। দেশের শাসক মণ্ডলী সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলীর এই ব্যবস্থা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রেস সংক্রান্ত সকল আইন প্রাথমিক পর্যায়ে এক বৎসরের জন্য মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নীতিমালা গৃহীত হইবার পর মোটামুটিভাবে প্রেস ও সরকারের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিগত পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশরক্ষা আইন জারি করা হয়। আজ বাস্তবতঃ সেই জরুরী অবস্থা বিদ্যমান না থাকিলেও সরকার প্রেস সংক্রান্ত দেশরক্ষা আইনকে পৃথকভাবে গণ্য করিতে চান। তাঁদের বক্তব্য হইল যে, আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে দেশরক্ষা আইনকে প্রয়োগ করা হইলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কিছু নাই। প্রেস ও পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে, তার সহিত পরবর্তীকালীন দেশরক্ষা আইনের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আমরা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি। কেননা, (১) যুদ্ধকালে দেশে যে জরুরী আইন প্রবর্তন করা হইয়াছিল, তাহা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয় নাই বটে; তবে বাস্তবতঃ যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা আর বিদ্যমান নাই। (২) যে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তোলা হইতেছে, প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স এবং নিরাপত্তা আইনের প্রেস সংক্রান্ত ধারায়ও সেই একই বিধান ছিল। তাই সেই বিধান যদি প্রায় এক বৎসর যাবৎ মুলতবী রাখা সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেশরক্ষা আইনের সেই একই বিধান স্থগিত রাখা সম্ভব হইবে না কেন, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিবে। তদুপরি সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক রচিত নীতিমালায় সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে যে, সংবাদপত্রে কোন ভুল, অসত্য, অতিরঞ্জিত অথবা প্ররোচনামূলক কোন খবর প্রকাশিত হইলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করিতে হইবে এবং এই প্রতিবাদ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে 'কোর্ট অব অনারের' নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবেন। এমতাবস্থায় কোন সংবাদপত্র ভুল, অসত্য, অতিরঞ্জিত অথবা উস্কানিমূলক খবর পরিবেশন করিয়া 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষা বিঘ্নিত করিতে পারিবে–এইরূপ ধারণা পোষণের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা দেখি না। বরঞ্চ ভুল কিংবা উদ্দেশ্যমূলক খবর পরিবেশন করিয়া পরবর্তীকালে উহার প্রতিবাদ ছাপাইতে বাধ্য হইলে বরং পাঠকের চক্ষে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রকে হেয় প্রতিপন্ন হইতে হয়। বিশেষত: আজ যখন জনৈক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে কোর্ট অব অনারের কার্যক্রম পুরাদস্তরভাবে চালু হইয়াছে তখন শাসন কর্তৃপক্ষ প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের মত প্রেস সংক্রান্ত দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগও স্থগিত রাখিতে সম্মত হইতে পারেন। সরকারের মত আমরাও আশা

পোষণ করি যে, নীতিমালা ও কোর্ট অব অনারকে উভয় পক্ষ আন্তরিকতার সহিত সাফল্যমণ্ডিত করার সুযোগ দিলে সংবাদপত্র জগতে পাকিস্তান সুষ্ঠু সাংবাদিকতার একটি সুস্থ নজির স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে। বলা বাহুল্য, যে-কোন আইনের দোহাই দেওয়া হউক না কেন, সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ কিংবা হামলা করা হইলে দেশে-বিদেশে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিরাট জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি সকলের স্মরণ রাখা দরকার যে, নির্যাতনমূলক আইন কাহারও জন্য মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্যাতনমূলক আইনের প্রবক্তারাই উহার শিকারে পরিণত হন। কথায় বলে: পরের জন্য কুয়া খুঁদিলে নিজেকেই তাতে পতিত হইতে হয়।

শুধু সংবাদপত্র সম্পর্কেই নয়, দেশের সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারেও সহনশীল মনোভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় দেশেই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় না, বিদেশেও নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ৬-দফা একটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম। রাজনৈতিক পর্যায়ে ও নিয়মতান্ত্রিক পথে ইহার সমাধান কাম্য। ৬-দফার প্রবক্তারা ৬-দফা প্রোগ্রামকে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা বলিয়া গণ্য করেন। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ শুধু বিরোধী দলের দাবীই নয়, সরকারের বিঘোষিত নীতিও বটে। প্রচলিত শাসনতন্ত্রেও এই বৈষম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। বিতর্ক হইল আন্তরিকতা এবং মত ও পথ সম্পর্কে। ৬-দফা বৈষম্য দূরীকরণেরই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। সুতরাং রাজনৈতিক পর্যায়ে ইহার সমাধান দুরূহ ব্যাপার বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু ৬-দফার বিরুদ্ধবাদীরা ৬-দফা ফর্মুলার বিষয়বস্তুর কোন উল্লেখ না করিয়া যে-সকল অসংলগ্ন কথাবার্তার অবতারণা করিয়াছেন এবং ৬-দফার প্রবক্তাদের দেশরক্ষা আইনের বলে জেলে আটক করিতে শুরু করিয়াছেন, তাতে শুধু দেশেই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই, বিদেশী পত্র-পত্রিকায়ও ইহা লইয়া বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও নানান অবাঞ্ছিত জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। অপরপক্ষে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হইলে যে-সকল সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব ছিল, সহনশীলতার অভাবে সেই সকল সমস্যাকেই জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে; ফলে বিদেশেও পাকিস্তানের সুনাম ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইতেছে। আমরা যদি একটি নীতিতে সকলে একমত হইতে পারি যে, পাকিস্তান মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে জন্মলাভ করে নাই, বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থে এবং একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পেই পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা হইলে ৬-দফা ফর্মুলাকে নির্বিকার চিত্তে বিচার-বিবেচনা করিবার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হইতে পারে না। বরং

পাকিস্তানকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিতে এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় করিতে বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সর্বমহল কর্তৃক স্বীকৃত হইবে। জনগণের ধারে-কাছে না গিয়া যাঁরা আকাশের দিকে তাকাইয়া এই মর্মে বিবৃতি-বক্তৃতা দিতেছেন যে, ৬-দফার পিছনে জনসমর্থন নাই, তাঁরা নিজেরা আহাম্মকের স্বর্গে বসবাস করিতেছেন তাহাই নয়, জনগণের নিকট হাস্যস্পদ ও করুণার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

অবশ্য সমস্যা সমাধানের পথ কঠিন করিয়া তুলিবার পক্ষে ইহাদের 'অবদান' যথেষ্ট। আমরা জনমতের 'মনোপলি' দাবী করি না। তবে আমরা জনমতের যেটুকু খবর রাখি তাতে যাঁরা ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পিছনে জনসমর্থন নাই বলিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি ঝাড়েন তাঁদের প্রতি জনমত যাচাই করার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি। আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে আমরা সেই দাবী নিয়া আর কোন দিন মুখ খুলিব না। কেননা জনগণ যদি বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন শুধুমাত্র শেখ মুজিব কিংবা আমাদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত মাথাব্যথার কারণ হইতে পারে না। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে এই প্রদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন বলিয়া গণ্য করেন।

১৯৬৬ সালের ২ জুন 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ৬-দফা দাবি উত্থাপনের বিষয়টিকে যারা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করতে চায়, তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোন দলীয় ব্যাপার নয়। এই আন্দোলন কোন দলের ক্ষমতা দখলের আন্দোলন নয়, এটা পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত শোষিত সাড়ে ৫ কোটি মানুষের মুক্তির সনদ। তাই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাসীন দলকে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। এতে লেখা হয়:

৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সংশোধনী প্রস্তাব বর্তমান জাতীয় পরিষদে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা সকলেরই জানা ছিল। তথাপি এই সংশোধনী প্রস্তাব উপলক্ষে ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য শ্রবণের আর একবার সুযোগ মিলিল। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে শুধু প্রস্তাবিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই নয়; পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও প্রস্তাব ছিল। আশা করা

গিয়াছিল যে, এই সংশোধনীর উপর ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে এবং ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের বক্তব্য দেশবাসী জানিতে পারিবে। কিন্ত আইনমন্ত্রী মিঃ জাফর সংশোধনীর বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা না করিয়াই বিলটিকে 'আঁতুর ঘরে' বিনষ্ট করিয়াছেন, বিলের বিরোধিতা করিতে গিয়া আলোচ্য সংশোধনীর কোন সুনির্দিষ্ট সমালোচনা না করিয়া এই সংশোধনী প্রস্তাবকে দেশপ্রেমের খেলাফ ও জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি ৬-দফাকেই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য করেন নাই, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকেও জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধাচরণ করার সামিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগ দল সর্বশক্তি দিয়া ইহার বিরোধিতা করিবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনগণ মিলিয়াই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে এক ও অভিন্ন থাকিতে হইবে। বলাবাহুল্য, তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ৬-দফা কিংবা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবারই প্রস্তাব। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত মিঃ জাফরের এই মনগড়া মন্তব্য যে মূল দাবীর যৌক্তিকতা খণ্ডনে তাঁর অপারগতার নিদর্শন, আমরা এখানে শুধু সেইটুকু উল্লেখ করিতে চাই। পাকিস্তান সংগ্রামের পটভূমিকা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি যে 'আদর্শের' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কাহারও অজানা নাই। তবে যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে চান, তাঁদের পাকিস্তান আন্দোলনের সহিত কতটুকু কি সম্পর্ক ছিল, তাহা আমাদের জানা নাই। পাকিস্তান আন্দোলনের সহিত যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশেষভাবে জানা আছে। জনগণের সুখ-শান্তি বিধান, সকলের প্রতি ন্যায়বিচার এবং মূলতঃ একটি শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব হইতেই বাংলাদেশ জমিদারী প্রথা, মহাজনী প্রথা এবং অন্যবিধ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিল। ম্যাকডোনাল্ড এডওয়ার্ডের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের বিধান মতে বাংলাদেশে যখন মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তখন এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন সংশোধন এবং ঋণ-সালিসি বোর্ড স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থাদির মধ্য দিয়া জমিদারী ও মহাজনী প্রথাকে বহুলাংশে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী চাকুরী-বাকরীর ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতি প্রচলন ও উহা কার্যকরী করা হয়। বাংলাদেশের

এই রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমিকায় পাকিস্তানী আন্দোলনও সত্যিকার অর্থে এই প্রদেশেই জোরদার হইয়া উঠে। পাকিস্তান ইস্যুর উপর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে একমাত্র বাংলা দেশই গৌরবজনক বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যান্য প্রদেশের ফলাফল কি ছিল, তা' মিঃ জাফরের অজানা থাকার কথা নয়। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি লইয়া যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই প্রতিশ্রুতিকে কে বা কাহারা ব্যর্থ করিয়াছে, কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানে একটি কায়েমী-স্বার্থী মহল গড়িয়া উঠিয়াছে, কাদের স্বার্থপরতার দরুন আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে (যে বৈষম্য দূরীকরণে আরও ২০ বৎসর লাগিবে বলিয়া ক্ষমতাসীন মহলও স্বীকার করেন), মিঃ জাফর নিজের বুকে হাত দিয়া তার স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন কি? পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিবৃত্ত তাঁর জানা না থাকিতে পারে; কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহাতো তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তিনি আজ যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার মনগড়া অভিযোগ করিতেছেন, তাঁরাই কি উভয় অঞ্চলের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও সংখ্যাসাম্য নীতি মানিয়া নিবার জন্য জনগণকে সম্মত করেন নাই? পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কিংবা অপর অঞ্চলের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির কুমতলব যদি থাকিত তাহা হইলে বরং তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর জোর দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রেষা-রেষির সৃষ্টি করিতেন। মিঃ জাফর জানেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী তোলা হইলেও একটি বিশেষ কায়েমী স্বার্থী মহল উহার শুধু বিরোধিতাই করে নাই, রাজনীতিকদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষই করে নাই, জেল-জুলুম ও বিভিন্ন নির্যাতনের ষ্টীম রোলারও চালাইয়াছেন। ইহা কি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত ছিল না? শুভেচ্ছা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবের পটভূমিকার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেখানে এহেন দুষমনী আচরণের কি প্রয়োজন ছিল? রাষ্ট্রভাষা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নেও একই নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর জনমত যাচাই করা হইল, কিন্তু এই জনমতকে শুধু উপেক্ষা করাই নয়, উল্টা নির্যাতনের পথ বাছিয়া নেওয়া হইল। এক্ষণে ৬-দফার ক্ষেত্রেও একই নির্যাতন চলিতেছে।

মিঃ জাফর বলিয়াছেন যে, তাঁর মুসলিম লীগ দল সর্বশক্তি দিয়া ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিবে। কনভেনশন মুসলিম লীগ কি ধরনের মুসলিম লীগ এবং জনগণের উপর তাঁদের কতটুকু প্রভাব আছে কি নাই, তাহা আমাদের সম্যক জানা থাকিলেও রাজনৈতিক পর্যায়ে অর্থাৎ জনমতের ভিত্তিতে ইহার ফয়সালা করিতে চাহিলে আমরা উহাকে অভিনন্দিত করিব। মিঃ ভুট্টো ৬-দফার উপর

কনফ্রন্টেশনের তথা মোকাবিলা-সভার যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন, ৬-দফার প্রবক্তারা উন্মুক্ত মনে সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে দেখা গেল যে, 'মোকাবিলা সভা' অনুষ্ঠান বা জনমত যাচাইয়ের পথ পরিহার করিয়া ৬-দফার প্রবক্তাদের দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হইল। ইহা শুধু অগণতান্ত্রিক ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাই নয়, যাঁরা জনগণের নামে দোহাই পাড়েন সেই ভুট্টো-জাফর সাহেবদের দুর্বলতারও নিদর্শন। ক্ষমতা হাতে থাকিলে নির্যাতনের পথ বাছিয়া নেওয়া বীরত্বের কিছু নয়। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রতিক্রিয়াশীল মহল নির্যাতনের আশ্রয় নিয়াও যেমনি বাংলা ভাষা যুক্ত নির্বাচন প্রভৃতি ন্যায়সঙ্গত দাবীকে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, তেমনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত দাবীও নির্যাতনের পথে দাবাইয়া রাখা যাইবে না।

অবশ্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইতিমধ্যেই এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অঞ্চলে অঞ্চলে এবং এই প্রদেশের বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গতকল্যকার ঢাকার একটি ইংরেজী দৈনিকে উর্দু 'জং' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তার প্রতি আমরা সরকারী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আলোচ্য বিবরণীতে স্থানীয় অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কল্পিত অভিযোগই করা হয় নাই, পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী অবাঙ্গালীদের সংখ্যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁপাইয়া-ফুলাইয়া ৮০ লক্ষে তোলা হইয়াছে; এবং ঢাকার টেলিভিশনের গ্রাহকদের শতকরা ৯০ ভাগ অবাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও টেলিভিশনে বাংলা প্রোগ্রাম প্রায় একচেটিয়া–এই অভিযোগও করা হইয়াছে। অপরপক্ষে স্থানীয় একটি বাংলা দৈনিকে কয়েক দিন পূর্বে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আমরা "মাঝে মাঝে" পূর্ব বাংলা, দক্ষিণ বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রাদেশিকতায় উস্কানি দিতেছি এবং জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরাইতেছি।

প্রথমত:, পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙ্গালীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ এবং টেলিভিশনের গ্রাহকদের শতকরা ৯০ জন অবাঙ্গালী এবং ঢাকা শহরের শতকরা ৬০ ভাগ অধিবাসী উর্দুভাষী-'জং' পত্রিকাটি এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিল তাহা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙ্গালীর সংখ্যা কোনক্রমেই ৬/৭ লক্ষের অধিক হইবে না। তাই এই অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করিয়া 'জং' পত্রিকা কাকে বিভ্রান্ত করিতে চায়, আর বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি? কথায় বলেঃ 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।' অতীতে কোন গণ-দাবী জোরদার হইয়া উঠিলে একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মানুষে মানুষে এবং অঞ্চলে অঞ্চলে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া কি অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহা আজও বিভীষিকার মত মানুষের স্মৃতিপটে জাগ্রত রহিয়াছে। 'জং'

পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলক আচরণকে আমরা তাই অত্যন্ত উস্কানিমূলক বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয়ত:, ঢাকার যে বাংলা দৈনিকটি চিঠি-পত্র স্তম্ভে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমরা "মাঝে মাঝে" পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব বাংলা এবং এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দিতেছি তাঁদের প্রচারণার উদ্দেশ্যও একই। সরকারী পর্যায়েও অনেক সময় উত্তর বঙ্গকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়। পরিষদের বিবরণী হইতেও ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা পূর্ব পাকিস্তান লিখিয়া থাকি; কিন্তু মাঝে মাঝে কেহ পূর্ব বাংলা বলিলে বাংলা দৈনিকটির এত গাত্রদাহ দেখা দেয় কেন? এই সেদিন যখন 'উল্কা' নামে একটি নূতন ট্রেন চালু করা হয় তখন উহার ইঞ্জিনের সম্মুখভাগে বাংলা 'উল্কা' না লিখিয়া ইংরেজীতে লেখা হইল কেন, সেই অভিযোগ তুলিয়া এই পত্রিকাটির কি চিৎকার। প্রথম পৃষ্ঠায় সেই ইঞ্জিনের ছবি ছাপাইয়া এক লম্বা ডেসপাস তৈরী করিয়া কি মাতম না করা হইয়াছিল! তাই যেখানে পূর্ব বাংলাই পূর্ব পাকিস্তান, সেখানে মাঝে মাঝে পূর্ব বাংলা লিখিলে এবং উত্তরবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ বলিলে কি অশুদ্ধ হয়? আমরা তো আর ছদ্মবেশী কিংবা পরগাছা নই! আমরা বাঙ্গালী, ভাষা ও ঐতিহ্যের দিক দিয়া ইহা কে অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচ, সিন্ধী মিলিয়াই তো আমরা পাকিস্তানী। এই পরিচয় কি কেহ বাদ দিয়াছে? আমাদের স্মরণ আছে যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পাঠানের পোষাক পরিহিত অবস্থায় ছবি গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহা প্রচার দফতর কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। পাঠান নিজেকে পাঠান, পাঞ্জাবী নিজেকে পাঞ্জাবী বলিলে অপরাধ কোথায়? অবশ্য পরিচয়বিহীন অথবা পরগাছা শ্রেণীর লোকেদের হয়ত পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য মুছিয়া দিয়া পাকিস্তানকে একটি ঐতিহ্যবিহীন কিম্ভুতকিমাকার জাতিতে পরিণত করিবার বদ্‌খেয়াল থাকিতে পারে। পাকিস্তানীদের অন্ধ ও ঐতিহ্যহীন জাতিতে পরিণত করিবার উদ্ভট প্রচেষ্টা অতীতেও লক্ষ্য করা গিয়াছে। কতিপয় বিকৃত চিন্তাধারার লোক আরবীকে–যাহা পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই ভাষা নয়–রাষ্ট্রভাষা করার উদ্ভট পরিকল্পনা নিয়াও হৈ-চৈ করিয়াছিল। আমাদিগকে খোঁচা দিবার মধ্যে সেইরূপ কোন উদ্ভট পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মহলের আছে কি-না, না ইহা জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা হইতে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা–তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যাঁরা আমাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করার দৃষ্টতা প্রদর্শন করেন এবং কখনও বা অতি বাঙ্গালী এবং কখনও বা জাতীয় সংহতির একচ্ছত্র এজেন্ট সাজেন, সেই পত্রিকা মহলকে দেশবাসী ভাল করিয়াই চিনে।

যাই হউক, মিঃ জাফর ও তাঁর দল ৬-দফার তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করুন তাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু এই সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক পর্যায়ে এবং জনমতের ভিত্তিতে করা হউক এবং ক্ষমতাসীন দল নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। তাঁদের অসংলগ্ন উক্তি এবং নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ দেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতেছে না, বিদেশেও নানা ধরনের অবাঞ্ছিত জল্পনা-কল্পনার খোরাক যোগাইতেছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর জনমত যাচাই করিলে যেখানে সব কিছু সুরাহা হইতে পারে, সেখানে ভিন্ন পথ অবলম্বনের প্রয়োজন কোথায়? জবরদস্তিমূলকভাবে বা শিখণ্ডি দাঁড় করাইয়া জন-দাবীকে নস্যাৎ করা যায় না, মিঃ জাফর ও তাঁর দলীয় লোকেরা পাকিস্তান সংগ্রামের ইতিহাসের পাতাগুলি উল্টাইলেই তাহা লক্ষ্য করিবেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তথা ৬-দফা কোন দলীয় প্রোগ্রাম নয়, এই আন্দোলন কোন দল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের আন্দোলন নয়; ইহা নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'- এই নীতির ভিত্তিতে রচিত। ইহা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত শোষিত সাড়ে ৪ কোটি মানুষের মুক্তির দিশারীও বটে; ইহা পাকিস্তানকে একটি শোষণহীন সুখী-সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার এক সুনির্দিষ্ট সনদ। তাই এই আন্দোলন বৃহৎ জনসমষ্টির আন্দোলন। ইহা নেতৃত্বের লড়াই নয়, সস্তায় নাম কেনার ব্যাপারও নয়; জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কে কত নির্যাতন ভোগ করিতে পারেন, এ তার এক মহা অগ্নি পরীক্ষা। ব্যক্তি বিশেষ বা দলবিশেষের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগে নির্যাতন চালাইয়া ইহার গতিরোধ করা সম্ভব নয়।

১৯৬৬ সালের ৫ জুন 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ছয়দফা কর্মসূচিকে দমানোর জন্য কোর্ট, গণমত বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আগানোর পরিবর্তে ধর-পাকড় ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয়ায় ক্ষমতাসীনদের প্রতি নিন্দা জানানো হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা কর্মসূচিকে যারা জাতীয় সমস্যা সমাধানের এবং গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট কর্মসূচি বলে মনে করেন, তাঁদের নির্যাতন করে নিরুৎসাহিত বা নীতিচ্যুত করা যাবে না। তাই দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থে ক্ষমতাসীন দলকে ধরপাকড়, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতনের পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সমস্যা সমাধানে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

৬-দফা মোকাবিলার জন্য ক্ষমতাসীনরা শেষ পর্যন্ত 'সহজ' পথই বাছিয়া লইলেন। দেশরক্ষা আইনে ধরপাকড় শুরু হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের সভাপতি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ, শ্রম দফতরের সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, সমাজকল্যাণ দফতরের সম্পাদক–এক কথায় বলিতে গেলে প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল কর্মকর্তা আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ইহাদের ছাড়াও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি, সিটি সভাপতিসহ বহু বিশিষ্ট কর্মীকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং মফস্বল হইতেও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কর্মীদের ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যাইতেছে। ক্ষমতাসীনরা যদি এই 'সহজ' পথে ৬-দফার মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের শত অনুরোধ-উপবোধ কাজে আসিবে না, জানি।

কিন্তু ইতিপূর্বে বলা হইয়াছিল যে, ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিক পর্যায়ে ৬-দফার মোকাবিলা করিবেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টো এই পথেই অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু তাঁর দলীয় লোকেরাই তাঁকে কার্যতঃ নিরুৎসাহিত করেন। ইহার কারণ কাহারও অজানা ছিল না। রাজনৈতিক পর্যায়ে কোন সমস্যা মোকাবিলা করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট দলের জনগণের মধ্যে সমর্থন থাকা প্রয়োজন। কনভেনশন লীগের জনপ্রিয়তা কতটুকু আছে কি নাই, তাহা আমাদের ত বটেই, দেশবাসীরও অজানা নাই। ইহার জন্য কনভেনশনপন্থীদের দোষারোপ না করিয়া প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থাকেই দায়ী করা উচিত।

প্রথমতঃ প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা জনগণের মনঃপুত নয়। কেননা, ইহা দ্বারা জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের যে অধিকার ছিল তাহা খর্ব করিয়া দেশের মাত্র ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। আর এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভোট নিয়া–কেহ প্রলোভনে কেহবা দায়ে ঠেকিয়া কি সব আচরণ করিতেছেন, তাহাও দেশবাসীর চক্ষু এড়ায় না। স্বভাবতঃই এই ব্যবস্থা সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে, দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বসাধারণ এই মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। অথচ ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে কনভেনশন লীগপন্থীদের এই ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দিতে হইতেছে। এমতাবস্থায় যাঁরা 'মৌলিক গণতন্ত্র' সমর্থন করেন, তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন কুড়ান–এমন কি তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, মৌলিক গণতন্ত্রী বিধান ও জনগণের দাবী-দাওয়া পরস্পরবিরোধী। অধিকন্তু মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যেও বহু সদস্য রহিয়াছেন–যাঁরা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটাধিকার পুনঃ প্রচলনের পক্ষপাতী। এই দিক দিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র অংশকেই কনভেনশন লীগপন্থীরা প্রভাবিত করিতে পারেন [তাহাও সরকারী

আনুকূল্যে]। কিন্তু তাঁদের আনুপাতিক হার বড় জোর দুই হাজারে একজন মাত্র। জনসমর্থনের এই দীনতা লইয়া ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক পর্যায়ে ৬-দফার মোকাবিলা করিতে পারেন না। ইহা সাধারণ জ্ঞানের কথা। 'ডুডও খাব টামাকু খাব–' এ নীতি তো জনগণ দ্বারা সমর্থন করানো যায় না। তাই রাজনৈতিক পর্যায়ে ৬-দফার মোকাবিলা করা হইবে বলিয়া মুখে তোড়জোড় করা হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এদিকে তাঁদের কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ৬-দফা কর্মসূচীতে যে-সকল দাবী-দাওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাতে উভয় অঞ্চলকে সমান সুযোগ ও সমান অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই সকল দাবী দাওয়ার উল্লেখ করিয়া ৬-দফার প্রস্তাবকে খণ্ডন করার পক্ষে জনগণের গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তিতর্ক উত্থাপন করাও ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণেই ক্ষমতাসীনদের পক্ষ হইতে ৬-দফার বিষয়বস্তু উল্লেখ না করিয়া ৬-দফার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এবং বৈদেশিক শক্তির সহিত হাত মিলাইবার অলীক অভিযোগ করা হইতেছে। ৬-দফার প্রস্তাবে কোথায় কি আপত্তিকর ব্যাপার রহিয়াছে, ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক তার উল্লেখ করা সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা ৬-দফার বিরুদ্ধে যে-সকল আন্দাজী অভিযোগ আনয়ন করিতেছেন, জনগণ তার প্রতি কর্ণপাত করিতেছেন না। পক্ষান্তরে ৬-দফার প্রবক্তারা ৬-দফা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিতেছেন, তাকেই জনসাধারণ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ৬-দফায় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রহিয়াছে, তার বিরোধিতা করার পক্ষেও কনভেনশনপন্থীদের যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে। ৬-দফায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূরীকরণের যে সুপরিকল্পিত প্রস্তাব রহিয়াছে, তাতে কোন অন্যায় আবদার নাই, এক অঞ্চলের স্বার্থের বিনিময়ে অপর অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত স্বার্থ আদায়ের কোন সস্তা প্রস্তাব নাই। ৬-দফা যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে, তার মূল ভিত্তি হইল দেশে একটি শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং দেশে এমনি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা–যার সুফল কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট সর্বাগ্রে পৌঁছে। মোদ্দা কথা, যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থে রচিত ও কার্যকরী করা হইবে। ৬-দফায় বর্ণিত অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের মূল ভিত্তি হইলঃ নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে যতদূর সম্ভব সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার প্রস্তাব ছাড়াও ইহাতে বৈদেশিক লোন এবং দেশীয় সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার প্রস্তাবও রহিয়াছে, যাহা অর্থনৈতিক

উন্নয়নে বৃহত্তর জনসমষ্টি তথা দেশের কৃষক, শ্রমিক, মজদুর এবং সমাজের শোষিত-বঞ্চিত লোকদের ভাগ্য উন্নয়নের সহায়ক হয়। এক কথায়, ৬-দফায় প্রচলিত 'তেলে মাথায় আরও তেল দেওয়ার নীতি' অর্থাৎ ধনীকে আরও ধনী ও গরীবকে আরও গরীব করার নীতি পরিহার করিয়া জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী পেশ করা হইয়াছে।

তাই মূলতঃ ক্ষমতাসীনদলের এই দ্বিবিধ অসুবিধার দরুন তাঁরা ৬-দফাকে রাজনৈতিক পর্যায়ে মোকাবিলা করিতে অর্থাৎ জনমতের উপর ছাড়িয়া দিতে অপারগ ইহা আমরা বুঝি। কিন্তু তাঁদের এই দুর্বলতার জন্য ধরপাকড় ও নির্যাতনের মাধ্যমে ৬-দফার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেই রুদ্ধ করার নামান্তর হইবে। ইহা কখনও বাঞ্ছিত এবং দেশের জন্য মঙ্গলজনক হইতে পারে না। এতদসত্ত্বেও ক্ষমতাসীনদের যদি তাহাই লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁরা তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে পারেন।

দেশবাসী লক্ষ্য করিতেছে যে, আওয়ামী লীগ ৬-দফা তথা গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোথাও শান্তিভঙ্গ করে নাই কিংবা আইন অমান্য করে নাই। বরং শেখ মুজিবকে দেশরক্ষা আইনে আটক করার পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে যে-সকল হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাকেও সকলে শান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে। একটি বৈধ রাজনৈতিক দলের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জন্য ছাপান পোষ্টার প্রেস হইতে আটক করা এবং দেওয়াল হইতে তুলিয়া ফেলার কাজে পুলিস বাহিনীকে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠিয়াছে; প্রচারপত্র বিলির জন্য কর্মীদের গ্রেফতার করা হইতেছে। এখানে-ওখানে হুমকি ও আরও কত কি'র আশ্রয় নেওয়া হইতেছে। অবশ্য আমরা জানি, যাঁরা ৬-দফাকে জাতীয় সমস্যা সমাধানের এবং দেশে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট কর্মসূচী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁদেরকে হাজার নির্যাতনের মুখেও নিরুৎসাহিত কিংবা নীতিচ্যুত করা যাইবে না। আজ যাঁদের উপর নির্যাতন চালান হইতেছে, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা অতীতেও গণদাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন এবং বছরের পর বছর কারাজীবনের নিঃসঙ্গ ও দুর্বিষহ জীবন যাপন করিয়াছেন। আদর্শবাদী নূতন নূতন তরুণদের মধ্যেও আজ এই ত্যাগের প্রেরণা জাগিয়াছে। বস্তুতপক্ষে যাঁরা আদর্শ ও গণ-অধিকারে বিশ্বাস করেন, তাঁরা জানেন যে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নির্যাতন ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবে ইহাও নিশ্চিত যে, নির্যাতন ভোগ কখনও নিষ্ফল যায় না; গণ-ঐক্য বিধানে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠারই সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে যারা যুক্তির পথ ছাড়িয়া নির্যাতনের পথ অবলম্বন করেন, ইহা তাঁদের দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তবে কোন দাবী উত্থাপন করা হইলেই

কেন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করা হয় এবং ধরপাকড় শুরু হয় সেই প্রশ্নের জবাব দেশবাসী দাবী করিতে পারে। আমরা জানি, আমাদের যুক্তি-তর্ক আবেদন-নিবেদন সংশ্লিষ্ট মহলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না। কিন্তু তথাপি দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থে আমরা ক্ষমতাসীন মহলকে ধরপাকড়, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতনের পথ পরিহার করিবার জন্য আর একবার অনুরোধ জানাইতেছি। এমনিতেই দেশে সমস্যার অন্ত নাই, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও নানান তালগোল পাকানো হইয়াছে। এমতাবস্থায় অহেতুক দেশে নির্যাতন ও অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া ক্ষমতাসীনদের শান্তিপূর্ণ পথে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাদির সমাধানে সম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন করার ফলে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ধর-পাকড় এবং কলম আন্দোলন তথা লেখালেখি ও সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ইত্তেফাকের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতে মন্তব্য করা হয়, যে কর্মপন্থায় দেশবাসীর সার্বিক সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ থাকে, সেই পথ শত নির্যাতন করেও বন্ধ করা যায় না। পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তেমনি ক্ষমতায়ও কোন দল চিরদিনের নয়। তাই ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করা উচিত, যাতে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পরেও জনগণ তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখে। এই কলামে ছয়দফার প্রবক্তাদের জেল-জুলুম, হয়রানি ও নির্যাতনের পথ পরিহার করে ক্ষমতার অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

মানুষের হাত-পা ভাঙ্গা অবস্থায় জীবন-ধারণ যেমনি যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি বাক-স্বাধীনতা, সাধারণ নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্রের অধিকার খর্বিত হইলে উহা মানুষের মনকে পীড়িত এবং সংবাদপত্র পরিচালনা বিড়ম্বনাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্র যদি জনগণের সমস্যা, গণমনের জিজ্ঞাসা এবং দেশের চলতি ঘটনা প্রবাহের উপর স্বাধীনভাবে খবরাদি পরিবেশন করিতে না পারে; সংবাদপত্রকে যদি বিধি-নিষেধ ও কড়া আইনের অনুশাসনের মধ্যে কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে সংবাদপত্র পরিচালনার কোন সার্থকতা থাকে না। বিশ্ব সুন্দরী কিংবা অর্ধ উলঙ্গ ছবি ছাপিয়া অথবা পাতায় পাতায় গুরুত্বহীন সংবাদের উপর বড় বড় টাইপে ব্যানার হেড লাইন আঁটিয়া কিংবা দেশী সমস্যা ছাড়িয়া বিদেশী সমস্যা নিয়া ঝুলাঝুলি করিয়া সংবাদপত্র জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা চালাইতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সাংবাদিকতা

করিয়া সংবাদপত্র দেশবাসীর আস্থা অর্জন এবং জনমতকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারে না। সংবাদপত্রের উপর হামলা করা কিংবা সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা ক্ষমতাসীন মহলের দুর্বলতারই প্রমাণ। কিন্তু ইহা জানিয়া-শুনিয়াও দুর্বল ক্ষমতাসীন দল অতীতেও এদেশের সংবাদপত্রের উপর হামলা চালাইয়াছে, আজিকার শাসকরাও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন; বরং বর্তমান শাসককূলের থাবা আরও বড়। 'ইত্তেফাক' বারে বারে এই হামলার শিকারে পরিণত হইয়াছে; এই হামলার দরুন 'ইত্তেফাক' সর্বদা তার পাঠকবৃন্দ তথা জনসমষ্টির প্রতি সুবিচার করিতে পারে নাই। এইজন্য জনগণ যতদূর মর্মাহত হইয়াছে, আমরা তদপেক্ষা কম ত' নয়ই, বরং বেশী মর্মাহত। আমরা জানি, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই স্বাধীন মতাবলম্বী সংবাদপত্রের উপর হামলা করা হয়, আমরা বিশ্বাস করি যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের উপরই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের স্বার্থে 'ইত্তেফাকে'র পক্ষে যখন যেটুকু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হইয়াছে আমরা কখনও তাহা হইতে পিছুপাও হই নাই, দেশবাসীর সেই ইতিহাস সম্যকভাবেই জানা আছে।

এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদেরকে কথায় কথায় যেভাবে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয় এবং খুশি-খেয়াল মত জেলে নিক্ষেপ করা হয় তার অবসান কতদিনে হইবে, সেই জিজ্ঞাসাই দেশের মঙ্গলাকাংক্ষী মানুষ মাত্রেরই মনে জাগিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আজ পর্যন্ত গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যখন যে আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে তার একটিতেও আন্দোলনকারীরা নিয়মতান্ত্রিক পথ ছাড়িয়া অনিয়মতান্ত্রিক পথের আশ্রয় নিয়াছেন, এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট যে-কোন মহলকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারি। দেখা গিয়াছে, যে-কোন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হইলেই 'আইন ও শৃঙ্খলা' ভঙ্গের অলীক আশংকা প্রকাশ করিয়া শত শত নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রদেশের প্রত্যেকটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কালে শুধু নেতা ও কর্মীদের ধর-পাকড়ই নয়, বিভিন্ন পন্থায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই আচরণ লক্ষ্য করিলে মনে হইবে যে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা যেন 'ডিসপোজালের মাল; মনে হইবে, আমরা যেন ইজারার রাজ্যে বাস করিতেছি, ইজারাদার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে যখন যা' খুশী আচরণ করিতে পারেন; নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব, মান-মর্যাদা কোন কিছুই যেন নাই। রাষ্ট্রভাষা হউক, যুক্তনির্বাচন হউক, আঞ্চলিক বৈষম্য হউক, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন হউক–সব কিছুই জনগণের সমস্যা এবং যে-কোন ইস্যুর

উপর জনগণের সমর্থন না থাকিলে কোন রাজনৈতিক দলই সে ইস্যু বা প্রোগ্রাম নিয়া অগ্রসর হইতে পারেন না, উহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। এজন্যই যে-কোন সুস্থ বুদ্ধির লোক এবং জনগণের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি বা দল সকল রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক পর্যায়ে রাখিয়া জনমতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পথে সমাধানে যত্নবান হন। একমাত্র যাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থে প্রণোদিত, তাঁরাই সমস্যা-সমাধানের এই সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করিয়া থাকেন। কিন্তু নির্যাতনমূলক নীতির দ্বারা গণদাবীকে ঠেকাইয়া রাখা গিয়াছে, বিশ্বে তার কোন নজির নাই–এমনকি পাকিস্তানেও সে নজির নাই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, যুক্তনির্বাচন এবং ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের দিকে তাকাইলে সেই প্রমাণই মিলিবে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর এই প্রদেশবাসীর সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হইয়াছিল এবং জনগণের সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বহুলাংশে স্বীকৃতিও দেওয়া হইয়াছিল। আমরা বিশ্বাস করিতাম যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের আন্তরিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিলে পাকিস্তানে আজ সুষ্ঠু রাজনীতি এবং জনকল্যাণমুখী এবং সুষম অর্থনীতি প্রচলনের পথ সুগম হইয়া আসিত। কিন্তু যারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষাকরণ এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মরণপণ বিরোধিতা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিলেন, সেই মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থীর নিকট উভয় অঞ্চলের জন্য মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না। এদের স্বার্থপর কার্যকলাপের দরুনই আজ জনগণ বিক্ষুব্ধ এবং পূর্ণ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল মহল পূর্বেকার মত আজও মারমুখী হইয়া উঠিয়াছেন; অধিকার প্রতিষ্ঠার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য অতীতের সেই নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকেই তাঁরা ব্যাপক হারে চালাইয়া যাইতেছেন। ইতিহাসের পুরানো পাতাগুলি একবারও উল্টাইতেছেন না। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে আন্দোলন সর্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যে আন্দোলন ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের নেতৃত্বের কিংবা ক্ষমতা দখলের আন্দোলন নয়, যে আন্দোলনে নেতা ও কর্মীরা ধরপাকড় ও নানাবিধ নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইয়াছেন, সেই গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যর্থ হইতে পারে না; শত নির্যাতনের মুখেও অতীত আন্দোলন যেভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এইবারকার মানুষের বাঁচামরার তথা জীবন-জীবিকার আন্দোলনও আরও দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কিন্তু ক্ষমতাসীনদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, এই ধরপাকড় ও নির্যাতন কেন? কেন এই তিক্ততা সৃষ্টি? কেন নিজেদের মধ্যে এই মুখ চেনা-চেনি? শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়া পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে এবং একমাত্র শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব। কিন্তু কোন দাবী তুলিলেই গালাগালি, দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ, অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার অবতারণা এবং ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু হয়, সেখানে ইহা জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতির উপরই কি আঘাত হানা হইতেছে না? আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত–এই অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং যাঁরা সত্যিকার জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাস করেন–তাঁরা এই সম্পর্কিত দায়িত্ব অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নীরব থাকিতে পারেন না। প্রত্যেক বারের ধরপাকড়ের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের কতখানি হাত থাকে তাহা এই প্রদেশবাসীর কাহারও অজানা নাই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালেও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্ত সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া ৯২-ক ধারা শাসন প্রবর্তনকালে শেখ মুজিবসহ ৩ সহস্রাধিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তই দেখা গিয়াছিল। আজ শাসনতান্ত্রিক অবস্থা তদপেক্ষাও 'উন্নত' ধরনের; কেননা, এক্ষণে প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় প্রধানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে। সুতরাং আজ ৬-দফার প্রবক্তাদের ধরপাকড়, নির্যাতন ও ব্যাপক হয়রানির ব্যাপারে কেন্দ্র কোনক্রমেই তার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। বরং বর্তমান ব্যবস্থাধীনে ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদেরকেই বহন করিতে হইবে।

নির্যাতনের পথ সমস্যা সমাধানের পথ নয়, ইহা শুধু তিক্ততাই সৃষ্টি করে–একথা বারে বারে বলার প্রয়োজন নাই। দুনিয়ার দিকে তাকাইলে সর্বত্রই ইহার প্রমাণ মিলিবে। আমাদের দুঃখ হইল যে, কর্তা-ব্যক্তিরা এই পরিণতির কথা জানিয়া-শুনিয়াও নির্যাতনের এবং ত্রাস সৃষ্টির পথই বাছিয়া নিয়াছেন। আমরা এই দৃঢ়পথ পোষণ করি যে, যে-কোন ত্যাগের বিনিময়ে দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা ইহার বিপরীত পথে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাই নষ্ট হয় না, সকলেই নিরাপত্তা হারাইয়া ফেলেন। নির্যাতনের পথ হিংসা ও প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। সেক্ষেত্রে একদল ক্ষমতাসীন থাকাকালে অন্যদলের উপর নির্যাতন চালাইলে অন্যদল ক্ষমতা হাতে পাইলে তাঁদের মধ্যেও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রতিহিংসা প্রবণতা দেশে কখনও সুষ্ঠু রাজনীতি প্রচলনের সহায়ক হইতে পারে না। যে সকল দেশে ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া প্রতিপক্ষের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইয়াছেন, সেই সকল দেশের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, ক্ষমতার হাত বদলের পর সেখানে ব্যাপক

প্রতিহিংসামূলক নির্যাতন চালানো হইয়াছে। যারা ইতিপূর্বে জেলে ছিলেন তাঁরা জেল হইতে বাহির হইয়া মুক্ত বাতাস সেবন করিতেছেন, আর যাঁরা ক্ষমতায় থাকিয়া প্রতিপক্ষের উপর নির্যাতন চালাইয়াছেন এবং নিজেরা 'মুক্তবায়ু' সেবন করিতেন, তাঁরা আজ জেলের ভিতরে। যারা সত্যিকারভাবে নিজের ও দেশবাসীর স্বার্থে ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, এই ধরনের হিংসা নির্যাতন ও পাল্টা প্রতিহিংসা-নির্যাতন তাঁরা কখনও পছন্দ করিতে পারেন না। আমরা মনে-প্রাণে এই নীতিই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হইবার পূর্বে বিরোধীদলে থাকাকালে ক্ষমতাসীনরা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইয়াছিলেন, শত-সহস্র কর্মী ও নেতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায়, মানুষের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তদ্বারা যদি তাঁরা পরিচালিত হইতেন তাহা হইলে যাঁরা তাঁদের উপর নির্যাতন চালাইয়াছেন এবং শতশত নেতা ও কর্মীকে বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছেন, তাঁরা ক্ষমতাসীন হইবার পর কোন পরিণতির কথা চিন্তা না করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু যেহেতু যে-কোন সুস্থ মস্তিকের রাজনীতিক জানেন যে, নির্যাতন ও পাল্টা নির্যাতন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ সুগম না করিয়া ব্যাপক অশান্তি, ও রক্তারক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ত করে, সেইহেতু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হইতে শুধু বিরতই ছিলেন না, তাঁরা বিনা বিচারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দিয়াছিলেন এবং ক্ষমতাসীন থাকাকালে কাহাকেও আটক না করার নীতি কার্যতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ক্রমাগত নির্যাতনমূলক আচরণ লক্ষ্য করিয়া আমরা এই ভাবিয়া বিব্রতবোধ করিতেছি যে, দেশে কি তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে চান? আমরা নির্যাতনের ভয় করি না, ভয় করি তার পরিণামকে। আমরা ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অনিশ্চিত মনোভাব পোষণ করি না; কেননা আমরা জানি যে কর্মপন্থায় জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ থাকে, সেই কর্মপন্থা তথা দাবী সমূহকে অত্যাচার-নির্যাতন দ্বারা দাবাইয়া রাখা যায় না বরং উহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ক্ষমতায় কোন দল চিরস্থায়ী নয়, যাঁরা শুধু বহির্বিশ্বেই নয়, নিজ দেশেও ক্ষমতার রদবদল দেখিয়াছেন তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস করা উচিত যে, নির্যাতনের পথ অনুসরণ করিয়া কোন লাভ নাই। দুনিয়া চক্রাকারে ঘুরে, আজ যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, কাল তাঁরা ক্ষমতায় না-ও থাকিতে পারেন। তাই যাঁরা সত্যিকার গণ-স্বার্থে রাজনীতি করেন তাঁদের দেশবাসীর সম্মুখে এমনি নজির রাখিয়া

যাওয়া দরকার– যাহা ক্ষমতা হইতে বিদায়ের পরও দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে আদর্শের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁরা চিরকাল নির্যাতিত হন না; দুঃখ ভোগের পর সুখ আসে, পবিত্র কোরানও এই বাণী বহন করে।

১৯৬৬ সালের ৯ জুন 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ৭ জুন হরতাল দমনে সরকারের কঠোর অবস্থান উপেক্ষা করে প্রদেশজুড়ে হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং ছয়দফা আন্দোলনের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মুখোশধারী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি করুণা প্রকাশ করা হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, নিহত শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ৬ দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন আরও প্রেরণামূলক এবং আরও জোরদার হয়ে ওঠেছে। ক্ষমতাসীনদের শত নির্মম নির্যাতনের মুখেও এ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায়নি। তাই শত অত্যাচার ও প্ররোচনার মুখেও নিয়মতান্ত্রিক পথে এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে দুর্বার গণ ঐক্য গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এতে লেখা হয়:

জাতীয় স্বার্থে এবং জনগণের বাঁচিবার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রক্তদান ও নির্যাতন ভোগ কখনও বিফলে যাইতে পারে না; তাহা হইলে দুনিয়ার গোটা ইতিহাস মিথ্যা প্রমাণিত হইবে– এই মুহূর্তে নিহত, আহত ও নির্যাতনভোগকারীদের এবং নিহতদের পরিবার-পরিজনের প্রতি এই সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কিছু বলিবার নাই। ইহা দুর্ভাগ্যজনক হইলেও আমাদের দেশের রাজনীতির অভিশাপ এই যে, রক্তদান ছাড়া অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিও স্বীকৃতিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁরা মাতৃভাষার সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, তাঁদের ত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি চির অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁদের রক্তদানই পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আত্মচেতনা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহাই পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভেদ্য ঐক্য গঠনের সহায়ক হয় এবং সেই গণ-ঐক্যের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। শুধু তাই নয়, যুবকদের এই রক্তদান, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এদেশের রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ ঘটায় এবং আত্মত্যাগের প্রেরণা যোগায়, তাহাই এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আজও অনুপ্রাণিত করে। এই গণ-চেতনা ও গণ-আন্দোলনই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হয়; সেই আত্মত্যাগ ও গণ-চেতনা এদেশের পরবর্তীকালীন

সকল গণ-আন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং গণ-ঐক্যের পথ-নির্দেশক হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। সেই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়াই আজ ৬ দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং বাঁচা-মরার দাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুধু জোরদার হইয়াই ওঠে নাই, প্রতিপক্ষের শত ভ্রূকুটি, শত নির্যাতনের মুখেও নিয়মতান্ত্রিক পথে এই আন্দোলন দুর্বার গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই গণ-চেতনা ও গণ-অনুভূতিকে যাঁরা গোপন বা দাবাইয়া রাখিতে এখনও হাল ছাড়েন নাই, তাঁদের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়। ছাই দিয়া যেমনি আগুন ঢাকা যায় না, তেমনি গণ-দাবী এবং প্রকৃত ঘটনাবলীকে কোন পন্থায়ই লুকাইয়া রাখা যায় না। গণ-বিরোধী শক্তির একমাত্র হাতিয়ার নির্যাতনের পথকে তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আঁকড়াইয়া থাকিবেন, জানি। কিন্তু যেখানে জনতার দুর্বার ঐক্য গড়িয়া উঠে, সেখানে মানুষ নির্যাতন ভোগ, এমনকি রক্তদানেও কাতর নয়, পূর্ব পাকিস্তানের শহরে-বন্দরে-গ্রামে সর্বসাধারণ সেই ইতিহাসই রচনা করিয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের এই দুর্বার গতি সত্যিই প্রেরণামূলক।

৬ দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগ হইলেও আজ ৬-দফার আন্দোলন দেশের বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, যুবক, কৃষক-মজদুর-এর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে; গোটা দেশবাসী আজ এই আন্দোলনের সহিত জড়িত। যাঁরা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের জেলে নিক্ষেপ করিয়া ও ব্যাপক ধরপাকড় ও ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, আন্দোলন ব্যর্থ না হইয়া পারে না–তাঁরা নিরাশ হইয়াছেন। যে আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়, তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইয়া বা অলীক–অসত্য অভিযোগ করিয়া গণমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় না–এদেশের সচেতন জনসাধারণ তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া সে প্রমাণ পুনরায় হাজির করিলেন।

প্রসঙ্গতঃ যাঁরা বিরোধীদলীয় সাজিয়া বিশেষতঃ প্রগতির মার্কা আঁটিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বানচাল করিবার জন্য নানা অপকৌশলের ও অপ-প্রচারের আশ্রয় নিয়াছিলেন, দেশবাসীকে ইতিপূর্বে তাঁদের উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। ঢাকা ও প্রদেশের অন্যত্র যে নজিরবিহীন দুর্বার গণ-ঐক্য লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে, জনগণ মানুষ চেনে এবং মতলববাজ, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা যে আবরণেই জনগণকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে চাউক, সচেতন জনগণ তাহা ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম। প্রগতির মা-বাপ এবং আন্তর্জাতিক নেতা সাজিয়া যারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশী-বিদেশী স্বার্থের পায়রবি করিতেছিল; যাঁরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবীর মধ্যেই নয়, দেশের নিরন্ন নিঃসম্বল, বেকার, দারিদ্র্য–প্রপীড়িত জনগণের জন্য খাদ্য আন্দোলনের মধ্যেও মার্কিন

সি,আই,এ'র হস্ত আবিষ্কার করে, দেশের বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, চাষী, মজদুর, যুবসমাজ সকলেরই সেই মতলববাজ তথাকথিত বামপন্থী আন্তর্জাতিক পেশাদারদের আসল মতলব ধরিয়া ফেলিয়াছে। যাঁদের দেশবাসীর সমস্যা, জনগণের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কোন মাথা ব্যথা নাই, যারা প্রগতির লেবাস পরিয়া, সমাজতন্ত্রের একচ্ছত্র জিম্মাদার সাজিয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহিত হাত মিলান, পুঁজিপতিদের 'ফ্রন্টসম্যান' বনিয়া ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন, সেই সুযোগসন্ধানীদের নগ্ন চেহারা জনগণের নিকট ধরা পড়িয়াছে। ভেড়ার গায়ে বাঘের চামড়া পরাইলে ভেড়া যেমনি বাঘ বনিয়া যায় না; তেমনি দেশী-বিদেশী স্বার্থের যারা পায়রবি করে, তারা বিপ্লবী শ্লোগান আওড়াইলে কিংবা 'আন্তর্জাতিক' সাজিলে নিজেদের চরিত্র ঢাকা দিতে পারে না। আজ এরা জনগণের নিকট নগ্নভাবে ধরা পড়িয়াছে এবং জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ইহাদের সম্পর্কে দেশবাসীর সতর্ক থাকার প্রয়োজন রহিয়াছে। ধরা পড়ার পরে এক্ষণে এই তথাকথিত আন্তর্জাতিক বহুরূপীরা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। যেখানে তারা বাধার সৃষ্টি করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে, সেখানে আজ সহযোগিতার ভান করিয়া 'সর্বদলীয়' আন্দোলন গড়িবার প্রস্তাব নিয়া পুনরায় জনগণের কাছে ভিড়িবার প্রচেষ্টা চালাইতে পারে। কিন্তু যাদের গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ দেশবাসীর নিকট হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে, যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছে, সেই সুবিধাবাদী গণ-বিরোধী চক্রকে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হইতে দিবার ঝুঁকি হইল : তারা সুযোগ পাইলে পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিয়া আন্দোলনকে বানচাল করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? ঐ চিহ্নিত লোকগুলি ছাড়া এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সম-মতাবলম্বী যাঁরাই অংশগ্রহণ করিবেন, তাঁদের জন্য সর্বদাই দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে। তবে ইহার মধ্যেও যদি কেহ নেতৃত্বের দরকষাকষি করিতে চান, তবে তাঁদের প্রতি তাকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের নেতৃত্বের বা ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নাই; ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়াই সংগ্রামী নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে এবং বর্তমান আন্দোলন সফল হইলে জনগণই দেশের প্রকৃত ভাগ্য নিয়ন্তা হইবে। সেখানে ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের সহিত নেতৃত্বের ভিত্তিতে বা দলীয় ভিত্তিতে দরকষাকষির কোন প্রশ্নই নাই। এই স্বার্থের ভাগাভাগিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইলে বরং মূল আন্দোলনই পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯শে মে'র 'রাজনৈতিক মঞ্চে' লিখিয়াছিলাম ঃ কর্মপন্থায় মিল না থাকিলে

বিরোধীদলীয় ঐক্য গঠন মূলহীন হইয়া পড়ে। আমরা জনমতের যেটুকু খবর রাখি, তাতে বলিতে পারি যে, জনগণও সুষ্ঠু কর্মপন্থার ভিত্তিতে ঐক্য চান, শুধু ঐক্যের খাতিরে অথবা অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য ঐক্য চান না। ইহা সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, শেষ পর্যন্ত জনগণের সমর্থনের ওপরই কর্মপন্থাভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষমতা নির্ভর করে। কতিপয় পরস্পর-বিরোধী মতাবলম্বী বিরোধীদলের সমন্বয়ে ঐক্য গঠিত হইলে তাহা আর যাই হউক, দেশবাসীর ঈপ্সিত কর্মসূচীর সাফল্য নিশ্চিত করিতে পারে না; বরঞ্চ যাঁরা ৬ দফার বিরোধী তাঁদের সহ সকল বিরোধীদলের ঐক্য গঠনের অর্থ দাঁড়াইবে ৬ দফাকে হিমাগারে গচ্ছিত রাখা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করা। ৬ দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগ হইলেও তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, "ইহা কোন দলীয় প্রোগ্রাম নয়, ইহা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রামের ভিত্তিতে তাঁরা সকল দলের সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। ৬ দফার আন্দোলন কোন দলবিশেষের আন্দোলন নয়, ইহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

৬-দফার আন্দোলনকে দমাইয়া দেবার জন্য যে নির্মম পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেও আজ এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যে, জনগণ ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁরা প্রতিপক্ষের ভ্রূকুটিতে ভড়কাইয়া যান নাই কিংবা প্রগতির বুলিসর্বস্ব তথাকথিত আন্তর্জাতিক নেতাদের দিকে নেতৃত্বের জন্য তাকাইয়া থাকেন নাই। নিজেদের আন্দোলনের সাফল্য নিজেরাই নিশ্চিত করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। আন্দোলনের গতিধারা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে, রক্তদানের বিনিময়ে বাংলা ভাষায় আন্দোলন যেভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, ইনশাল্লাহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাফল্যও সেইভাবে নিশ্চিত হইল। রক্তদান এবং নির্যাতন ভোগ কিছুতেই বৃথা যাইবে না। যে দুর্বার গণ-ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাকে অক্ষুণ্ন রাখা এবং শত অত্যাচার ও প্ররোচনার মুখেও নিয়মতান্ত্রিক পথে আগাইয়া যাওয়াই এখন দেশবাসীর কর্তব্য।

১৯৬৬ সালের ১৫ জুন 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের আরেকটি পর্ব প্রকাশিত হয়। এই কলামে ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে মি. সুলেরীকে অহেতুক বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, মি. সুলেরী তার লেখনীতে ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে 'ভূত' আবিষ্কার করলেও জনগণ

তা বিশ্বাস করবে না। ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ব পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যা, এটা তাদের বাঁচার দাবি। তাই ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাব পরিত্যাগ করে উভয় অঞ্চলের সকল দাবি দাওয়ার ন্যায়সঙ্গত সমাধানে মি. সুলেরী সাহেবদের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জাননো হয়। এতে লেখা হয়:

> আমরা জানি মিঃ সুলেরী কোন মতবাদের কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তথাপি তাঁর লেখনী দ্বারা অঞ্চলবিশেষের গণমনকে বিষাক্ত করা সম্ভব জানিয়া তিনি সাম্প্রতিককালে লাহারে বসিয়া যখন ৬-দফা এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়া গবেষণা চালাইতে শুরু করেন তখন আমরা তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম, যাতে তিনি সরেজমিনে এখানকার গণমনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদের সেই প্রস্তাব মানিয়া নেন নাই। বরং অবিরাম গতিতে তিনি আবোল-তাবোল 'গবেষণা' চালাইয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যে মর্মান্তিক কাণ্ড-কারখানা অনুষ্ঠিত হইল তার উপরও লাহোরে বসিয়া তিনি আন্দাজী গবেষণা চালাইয়াছেন।
>
> 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপান এবং বেকায়দা দেখিলে এক ডাল ছাড়িয়া অন্য ডাল ধরা বন্ধুবর সুলেরীর স্বভাব। যদিও আমরা জানি তাঁর এই একচোখা লেখা পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না; কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে, বন্ধুবর সুলেরীর মত কতিপয় লোকের একদেশদর্শিতা ও বিদ্বেষমূলক লেখনী পাকিস্তানে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী বেলুচ প্রভৃতি আঞ্চলিক মনোভাবের জন্ম দিয়াছে; মুষ্টিমেয় লোকের প্রাধান্য বিস্তারের প্রবৃত্তি পাকিস্তানে আঞ্চলিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ বন্ধুবর সুলেরীর লেখনী হইতে সর্বদাই মনে হইবে যেন বাঙ্গালীরা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানীরা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত এবং একমাত্র সুলেরী সাহেবরাই সর্বদা 'জাতীয় স্বার্থ' ও 'জাতীয় ভাবধারার' দ্বারা পরিচালিত হন। এই চিন্তাধারা হইতেই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের কোন ন্যায্য দাবীকেও সহজভাবে ও উন্মুক্ত মনে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন না। অথচ প্রকৃত অবস্থা হইল যে, পূর্ব পাকিস্তানই সর্বদা প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে রহিয়াছে; জাতীয় সংহতি, উভয় অঞ্চলের মধ্যে সম্প্রীতি এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি নজর রাখিয়াই প্রয়োজনবোধে নিজেদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া খর্ব করিয়াছে। এই প্রদেশ হইতে প্রথম গণ-পরিষদে ৬/৭ জন অবাঙ্গালী সদস্য নির্বাচিত করা হইয়াছিল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও পূর্ব পাকিস্তান একমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তুলে নাই। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উঠিতেই তাঁরা বাংলা ও উর্দু-উভয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব

দিয়াছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর প্রাধান্য বিস্তারেরর স্বপ্ন কখনও দেখেন নাই। বরং পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনোস্তুষ্টির জন্য এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার খাতিরে সংখ্যা-সাম্য নীতি মানিয়া নেয়। ইহা দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেন্টে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করিতে সম্মত হয় তাহাই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ১ কোটি অতিরিক্ত লোকের বোঝা নিজেরা বহন করিতে সম্মত হয়।

এত সব কিছুর পরেও সুলেরী সাহেবরা যদি আজও মনে করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে যে-সকল দাবী-দাওয়া উত্থাপিত হইতেছে, তাহা অন্যায় ও অযৌক্তিক এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দ্বারা দাবী করেন তাদেরকে বাদ দিয়া উভয় অঞ্চলের যাঁরা 'জাতীয় সংহতি'তে তথা 'এ জাতিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সমাবেশ ঘটাইয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিরোধ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁদের পক্ষপাতমূলক মনোভাব সম্পর্কে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সুলেরী সাহেব কাদের স্বার্থে এই ফ্যাকড়া তুলিয়াছেন, কিংবা কেনই-বা তিনি লাহোরে বসিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা না জানিয়া গবেষণা চালাইতেছেন এবং প্রতিকারের উদ্ভট নো সা বাতলাইতেছেন তাহা আমরা জানিনা। তবে আমরা তাঁকে এইটুকু বলিতে পারি যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য নাই। আওয়ামী লীগের ডাকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সেই প্রমাণই উপস্থিত করিয়াছে; দলগতভাবে বিচার করিতে গেলেও এন, ডি, এফ, ন্যাপ, এমনকি জামাতে ইসলামী প্রভৃতি দলও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী নয়। ন্যাপের টাইটেল সর্বস্ব সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ওসমানী পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করিয়া শেখ মুজিবরকে এক তুবড়িতে উড়াইয়া দিতে কিংবা ৬-দফাকে 'বাজে' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। কিন্তু ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক ঢাকা অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' দাবী করা হইয়াছে এবং ৬-দফা নয়, এক লাফে চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পাস করিয়াছেন। [অবশ্য ন্যাপ প্রোগ্রামের দিক দিয়া কাহারও পিছনে তো নয়ই, বরং অপরদের অপেক্ষা অগ্রগামী। অন্ততঃ কাগজপত্রে তাঁরা তাহাই বুঝাইতে চান। তবে পার্থক্য হইল এই যে, তাঁরা বিশেষ কারণে মাঠে নাই এবং ওসমানী সাহেবদের মত বড় বড় নেতাদের স্নেহে গায়ে আঁচড় লাগাইতে রাজী নন।]

আওয়ামী লীগ ও অপরাপর দলের মধ্যে পার্থক্য, আওয়ামী লীগ মাঠে আছে, তাঁরা সংগ্রামরত এবং নির্যাতন ভোগ করিতেছে; অপররা মাঠে নাই, নির্যাতন ভোগ করার প্রশ্নও নাই।

সুতরাং ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে সুলেরী সাহেবরা 'জাতীয় চেতনায়' উদ্বুদ্ধ যে 'শক্তির' সমাবেশ ঘটাইতে চান, এই অঞ্চলে 'মৌলিক' গণতন্ত্র' প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই তথাকথিত 'জাতীয় শক্তির' সমাবেশ বহু পূর্বেই ঘটান হইয়াছে। কিন্তু সুলেরী সাহেবদের দুর্ভাগ্য, জনগণ হইতে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সুলেরী সাহেব আলোচ্য প্রবন্ধে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান আন্দোলন শুধুমাত্র বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং এই বৈষম্যও বিশেষ কিছু নয়। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে সব কিছুর ভুল ব্যাখ্যা দেন তাঁদেরকে প্রকৃত অবস্থা বুঝান দায়।

৬-দফা পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ কমসূচী। পূর্ব পাকিস্তানীরা রাজনৈতিক সচেতন; তাই তারা জানে যে, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর কিংবা অর্থনৈতিক অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। তাই ৬-দফায় দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ফেডারেল ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবী জানান হইয়াছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হইয়াছে এবং এই অধিকার শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য নয়, সমভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও দাবী করা হইয়াছে। নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাব দ্বারা পরিচালিত না হইলে এই দাবীকে প্রাদেশিকতা কিংবা বিচ্ছিন্নবাদিতার অপবাদ দেওয়া চলে না।

মিঃ সুলেরীর জানা উচিত যে, শাক দিয়া মাছ ঢাকার দিন চলিয়া গিয়াছে। জনগণের সহিত গত ১৮ বছর যাঁরাই যেখানে যে-পরিমাণ চালাকি করিয়া থাকুন, এক্ষণে কাহারও পক্ষে আর তার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়। আজ যাহা করা প্রয়োজন তাহা হইল, সমস্যাকে এবং জনগণের অনুভূতিকে অস্বীকার করা নয়; সমস্যাকে স্বীকার করিয়া নিয়া উহার ন্যায়সঙ্গত সমাধানে উদ্যোগী হওয়া। এই সরল মনোভাব নিয়া অগ্রসর হইলে পূর্ব পাকিস্তানীরা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিলে আমরাই তার বিরোধিতা করিব। সুলেরী সাহেবদের বৃথা কালি খরচা অথবা অযথা পণ্ডশ্রম করিতে হইবে না।

৬-দফা দেশবাসীর নিকট পেশ করা হইয়াছে; গায়ের জোরে কেহ ইহার স্বীকৃতি আদায় করিতে চায় না। গণভোটে বা যে-কোন গণতান্ত্রিক পথে ৬-দফা দেশবাসী কর্তৃক যাচাই করার ব্যবস্থা গৃহীত হইলে জনগণের রায় বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রতিবাদে মানিয়া নেওয়া হইবে। ৬-দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নবাদির লেশমাত্র কিছু নাই; ৬-দফা উভয় অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমতাবিধানে সক্ষম হইবে। যাঁরা এই

সমতা বিধানের বিরোধী, যেই মুষ্টিমেয় লোক ব্যবসা বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করিতে চান তাঁরা ছাড়া অন্য কাহারও এর বিরোধিতা করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং সুলেরী সাহেবরা ৬-দফা, তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে 'ভূত' আবিষ্কার করিলেও জনগণ তাহা বিশ্বাস করিবে না। ৬-দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ব পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যা, এটা তাদের বাঁচার দাবী। সুলেরী সাহেবদের 'প্রচ্ছন্ন হুমকিতে' দৌড়াইয়া পালাইবার উপায় নাই।

সুলেরী সাহেবরা প্রকৃত অবস্থাকে ধামা-চাপা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রাদেশিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া নির্যাতনের পথই আরও প্রশস্ত ও দীর্ঘায়িত করিতে পারিবেন, আমরা জানি; কিন্তু ইহা দ্বারা সমস্যা সমাধান তো নয়ই, বরং এমনি অবস্থার সৃষ্টি করা হইবে যেখান হইতে সমঝোতার পথে ফিরিয়া আসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সুলেরী সাহেবরা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে যত অপপ্রচার করুন না কেন, সত্য ঘটনা হইল যে, তারা জাতীয় সংহতির স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও সংখ্যা সাম্য মানিয়া নিয়াছেন, আজও তাঁরা যে দাবী তুলিয়াছেন তার মধ্যে কোন অঞ্চলের স্বার্থের বিনিময়ে কোন কিছু পাওয়ার আবদার নাই। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমতার নীতি সর্বজন স্বীকৃত, তাকেই বাস্তব রূপ প্রদানের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ৬-দফা। ইহাতেও যাঁরা চটিয়া যান, নির্যাতনের পথ অবলম্বন করেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞাস্য, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ১ কোটি লোকের অস্তিত্ব বিকাইয়া দিয়া সমতার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেখানে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের এই উদারতার বিনিময়ে কি করিয়াছেন? আজ যদি দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটাধিকার থাকিত, আজ যদি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্টের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে ৬-দফা, তথা সকল সমস্যার সমাধান সেই গণপ্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টের মাধ্যমে সমাধান করা যাইত। বর্তমান কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির ও নির্যাতনের কোন প্রয়োজন হইত না। আমরা এখনও এই পথেই ৬-দফা বর্ণিত দাবী-দাওয়ার ফয়সালা করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সুলেরী সাহেবদের শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করি ঃ দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকার জন্য কে বা কাহারা দায়ী? আমরা? সুলেরী সাহেবরা সুচতুর লোক বটে; দিনকে রাত ও রাতকে দিন বলিয়া প্রচার করার সার্মথ্য ও যোগ্যতাও তাঁদের আছে। কিন্তু এদেশের মানুষ নিরেট বোকা নয়। তাই যদি হইত তাহা হইলে শত প্রতিকূলতার মুখে পাকিস্তান অর্জন করা সম্ভব হইত না। অবশ্য এ-ব্যাপারে সুলেরী সাহেবদের অবস্থা ভিন্ন। কারণ তখন তাঁদের মধ্যে একদল নেতা ব্যক্তি স্বার্থের তাগিদে এদিক-ওদিক

খেলিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীরা একগুঁয়ে। তাঁরা যা বুঝেন সকলেই বুঝেন এবং ঠিকভাবেই বুঝেন। যুক্তি ছাড়া কু-যুক্তি কিংবা ধূম্র সৃষ্টির দ্বারা তাঁদেরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা নীতিচ্যুত করা চলে না। সুলেরী সাহেবদের লেখনীতে দেশে লংকাকাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে, আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতাই আমাদের এই আশঙ্কার মূল কারণ। কিন্তু এ-পথ ঠিক পথ নয়, এ-পথ শান্তির পথ নয়, এ-পথ জাতীয় সংহতির পথও নয়। আমরা জনগণের ভোটে ৬-দফা যাচাই করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। এমনকি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইহার সুষ্ঠু সমাধানেও প্রস্তুত। পরিশেষে বন্ধুবর সুলেরী সাহেবকে পুনরায় অনুরোধ করিব যে, প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া আন্দাজে রাজনৈতিক গবেষণা চালাইয়া অহেতুক বিদ্বেষ সৃষ্টি না করিয়া তিনি নিজে স্বচক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দেখিয়া যান।

চিঠিপত্রঃ

ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে চিঠিপত্র বিভাগে দৈনিক ইত্তেফাকে বেশ কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে প্রায় চিঠিতেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় ও দেশদরদী জনগণের ছয়দফা দাবির প্রতি সমর্থন এবং যারা এর বিরোধিতা করেছে তাদের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ প্রকাশিত এ ধরনের একটি চিঠির শিরোনাম ছিল: 'ক্ষমতাসীনদের ঘোষণা বনাম ৬-দফা'। চারজনের যুক্ত চিঠি ছিল এটি। চিঠিটি লিখেন আরামবাগ ঢাকা থেকে শেখ ফজলুল হক, মৌলবী বাজার ঢাকা থেকে মোঃ নিজামুদ্দিন, নওয়াবপুর হকার্স মার্কেট থেকে সিরাজউদ্দিন আহমদ, এবং নাজিরা বাজার, ঢাকা থেকে মোঃ সুলতান। চিঠিতে বলা হয়:

> প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জাতীয় পরিষদের এবারকার বসন্তকালীন অধিবেশনে ও পরবর্তীকালে মৌলিক গণতন্ত্রী সমাবেশে ক্রমাগত ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন যে, শক্তিশালী কেন্দ্র আমাদের অবশ্যই চাই। তাঁহার এই ঘোষণার মূল তাৎপর্য হইতেছে, যুদ্ধ পরবর্তীকালে এ দেশের আকাশ-বাতাসে স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী উঠিয়াছে, তাহার জবাব দেওয়া। তিনি শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবীর জবাবেই তাঁহার বক্তৃতায় এই শক্তিশালী কেন্দ্রের যুক্তি অবতারণা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলিতে চাহিয়াছেন যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে "শক্তিশালী কেন্দ্র" দেশকে রক্ষা করিয়াছে। আমরা তাঁহার এই বক্তব্যের সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারি না। কারণ যুদ্ধের সময় বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের জন্য তাঁহার "শক্তিশালী" কেন্দ্রীয় সরকার কোন আবশ্যকেই আসে নাই– এমন কি,

> কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে তিনি আমাদের জন্য একখানা পোস্টকার্ড দ্বারাও সাহায্য করিতে পারেন নাই। আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও অদম্য মনোবলের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দফতর হইতেই যে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম তাহাই নয়, সমগ্র বিশ্বের সহিতও আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসী ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানীদের সাহায্য করিবার জন্য সেদিন আর কেউ আমাদের পাশে ছিল না। ফলে তাঁহার শক্তিশালী কেন্দ্র কেবলমাত্র যে আমাদের নিকট অকেজো বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে তাহাই, নয়, আমরা উহাকে মূল্যহীন বলিয়া মনে করিয়াছি। ইহা কেবলমাত্র কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা শেখ মুজিবের অভিমত নয়, সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই শক্তিশালী কেন্দ্রের ধুয়া তুলিয়া ক্ষমতাসীনরা আর পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন না। তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে বানচাল করা সম্ভব হইবে না। দেশবাসী জনসাধারণ এবার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য জানমাল কোরবান করিতে প্রস্তুত। কারণ, শক্তিশালী পাকিস্তানের জন্য ইহার প্রয়োজন।

এরপরের চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ২৭ মার্চ। চিঠির শিরোনাম ছিল: '৬-দফা বনাম কায়েমী স্বার্থ'। চিঠিটি লেখেন ৯২, আরামবাগ ঢাকা থেকে শেখ ফজলুল হক এবং এ, এম, এ, খান।
চিঠিটিতে বলা হয়:

> জনাব ভুট্টো সাহেব আবার উত্তেজিত। U.N.O. হইতে বাহির হইয়া আসিবার হুমকি প্রদর্শনের সময় তিনি যেভাবে উত্তেজিত ছিলেন, এবারে তিনি আবার সেইভাবেই উত্তেজিত হইয়াছেন। এই উত্তেজনার কারণ শেখ মুজিবের ৬-দফা।
>
> কেবলমাত্র ভুট্টো সাহেব নন, ভুট্টো সাহেবদের সেই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সকলেই ৬-দফার দাবী তোলার সাথে সাথে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের রাত্রের ঘুম বিনষ্ট হইয়াছে, দিনের আহার তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা অনেকেই এবার আশঙ্কিত, খুবই চিন্তিত– "যাহারে পেয়েছি, তারে আবার হারাই।" সুমার সাহেব বলিয়াই দিয়াছেন, বিরোধীদলের উদ্দেশ্য হইতেছে, যাহারা পয়সা করিয়াছে তাহাদের জন্য বিবাদ ডাকিয়া আনা। আসলে ভুট্টো সাহেবদের ভয় ওখানেই। কারণ ৬-দফা কার্যকরী হইলে দশ কোটি মানুষকে –বিশেষ করিয়া সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে শোষণ করিয়া ভুট্টো-সুমার গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা রাতারাতি সম্পদশালী বনিয়াছেন এবং এখনও বনিতেছেন, তাঁহাদের সেই সুযোগ আর থাকিবে না। তাই তাঁহাদের মুখপাত্ররা আজ এত উত্তেজিত। উত্তেজনার ফলে তাঁহাদের

মুখের লাগাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা গালিগালাজ শুরু করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বৃহত্তর বাংলার প্রবক্তা বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়াছেন। সর্বশেষে শেখ মুজিবকে এক চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সহিত পূর্ব পাকিস্তানের যে-কোন স্থানে মঞ্চে সম্মুখ-বিতর্কে অবতরণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার এই দম্ভ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ হাজার বছর যুদ্ধ চালাইবার ওয়াদা বিশারদ জনাব ভুট্টো সাহেব যে বড়বড় লাফ দিতে অভ্যস্ত, তাহা আমরা জানি। আমাদের কথা হইল, মঞ্চে সম্মুখ-বিতর্কে যদি জনাব ভুট্টো সাহেব পরাজিত হন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা ৬-দফা মানিয়া লইবেন কি? যদি তাঁহারা উহা মানিয়া নিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের যে-কোন স্থান নয়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকেই তর্ক-মঞ্চের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি। ভুট্টো সাহেবরাও আসরে নামুন, আমরাও নামি। তারপর গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হউক, ৬-দফা দাবী পূর্ব পাকিস্তানীবাসীরা সমর্থন করে কি না।

১৯৬৬ সালের ২৭ মার্চ ছয়দফা দাবিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: '৬-দফা প্রসঙ্গে'। বগুড়ার কালীতলা থেকে সুলতানুল ইসলাম এ চিঠিটি লিখেন। এতে লেখা হয়:

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি শক্তিপ্রিয় ও দেশদরদী জনসাধারণ জনাব শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা প্রস্তাবকে তাঁহাদের অন্তরের দাবী বলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছেন এবং যাঁহারা ইহার বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহাদের নিন্দা করিতেছেন।

পাকিস্তান হাসিলে এবং বিশেষ করিয়া সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীরা সুস্পষ্টরূপে তাঁহাদের প্রগাঢ় দেশপ্রেমের কথা বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা সমগ্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া জনসাধারণে স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছেন এবং যে সব, জমিদারসুলভ তথাকথিত নেতা অনুকম্পা দেখাইয়া কাজ হাসিল করিতে চাহেন, শুধু তাঁহাদেরই কাছে এই ৬-দফা প্রস্তাব বিস্বাদ ঠেকিতেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্প্রতি শেখ সাহেবের ৬-দফা প্রস্তাব সম্পর্কে যে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, তাহা একশ্রেণীর মানুষের অসংলগ্ন উক্তির মতই হাস্যকর। যদিও-বা তিনি উহা করিয়াছেন ব্যক্তি বিশেষের শ্রদ্ধার আতিশয্যে কিংবা মনোরঞ্জনের জন্য, তিনি যেন স্মরণ রাখেন যে, যাঁহারা রক্ত দিয়া পাকিস্তান হাসিল করিয়াছেন ও রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা একে মজবুত রাখার ব্যাপারেও সেরূপ শক্তিশালী। ন্যায়ের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন যেরূপ অকুণ্ঠ, অন্যায়ের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণাও সেরূপ তীব্র।

পূর্ব পাকিস্তানবাসী মনেপ্রাণে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের উন্নতি কামনা করেন। সেই জন্যই তাঁহারা শান্তিপূর্ণভাবে চালাইয়া যাইবেন তাঁহাদের সংগ্রাম দেশের অখণ্ডতা বজার রাখার জন্য এবং সামগ্রিক উন্নতির জন্য।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে এবং বিগত যুদ্ধে শত্রুকে শায়েস্তা করিতে পাকিস্তানের বীরসন্তানেরা যেরূপ শান্তিপূর্ণ ও কঠোর পদক্ষেপে আগাইয়া গিয়াছিল, আমি আশা করি, ৬-দফা প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করিয়া সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের উন্নতি সাধনকল্পে তাঁহারা সেই মনোভাব লইয়াই আগাইয়া আসিবেন।

ছয়দফার ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে ১৯৬৬ সালের ১০ এপ্রিল আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'বুঝিতে পারি না?'। আজিমপুর, ঢাকা থেকে মোহাম্মদ হাশেম খান চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে বলা হয়:

মওলানা ভাসানী ৬-দফার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, মুজিবের ৬-দফা আন্তরিক হইলে আমার সহিত তিনি পরামর্শ না করিয়া পারিতেন না। ইহা যদি শেখ মুজিবরের সম্পর্কে তাঁর অভিমান হয়, তাহা হইলে তা' ভিন্ন কথা। কিন্তু মওলানা সাহেবকে পাওয়া যাবে কোথায়! তিনি ত নিজের খুশী-খেয়াল মত যখন যা খুশী করিয়া ও বলিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি একবার বলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়ন করিতে না পারিলে অন্য কিছু করার উপায় নাই; আবার বলেন, আইয়ুব-সরকারের পররাষ্ট্র নীতি আমি সমর্থন করি। অথচ, এদিকে দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগের প্রতি তাঁর কার্যতঃ কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। এশিয়া-আফ্রিকা হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নই তাঁর প্রধান ব্রত এবং এর জন্য তিনি যার-তার সহিত হাত মিলাইতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। কিন্তু আমরা যারা এ দেশে বাস করি, তাদের পক্ষে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকা সম্ভব নয় । কেননা, ইহাই আমাদের দৈননন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'সাম্রাজ্যবাদীদের' বিতাড়নে সাহায্য করিতে হইবে ঠিকই, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় ও অন্যান্য দেশের মত 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' প্রচলন কিংবা দেশের সমস্যা ও অর্থনীতির প্রতি উদাসীন থাকিয়া নয়। তজ্জন্য দেশের সমস্যাকে এবং জনগণের অধিকারকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের গুরুত্ব দেওয়া চলে না। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে, এমনকি কমিউনিষ্ট দুনিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাতে আমাদের মত ক্ষুদ্র দেশের বিশেষ ভূমিকা নাই তবে বৃহত্তর শক্তিবর্গের এই দ্বন্দ্বে কোন এক পক্ষে

জড়িত হইয়া পড়া পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল নয়, বরং বিপদজনক বলিয়াই আমরা মনে করি। এশিয়া-আফ্রিকার কতিপয় দেশ সাম্প্রতিককালে বৃহত্তর শক্তিবর্গের এক পক্ষের কূটনৈতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হওয়ার আজ সেই সকল দেশ আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও হানাহানির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। মওলানা সাহেব ৬-দফায় সহিত সোশ্যালিজম-এর প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত না করায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সোশ্যালিজমের প্রশ্নটি ৬-দফায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপার নয়, উহা পার্টি প্রোগ্রামের ব্যাপার। মওলানা ভাসানীর অনুসৃত নীতি দৃষ্টে মনে হয়, তিনি পুঁজিবাদীদের কোলে বসিয়া এবং সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় বলিয়া মনে করেন। নিজের এই স্ববিরোধিতার জন্য তিনি ৬-দফার পাশ কাটাইয়া যাইতে পারেন কিংবা জোর গলায় 'সাম্রাজ্যবাদী' 'সাম্রাজ্যবাদী' বলিয়া আওয়াজ তুলিতে পারেন; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সচেতন দেশবাসীর চক্ষু এড়াইতে পারিবেন না।

জনাব, আমি আর একটি ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম না। প্রতিবেশী মহাচীনের রাষ্ট্রপ্রধান লিউ শাও চী আগামী ১৫ই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসিতেছেন। কম্যুনিষ্ট চীনের মত ও পথ কিংবা সবকিছুর সহিত আমাদের মত ও পথের মিল আছে কি-না, লিউ-শাও-চীর'র আগমন উপলক্ষে সে প্রশ্ন অবান্তর। বিশাল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মহান অতিথি তিনি। সরকারী পর্যায়েই তিনি সফরে আসিতেছেন এবং সরকারী উদ্যোগেই তাকে আদর-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নাগরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কূটনৈতিক রীতি নীতি অনুসারে শহরের মেয়র বা মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ইহাই সকল দেশের নিয়ম। মওলানা ভাসানী একটি রাজনৈতিক দলের নেতা (বিরোধীদলীয়ও বটে)। তাঁর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে কি করিয়া একজন বিদেশী অতিথির সম্মানার্থ নাগরিক কমিটি গঠিত হইল? প্রসঙ্গতঃ, এই কমিটিতে ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগ দলের কোন প্রতিনিধি নাই। একজন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক কোন দেশে সফরে আসিলে সরকারকে ডিঙ্গাইয়া এই ধরনের বে-সরকারী নাগরিক অভ্যর্থনা কমিটির দৃষ্টান্ত আমার অন্ততঃ জানা নাই। এই প্রসঙ্গে সরকারকে জিজ্ঞাসা করা চলে, অন্যকোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারী মেহমান এদেশে সফরে আসিলে কোন রাজনৈতিক দল পৃথকভাবে তাঁদের সম্মানার্থ' নাগরিক অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করি তে পারিবে কি? না, গঠন করিতে গেলে উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্ট দেশের চর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া মুণ্ড দাবী করা

হইবে? এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্ষমতাসীন কনভেনশন লীগকে বাদ দিয়া এই ধরনের একটি বেসরকারী সম্বর্ধনা কমিটি গঠন করিতে দিয়া প্রকারান্তরে সরকার এই কথাই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, ক্ষমতাসীন দলের অন্ততঃ এই প্রসঙ্গে কোন জনপ্রিয়তা নাই।

১৯৬৬ সালের ১ মে ছয়দফা দাবির জনপ্রিয়তা নিয়ে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'অপপ্রচারের নমুনা'। নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে আবদুর রশীদ চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে বলা হয়:

> ৬-দফা প্রোগ্রাম যতই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে, সুবিধাভোগীরা ততই বেসামাল হইয়া পড়িতেছেন। তাদের সাধ্য নাই যে, তারা প্রকাশ্যে ৬-দফার বিরোধিতা করে। কেননা, ৬-দফা প্রোগ্রামের মধ্যে আপত্তিকর কোন কিছুতো নাই-ই, বরং ইহাতে এই প্রদেশবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাই সুবিধাভোগীরা এই ৬-দফার কোন্ কোন্ দফা আপত্তিকর কিংবা জাতীয় সংহতি বিরোধী, তা বাৎলাইতে পারিতেছে না। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠিলে সুযোগসন্ধানী, জনস্বার্থ-বিরোধীরা উহাকে ব্যর্থ করিবার জন্য যেমনি কম্যুনিষ্ট ও বৈদেশিক শত্রুর হস্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি এবারেও ৬-দফার ব্যাপারে একই ধুয়া তোলা হইতেছে। এবার সুবিধাভোগীরা ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্ত আবিষ্কার করিয়াছে। গতকল্য স্থানীয় একটি পত্রিকায় এই অভিযোগ করিতে গিয়া সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইম'-এ প্রকাশিত ৬-দফা সম্পর্কিত একটি সংবাদ নিয়া বিশেষ হৈ-চৈ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য সংবাদে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত এবং সরকারী তরফের বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তথা ৬-দফা সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হওয়াই নাকি একটি মস্তবড় ষড়যন্ত্র। 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটি পাঠ করিলে যে- কোন লোক ইহাকে একটি নিছক খবর বলিয়াই মনে করিবেন। দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেশন করা সংবাদপত্রের দায়িত্ব। কিন্তু এই সংবাদ প্রকাশের জন্যই যদি ৬-দফার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্ত আবিষ্কার করা যায়, কিংবা উহার দ্বারা যদি ৬-দফার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির যোগসাজশের সূত্র আবিষ্কার করা হয়, তাহা হইলে ইতিপূর্বে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের প্রশংসা করিয়া এবং তাঁকে ষ্ট্রংম্যান' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাকে কি বলা যায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রচ্ছদপটে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের ছবি

স্থানলাভ করিয়াছিল এবং তাঁকে এশিয়ার দ্য' গলে বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে একটি মার্কিন পত্রিকায় শুধুমাত্র খবর প্রকাশিত হইলে যদি তাতেই বৈদেশিক হস্ত আবিষ্কার করা যায় তা হইলে এই সুবিধাভোগীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ফিল্ড-মার্শাল আইয়ুব সম্পর্কে সে দেশে যে-সকল প্রশংসামূলক খবররাখবর প্রকাশিত হইয়াছে তার নতিজা কি দাঁড়াইবে?

৬-দফার প্রতি দেশবাসীর যে অকুণ্ঠ সমর্থন মিলিতেছে উহা প্রতিরোধের উপায় নাই দেখিয়া সুবিধাভোগী মহলের বেসামাল হইয়া পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা যে অপ্রচার শুরু করিয়াছেন তাতে তাঁদের দুর্বলতা এবং আসল স্বরূপ উৎঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। তাঁরা জানেন যে, গণঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সুবিধাভোগীদের স্থান কোথাও থাকিবে না। তাই তাদের বেসামাল প্রচারণা বোধগম্য। কিন্তু যেসব ছুতা-নাতা সম্বল করিয়া তারা ৬-দফার বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাতে তাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়।

■■■

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা প্রশ্ন যাচাই

গবেষণা প্রশ্ন : এক

সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে কি?

বিশ্লেষণ

এই গবেষণাকর্মের সময়সীমা ছিল : ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত। এই সময়সীমায় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ছয়দফাসংশ্লিষ্ট ঘটনাকে বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ছয়দফা আন্দোলনকে সমর্থন যোগানোর কারণে আইয়ুব সরকারের রোষানলে পড়ে ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন থেকে দৈনিক ইত্তফাকের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৬ সালের ১২ জুলাই পুনরায় প্রকাশিত হলেও ২৭ জুলাই থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং তা অব্যাহত থাকে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় এবং ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে। যেহেতু ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক ঘটনা প্রবাহ শুরু হয় এবং ১৭ জুন থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, সেই কারণে এই গবেষণাকর্মের সময় ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

উপরোক্ত সময়সীমায় ছয়দফা বিষয়ক ঘটনা প্রতিদিন একটানা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিফলিত হয়নি। কখনও কয়েকদিন ধরে একটানা, কখনও কয়েকদিন বিরতি দিয়ে একদিন কিংবা কয়েকদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে। আবার একইদিনে একাধিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। একদিনে সর্বোচ্চ ৪টি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার নজিরও রয়েছে। নিচের টেবিলে ছয়দফা বিষয়ক ঘটনার তথ্য প্রকাশের হার তুলে ধরা হয়েছে:

টেবিল-১ : বিশ্লেষণের আওতাধীন সময়ে ছয়দফা বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

তথ্য প্রকাশের হার ⇨ ঘটনা ⇩	বিশ্লেষণের আওতাধীন সময়	রিপোর্টসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশকাল	৬-দফাসংশ্লিষ্ট রিপোর্টসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশের হার
ছয়দফা	১৬৭ দিন	১০১ দিন	৬০%

উপরের টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই গবেষণাকর্মের বিশ্লেষণের আওতাধীন সময় ছিল ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত মোট ১৬৭ দিন। এর মধ্যে ছয়দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটসংশ্লিষ্ট প্রথম তথ্য প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ৩১ জানুয়ারি এবং শেষ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন। সেই অনুযায়ী উপরোক্ত মোট ১৬৭ দিন সময়সীমার মধ্যে ছয়দফা আন্দোলনের তথ্য দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিফলিত হয়েছে ১০১ দিন। অর্থাৎ ছয়দফা বিষয়ক ঘটনা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল ১০১ দিন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে রিপোর্টসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য পত্রিকাটির মোট প্রকাশ দিনসমূহের ৬০% দিন প্রকাশিত হয়েছিল।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রাজনৈতিক খবর বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার কারণে তা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে ঘটনা বা তার ফলো-আপ প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন : দুই

রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয় কি?

বিশ্লেষণ:

এই গবেষণার আওতাধীন সময়ে ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে ছিল রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলাম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্লেষণের আওতাধীন মোট ১৬৭ দিন সময়সীমায় ছয়দফা বিষয়ক রিপোর্টসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ১০১দিন। উক্ত ১০১ দিনে শুধু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৬৯টি। রিপোর্টগুলো কতটা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর ট্রিটমেন্ট যাচাই করা হয়েছে ২ ও ৩ নম্বর টেবিলে।

কোনো ঘটনা জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সংবাদপত্রেও তা গুরুত্ব পেতে পারে। সংবাদপত্রে কোনো রিপোর্ট গুরুত্ব পাওয়ার মাত্রা বা ট্রিটমেন্ট নির্ধারিত হয় প্রচলিত কিছু নিয়ম অনুযায়ী। আর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পৃষ্ঠায়, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং আরও কম গুরুত্বপূর্ণ খবর ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। ছয়দফা আন্দোলনের ঘটনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। টেবিল-২ এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-২ : ঘটনা বনাম খবরের ট্রিটমেন্ট : যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে

পৃষ্ঠা⇨ / ঘটনা⇩	প্রথম পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	ভেতরের পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
ছয়দফা	১০৮ ৬৪%	৩ ২%	৫৮ ৩৪%	১৬৯ ১০০%

উপরের টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট ১৬৯টি রিপোর্টের মধ্যে বেশির ভাগই অর্থাৎ ১০৮টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় রিপোর্ট প্রকাশের হার ৬৪ শতাংশ। ভেতরের পৃষ্ঠায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৫৮টি- অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ। শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে ৩টি রিপোর্ট অর্থাৎ ২ শতাংশ।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, গবেষণার আওতাধীন সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকে ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক ঘটনার রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি।

ট্রিটমেন্ট নির্ধারণের আরেকটি মাপকাঠি হচ্ছে: শিরোনামের কলাম সংখ্যা। গবেষণাধীন সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতি পৃষ্ঠার কলাম সংখ্যা ছিল আটটি। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনাম হচ্ছে রিপোর্টের সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্ট। আর সর্বনিম্ন মাত্রার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে : সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম। নিচের টেবিলে প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর পৃষ্ঠা ও কলাম সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল- ৩ : ঘটনা বনাম ট্রিটমেন্ট:
কোন পৃষ্ঠায় কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে

কলাম সংখ্যা⇨ / পৃষ্ঠা⇩	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	তিন কলামের বেশি (সংখ্যা) (%)	আট কলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
প্রথম পৃষ্ঠা	২৯ ২৭% (প্রায়)	৪৪ ৪১% (প্রায়)	২৪ ২২%	৭ ৬%	৪ ৪% (প্রায়)	১০৮ ১০০%
ভেতরের পৃষ্ঠা	২৫ ৪৩%	২০ ৩৪%	৯ ১৬% (প্রায়)	৪ ৭% (প্রায়)	-	৫৮ ১০০%
শেষ পৃষ্ঠা	২ ৬৭% (প্রায়)	-	১ ৩৩% (প্রায়)	-	-	৩ ১০০%
মোট	**৫৬** **৩৩%**	**৬৪** **৩৮% (প্রায়)**	**৩৪** **২০%**	**১১** **৭% (প্রায়)**	**৪** **২%**	**১৬৯** **১০০%**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৬৯টি রিপোর্টের মধ্যে প্রথম, শেষ ও ভেতরের পৃষ্ঠায় সর্বমোট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৫৬টি (প্রায় ৩৩%), ডাবল কলাম শিরোনামের রিপোর্ট ৬৪টি (প্রায় ৩৮%), তিন কলাম শিরোনামের রিপোর্ট ৩৪টি (প্রায় ২০%), তিন কলামের বেশি শিরোনামের রিপোর্ট ১১টি (প্রায় ৭%) এবং আট কলাম ব্যানার শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৪টি (প্রায় ৪%)।

পৃষ্ঠাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ১০৮টি রিপোর্টের মধ্যে ৪টি (প্রায় ৪%) রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ২৪টি (প্রায় ২১%) রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়েছে তিন কলাম শিরোনামে। তিন কলামের চেয়ে বেশি শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে ৭টি (প্রায় ৬%) রিপোর্ট। ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ৪৪টি রিপোর্ট (প্রায় ৪১%)। আর ২৯টি (প্রায় ২৭%) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে।

ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ৫৮টি রিপোর্টের মধ্যে ৯টি (প্রায় ১৬%) রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়েছে তিন কলাম শিরোনামে। তিন কলামের চেয়ে বেশি শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে ৪টি (প্রায় ৭%) রিপোর্ট। ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ২০টি রিপোর্ট (প্রায় ৩৪%)। আর ২৫টি (প্রায় ৪৩%) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে।

সবচেয়ে কমসংখ্যক (৩টি) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে শেষ পৃষ্ঠায়। এর মধ্যে তিন কলাম শিরোনামে ১টি এবং সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে ২টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর কলামভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণার আওতাধীন সময়ে ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক ঘটনার রিপোর্টগুলোর মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ রিপোর্ট তিন কলাম বা তার চেয়ে বেশি শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক রিপোর্টই লিড আইটেম হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ৪টি রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই চারটি রিপোর্টের মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ২১ মার্চ। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'অতৃপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ-সিক্ত পরিবেশে ৬-দফার প্রবক্তাদের যাত্রা শুরু'। এটি ছিল ছয়দফার দাবিতে অনুষ্ঠিত হওয়া ইত্তেফাকে প্রকাশিত জনসভার প্রথম ব্যানার রিপোর্ট। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে তিনদিনের কাউন্সিল অধিবেশন শেষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দীন এই সভায় বক্তৃতা করেন। প্রচণ্ড ধূলিঝড় ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে এই জনসভায়। বৈরী আবহাওয়ার কারণে দ্রুত সভা শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে গেলে জনগণের অনুরোধে পুনরায় সভা আরম্ভ করতে হয়। এই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও পুনরায় সভা শুরু করতে গিয়ে ছয়দফার সমর্থনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অতৃপ্ত আগ্রহের জন্য সভাপতি তাদের ধন্যবাদ জানান।

দ্বিতীয় ব্যানার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ১০ মে। প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'অসঙ্গত ও নীতি বিগর্হিত-অযাচিত ও জবরদস্তিমূলক-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : নেতৃবৃন্দের আটকের প্রতিবাদে তুমুল ক্ষোভ : চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার উপর নয়া হামলার তীব্র নিন্দা : অবিলম্বে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী'। দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ১০ মে প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটিতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিন্দা জানানো হয়। ১৯৬৬ সালের ৯ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পরের দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানো হয়। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের গ্রেফতার করাকে চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার ওপর নয়া হামলা অভিহিত করে বলেন, যুদ্ধোত্তরকালেও দেশরক্ষা আইনবলে বিনাবিচারে নেতৃবৃন্দের এই আটক কেবল অসঙ্গতই নয়–নীতি বিগর্হিতও। নেজামে ইসলাম নেতা ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে সরকারের উদ্দেশে বলেন, নেতাদের জেলে পুরে আন্দোলন দমানো যায় না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের আটক করে রাখা শুধু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণই নয়, স্বাধীনতার ওপরও প্রত্যক্ষ হামলা। ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বলেন, কেউ জনগণের অধিকার ও স্বার্থের কথা বললেই তার বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। 'ন্যাপ' নেতা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগ সংবলিত ছয়দফা দাবি উত্থাপন করায় সরকারের রোষানলে পড়েছেন। তিনি দেশের গণতন্ত্রমনা প্রত্যেক নাগরিককে এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তৃতীয় ব্যানার রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৪ মে। এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাও : প্রতিবাদ দিবসে প্রদেশের দিকে

দিকে বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জন : অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিয়া রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যত্নবান হওয়ার আহ্বান'। দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্ট ১৯৬৬ সালের ১৪ মে প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটিতে বলা হয়, ১৯৬৬ সালের ১৩ মে সামরিক সরকারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আহ্বানে সমগ্র প্রদেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুসহ কারাগারে বন্দি নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান। বক্তাগণ দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টা হতে বিরত থাকতে বলেন তা না হলে অচিরেই প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

চতুর্থ ব্যানার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৯ জুন। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে পুলিসের গুলীতে ১০ জন নিহত'। রিপোর্টটিতে বলা হয়, ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আহূত সাধারণ হরতাল পালিত হয়। হরতাল সফল করার জন্য আগের দিন অর্থাৎ ৬ জুন গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তৎপর থাকেন। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে মাইকিং এবং প্রচারপত্র বিলি করে হরতাল পালন না করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বন্দরে সশস্ত্র পুলিশ টহল দেয়। এ সময় হরতাল প্রচারকার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। পরদিন ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। এ সময় পুলিশ ও ইপিআর তেজগাঁও, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে ১০ জন নিহত হয়।

সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ছয়দফা আন্দোলন সম্পর্কিত রিপোর্টগুলো বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, দৈনিক ইত্তেফাক ছিল সে সময়ে আগাগোড়া আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা। পত্রিকাটির কর্ণধার মানিক মিয়া ছিলেন আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম পৃষ্ঠায় রিপোর্ট প্রকাশের হার ৬৪ শতাংশ এবং প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর কলামভিত্তিক উপরোক্ত বিশ্লেষণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়।

গবেষণা প্রশ্ন : তিন

কোনো রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সে বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রভৃতিও প্রকাশিত হয় কি?

বিশ্লেষণ

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে গবেষণার আওতাধীন সময়ে মোট ১৯টি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ক তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-৪ : ঘটনা বনাম সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি প্রকাশ

ঘটনা⇩ বিষয় ⇨	সম্পাদকীয়	উপসম্পাদকীয়	কলাম	চিঠি	মোট
ছয়দফা	২	২	১৭	৫	২৬টি

উপরের টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণাধীন সময়ে ছয়দফা বিষয়ক মোট ১৭টি কলাম, ২টি উপসম্পাদকীয়, ২টি সম্পাদকীয় ও ৫টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামগুলো ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন এবং দেশের মানুষকে ছয়দফা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে 'মোসাফির' ছদ্মনামে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার লেখা 'রাজনৈকিত মঞ্চ' কলামটি প্রণিধানযোগ্য। ছয়দফা বিষয়ক মোট ১৭টি কলামের মধ্যে সবক'টিই ছিল 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলো চিঠিতেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় ও দেশদরদি জনগণের ছয়দফা দাবির প্রতি সমর্থন এবং যারা এর বিরোধিতা করেছে তাদের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ছয়দফা আন্দোলন দৈনিক ইত্তেফাকে গুরুত্ব পেয়েছিল বলেই একাধিক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয়েছে। ৫টি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সে বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম এমন কি চিঠিও প্রকাশিত হয়।

■■■

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও উপসংহার

রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র বাঙালি জাতির বহু ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এবং ইতিহাসের আয়না। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে সংবাদপত্র অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। ছয়দফা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অবিচার ও পাকিস্তানের দুই অংশ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রতিবাদী হতে শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল না, বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও জনগণের সত্যিকারের মুখপত্র হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এক্ষেত্রে ওই সময়ের রাজনীতিতে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবময়। দৈনিক ইত্তেফাক শুধু এসব ঘটনার পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেনি, বরং দাবির পক্ষে অন্যতম প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছে। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশিত রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, ক্ষুরধার কলামসমূহ সমকালীন রাজনীতিতে দুর্বার শক্তি-সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বাহন হয়ে উঠেছিল দৈনিক ইত্তেফাক। একদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট পড়ে জনসাধারণ সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। ঘটনার ফলো-আপ জানতে পেরেছে। অন্যদিকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলাম পড়ে ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। এর ফলে রাজনৈতিক ঘটনা চূড়ান্ত রূপলাভ করেছে। দাবি আদায় সম্ভব হয়েছে। এমন কি গণঅভ্যুত্থানের মতো ঘটনা সত্তরের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জিত হয়েছে।

ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা থেকে শুরু করে ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দৈনিক ইত্তেফাক। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর সত্তরের নির্বাচনকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু যখন সারা বাংলায় উল্কার মতো ছুটে বেরিয়েছেন, জনসাধারণকে নিজেদের দাবি আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফার পক্ষে রায় দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, তখন দৈনিক ইত্তেফাক সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পত্রিকাটি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রতিবেদন, ফিচার,

কলাম প্রকাশসহ নানাভাবে সমর্থন দিয়ে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মোক্ষম ভূমিকা পালন করে।

গবেষণাকর্মে ছয়দফা আন্দোলনে ইত্তেফাকের সমর্থন ও প্রচার নির্ণয়ের জন্য প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিচে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। এই গবেষণাকর্মে একটিমাত্র রাজনৈতিক ইস্যু ছয়দফা আন্দোলনকে বিশ্লেষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তা দৈনিক ইত্তেফাকে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে। ছয়দফা বিষয়ক ঘটনা কখনও কয়েকদিন ধরে একটানা, কখনও কয়েকদিন বিরতি দিয়ে একদিন কিংবা কয়েকদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে।

ইত্তেফাকে রিপোর্ট প্রকাশের দিনগুলো হিসাব করে দেখা গেছে যে, মোট ১৬৭ দিন সময়সীমার মধ্যে ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে মোট ১০১ দিন ধরে। রিপোর্টগুলো একটানা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়নি আবার একই দিনে একাধিক রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। একদিনে সর্বোচ্চ ৪টি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার নজিরও রয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে মোট ১৬৯টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত আট ধরনের রিপোর্ট ছিল। রিপোর্টগুলোর মধ্যে ছিল : জনসভা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, সভা- সম্মেলন ও কাউন্সিলে ছয়দফা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, ছয়দফার পক্ষে বিবৃতি সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, বঙ্গবন্ধুকে হয়রানি, গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ছয়দফার বিরোধিতা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, ছয়দফার পক্ষে সমর্থন (আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য দলের সমর্থন), পথসভা, সংবাদ সম্মেলন ও সংবাদকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার।

রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হলো :

জনসভা	সভা, সম্মেলন ও কাউন্সিলে ছয়দফার সংশ্লিষ্টতা	ছয়দফার পক্ষে বিবৃতি সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট	বঙ্গবন্ধুকে হয়রানি, গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	ছয়দফার বিরোধিতা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট	ছয়দফার পক্ষে সমর্থন (আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলের সমর্থন)	পথসভা	সংবাদ সম্মেলন ও সংবাদকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার	মোট
৩৯টি (২৩%)	২৮টি (১৬%)	২৭টি (১৬%)	২৫টি (১৫%)	২৪টি (১৪%)	১৫টি (৯%)	৬টি (৪%)	৫টি (৩%)	১৬৯টি (১০০%)

উপরের টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণাধীন সময়ে ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক মোট ১৬৯টি রিপোর্টের মধ্যে জনসভা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ৩৯টি, সভা- সম্মেলন ও কাউন্সিলে ছয়দফা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ২৮টি, ছয়দফার পক্ষে বিবৃতি সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ২৭টি, বঙ্গবন্ধুকে হয়রানি, গ্রেফতারের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ২৫টি, ছয়দফার বিরোধিতাসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ২৪টি, ছয়দফার পক্ষে সমর্থন (আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্য দলের সমর্থন) সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ১৫টি, পথসভাসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ৬টি এবং সংবাদ সম্মেলন ও সংবাদকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ছিল ৫টি। বিশ্লেষণে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ক ঘটনায় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে জনসভাসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৩৯টি)। সবচেয়ে কম সংখ্যক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ সম্মেলন ও সংবাদকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৫টি)।

সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠিপত্র

ছয়দফা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ । এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল বলেই তা' দশ কোটি মানুষের মুক্তি সনদে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। সম্পাদকীয়তে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছয়দফা দাবিকে লাহোর প্রস্তাবেরই সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এতে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্তরিকভাবেই চায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই মুক্তি সনদের আলোকেই এবং এই প্রস্তাবের মধ্যেই বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয়দফা কর্মসূচির প্রত্যক্ষ রূপ দেখা যায়।

ছয়দফা প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ২৬ মার্চ। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয়দফা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে ছয়দফা প্রণয়ন করা হয়েছিল। ছয়দফা শুধু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তাই নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যেও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ববর্তী উনিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসনের নামে শোষণ প্রক্রিয়া পূর্ববাংলার জনসাধারণের চোখ খুলে দিয়েছে। বাঙালি অতীতেও পরাধীনতা মেনে নেয়নি, ভবিষ্যতেও নেবে না বলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়।

ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে দুটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এর একটি লিখেন ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। অপরটি লিখেন এ কে রফিকুল হোসেন। ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে ছয়দফা অন্দোলন নিয়ে উপসম্পাদকীয় লিখেন ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। এর শিরোনাম ছিল: 'বাস্তবতার আলোকে ৬-দফা কর্মসূচী'। এই উপসম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন এবং ছয়দফা বাস্তবায়নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এই উপসম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছয়দফা কর্মসূচি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোনটি সম্পর্কেই ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। কারণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলেই সমান অধিকার নিশ্চিত হবে। এ প্রশ্নে যাদের সন্দেহ আছে বা যারা অজ্ঞতায় ভুগছেন, তারা জনগণের কাছে গিয়ে মতামত যাচাই করতে পারেন।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপসম্পাদকীয়টি লিখেন এ কে রফিকুল হোসেন। এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল 'জনগণের এ সংগ্রাম চলিবেই'। তিনি উপসম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছয়দফা দাবি বাস্তবায়ন শুধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের পথই বন্ধ করবে না, বরং বিগত ১৮ বছরের বঞ্চনা ও শোষণেরও অবসান হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঞ্চিত ও শোষিত জনগণের ছয়দফা দাবি মানার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ছয়দফা আন্দোলনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ইত্তেফাকের জনপ্রিয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ' এর। 'মোসাফির' ছদ্মনামে কলামটি লিখতেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। ছয়দফা কর্মসূচির সপক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়ার কারণে স্বৈরাচার আইয়ুব সরকারের রোষানলে পড়তে হয় দৈনিক ইত্তেফাককে। ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয় আইয়ুব সরকার। শুধু তাই নয়, মানিক মিয়াকেও কারাবন্দি হতে হয়। দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে রাখে আইয়ুব সরকার। ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক। পুনরায় প্রকাশনা শুরু করেই দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে সমর্থন যোগাতে থাকে। এক্ষেত্রেও জোরালো ভূমিকা রাখে দৈনিক ইত্তেফাকের জনপ্রিয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'।

দৈনিক ইত্তেফাকে ছয়দফা আন্দোলন বিষয়ে মোট ১৯টি কলাম প্রকাশিত হয়। আর সবগুলো কলামই ছিল 'মোসাফির' ছদ্মনামে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার লেখা কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। কলামগুলো ১৯৬৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ জুনের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

কলামগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার কলামে উল্লেখ করেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বহাল রাখার জন্যই ছয়দফা। ছয়দফার সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আইয়ুব খানের ছয়দফা বিরোধী অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোরও সমালোচনা করেন তিনি। ভুট্টো যখন ছয়দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেন তখন মানিক মিয়া তার কলামে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিগত দিনগুলোতে বিভিন্ন দাবি দাওয়া প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যেও যেভাবে সমাধান হয়েছে, ছয়দফার বিরোধিতাও ঠিক একইভাবে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে এবং সন্তোষজনকভাবে সমাধান হবে।

অন্যদিকে ছয়দফা দাবির বিরোধিতাকারীদেরও সমালোচনার জবাব দেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি তার কলামে মর্নিং নিউজের সম্পাদক মি. সুলেরীর লেখায় ছয়দফা সম্পর্কিত বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ৬-দফার প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে মি. সুলেরী নিশ্চিত, তবে স্বীকার করতে নারাজ। ৬-দফার সঙ্গে যদি জনগণের সম্পর্ক না থাকে, এটা যদি কতিপয় জনসমর্থনহীন পেশাদার রাজনীতিকের ব্যাপার হয়, তাহলে তিনিইবা কেন ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পরেই বিরামহীনগতিতে কলম চালাচ্ছেন? কেনই বা দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে? কথার মারপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে ছয়দফা প্রস্তাবকে রাজনৈতিক পর্যায়ে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে ফয়সালা করার জন্য মি.সুলেরী এবং ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানান তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি মি. সুলেরীকে যে কোন ধরনের ছেলেমানুষী যুক্তি, অসার এবং উদ্ভট কথা বার্তা থেকে বিরত থাকার জন্যও আহ্বান জানান। আবার জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও ছয়দফা দাবির সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন তিনি। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার কলামে জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বরূপ তুলে ধরেন। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া উল্লেখ করেন, জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ছয়দফা প্রশ্নে ঢাকায় এক

মোকাবেলা সভার আয়োজন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকেন।

ছয়দফা দাবির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে হয়রানি করার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া । তিনি তার কলামে মন্তব্য করেন যে, ছয়দফা কর্মসূচি নিছক রাজনৈতিক প্রশ্ন তাই নির্যাতন বা হয়রানির পথে নয়, গণতান্ত্রিক পথেই এর সমাধান করতে হবে। ছয়দফা কর্মসূচি কোন ব্যক্তি বিশেষের দাবি নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় থাকুন বা জেলের বাইরে থাকুন জনসাধারণের জীবন মরণের দাবি এই ছয়দফা আদায়ের সংগ্রাম চলবেই। তিনি শাসন কর্তৃপক্ষকে ছয়দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানান। ছয়দফা দাবির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে আলোচনা, সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।

সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিলের খবরে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ক্ষমতাসীন দলের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি তার কলামে মন্তব্য করেন যে, ছয়দফা দাবিকে স্তিমিত করার লক্ষ্যেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা যায় না। জনসাধারণের মত প্রকাশের অধিকার ও গণদাবি প্রতিহত করার পরিণতি মঙ্গলজনক হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। দেশের আইন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছয়দফা কর্মসূচি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের নানা ধরনের অসহযোগিতার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ছয়দফা দাবি আদায়ের পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে পাকিস্তানকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করতে এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ছয়দফা দাবি উত্থাপনের বিষয়টিকে যারা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করতে চায়, তাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি তার কলামে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোন দলীয় বিষয় নয়। এই আন্দোলন কোন দলের ক্ষমতা দখলের আন্দোলন নয়, এটা পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত শোষিত সাড়ে ৫ কোটি মানুষের মুক্তির সনদ। তাই তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাসীন দলকে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

মানিক মিয়া তার কলামে ছয়দফা কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন করার ফলে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ধর-পাকড় এবং কলম আন্দোলন তথা লেখালেখি ও সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ইত্তেফাকের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি তার কলামে ছয়দফার প্রবক্তাদের জেল-জুলুম, হয়রানি ও নির্যাতনের পথ পরিহার করে ক্ষমতার অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে মনোজ্ঞ আলোকপাত করেন। তিনি ৭ জুন হরতাল দমনে সরকারের কঠোর অবস্থান উপেক্ষা করে প্রদেশজুড়ে হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ছয়দফা আন্দোলনের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মুখোশধারী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, নিহত শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন আরও প্রেরণামূলক এবং আরও জোরদার হয়ে ওঠেছে। ক্ষমতাসীনদের শত নির্মম নির্যাতনের মুখেও এ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায়নি। তাই শত অত্যাচার ও প্ররোচনার মুখেও নিয়মতান্ত্রিক পথে এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে দুর্বার গণ ঐক্য গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ব পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যা, এটা তাদের বাঁচার দাবি। তাই ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাব পরিত্যাগ করে উভয় অঞ্চলের সকল দাবি দাওয়ার ন্যায়সঙ্গত সমাধানে মি. সুলেরী সাহেবদের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে মি. সুলেরীকে অহেতুক বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, মি. সুলেরী তার লেখনীতে ছয়দফা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে 'ভূত' আবিষ্কার করলেও জনগণ তা বিশ্বাস করবে না।

১৯৬৯ সালের ১ জুন চির বিদায় নেন 'মোসাফির' ছদ্মনাম খ্যাত সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। থেমে যায় তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের প্রকাশনা। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পথে অনেকটা সারথির ভূমিকা নিয়ে ছিল দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার প্রতিফলন রয়েছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরও ইত্তেফাক প্রকাশনা অব্যাহত থাকে এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সরাসরি সমর্থন দেয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকে ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে চিঠিপত্র বিভাগে বেশ কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত চিঠিগুলোর

মধ্যে প্রায় চিঠিতেই পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় ও দেশদরদি জনগণের ছয়দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে এবং যারা এর বিরোধিতা করেছে তাদের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে।

শক্তিশালী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের দুঃসময়ে কোন কাজে আসেনি। তাই শক্তিশালী কেন্দ্রের ধুয়া তুলে ক্ষমতাসীনরা পূর্ব পাকিস্তানবাসিকে আর বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। কেবল পূর্ব পাকিস্তানবাসি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানিদের সাহায্য করার জন্য কেউ পাশে ছিল না। কেবল ছয়দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে ওঠতে পারে। শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তাদের সমালোচনা করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'ক্ষমতাসীনদের ঘোষণা বনাম ৬-দফা'। চারজনের যুক্ত চিঠি ছিল এটি। চিঠিটি লিখেন আরামবাগ ঢাকা থেকে শেখ ফজলুল হক, মৌলবী বাজার ঢাকা থেকে মোঃ নিজামুদ্দিন, নওয়াবপুর হকার্স মার্কেট থেকে সিরাজউদ্দিন আহমদ, এবং নাজিরাবাজার, ঢাকা থেকে মোঃ সুলতান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টোর দেয়া চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধু সানন্দে গ্রহণ করেন এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় ছয়দফার প্রশ্নে বৈঠকে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দাবি করেন যে, জনসভায় প্রকাশ্যে বিতর্কে যদি ভুট্টো পরাজিত হন তাহলে তিনি বা তারা কি ছয়দফা মেনে নেবেন? যদি ভুট্টো তা মেনে নিতে রাজি থাকেন তাহলে পূর্ব পাকিস্তানবাসি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন জায়গায় নয়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকেই তর্ক মঞ্চের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিতর্কে যাওয়ার সাহস দেখে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিস্মিত হন এবং দৈনিক ইত্তেফাকে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: '৬-দফা বনাম কায়েমী স্বার্থ'। চিঠিটি লিখেছিলেন ৯২, আরামবাগ ঢাকা থেকে শেখ ফজলুল হক এবং এ এম এ খান।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয়দফা প্রস্তাবকে তাদের অন্তরের দাবি বলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং ছয়দফার বিরোধিতাকারীদের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা প্রস্তাব সম্পর্কে জুলফিকার আলী ভুট্টোর চ্যালেঞ্জকে অসংলগ্ন উক্তির মতোই হাস্যকর মন্তব্য করে ইত্তেফাকে চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: '৬-দফা প্রসঙ্গে'। বগুড়ার কালীতলা থেকে সুলতানুল ইসলাম এ চিঠিটি লিখেছিলেন।

ছয়দফার বিষয়ে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে ইত্তেফাকে চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'বুঝিতে পারি না?'। চিঠিটি লিখেছিলেন আজিমপুর, ঢাকা থেকে মোহাম্মদ হাশেম খান।

লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনঃ

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের খবর দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৬৬ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়।

লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। দৈনিক ইত্তেফাকে ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। লাহোর সম্মেলনে যোগদানের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ সময় তিনি ছয়দফা কর্মসূচির কথা সরাসরি উল্লেখ না করলেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশরক্ষামূলক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার দ্বারাই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব। ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এনডিএফ-এর চেয়ারম্যান নূরুল আমীনও এক সংবাদ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান এবং এ জন্য সংবিধান সংশোধনের কথা বলেন। এ বিষয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে সারাদেশের ৭৪০ জন রাজনৈতিক নেতা অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২১ জন নেতা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। পরের দিন ৬ ফেব্রুয়ারি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে লাহোরে বিরোধীদলের নেতাদের অধিবেশন শুরু হয়। এই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

এই ঘটনাপ্রবাহ দৈনিক ইত্তেফাকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়।

ছয়দফা প্রস্তাব পেশ ও সংবাদ সম্মেলনে ছয়দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যাঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির সভায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে 'ছয়দফা' প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে 'ছয়দফা' প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেন। কিন্তু সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি

জানায়। শুধু তাই নয়, তারা বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী অভিহিত করেন। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অনুসারীদের নিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারির সম্মেলন বর্জন করেন।

সম্মেলন বর্জন করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সাংবাদিকদের সামনে ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের কাছে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। লাহোর থেকে ফিরে ঢাকায় তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গবন্ধু অভিযোগ করেন যে, লাহোর সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের প্রভাবশালী একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, শুনতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁর প্রতিনিধি দলসহ সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে অটুট ঐক্য, সংহতি ও বৃহত্তর সমঝোতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছয়দফাকে সমর্থন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। পরের দিন ১৯৬৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এইসব তথ্য দৈনিক ইত্তেফাকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়।

ছয়দফার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনঃ

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় ছয়দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করা হয়। এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ছয়দফা দাবি উত্থাপিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গৃহীত হয়। সভায় ছয়দফার দলীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ পুস্তিকা প্রকাশ করে তা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুস্তিকা প্রকাশ এবং খসড়া তৈরির জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছয়দফা দাবির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকে জনগণের দাবি হিসেবে অভিহিত করেন। ছয়দফার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ছয়দফা দাবিতে শোষিত

বঞ্চিত মানুষের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং এই দাবি একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। এই কাউন্সিলেই বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সব ঘটনার প্রতিফলন ঘটে দৈনিক ইত্তেফাকে।

সারাদেশে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায় থেকে ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানানোর খবর ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক দল ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানায়। শুধু তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানায়। তবে ছয়দফা দাবির বিপক্ষে অবস্থান নেয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ছয়দফার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের নানা সমালোচনার প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি ছয়দফার সমালোচনা করতে থাকেন।

ছয়দফার সমালোচনাঃ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ছয়দফা দাবির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ পাকিস্তানের মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ছয়দফা সম্পর্কে বিতর্ক করতে চান। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ভুট্টোর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাঁর চ্যালেঞ্জের বিপরীতে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে কোন সাড়া দেননি ভুট্টো। প্রায় এক মাস পর ১৯৬৬ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভুট্টো পুনরায় চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন, তিনি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছয়দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালের ১৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে ২৪ এপ্রিল পল্টন ময়দানে জনসমাবেশে ছয়দফা নিয়ে সামনা-সামনি আলোচনা করার জন্য ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানান। এর বিপরীতে একই দিন ভুট্টো বলেন, ২৪ এপ্রিলের পরিবর্তে তিনি ১৭ এপ্রিল ছয়দফা নিয়ে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক করতে প্রস্তুত আছেন। ছয়দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর সম্ভাব্য মুখোমুখি বিতর্ক নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুট্টো পিছু হটেন। তাঁর পিছু হটাকে ছয়দফার বিষয়ে প্রথম পর্যায়ের বিজয় হিসেবে বর্ণনা করেন বঙ্গবন্ধু। দৈনিক ইত্তেফাকে ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

এছাড়া ছয়দফার সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি মওলানা আবুল আলা মওদুদী। তিনি বেশ

কয়েকবার ছয়দফার কঠোর সমালোচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খান মোহাম্মদ লুন্দখোর ছয়দফার বিরুদ্ধে সমলোচনামুখর ছিলেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল ছয়দফা কর্মসূচির সমালোচনা ও বিরোধিতা করে। এর মধ্যে ছিল : কাউন্সিল মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ (কনভেনশন), মজলিস উলেমা-ই-পাকিস্তান, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়ত-উল-উলেমা-এ-পাকিস্তান, করাচী নাগরিক সমাজ লীগ। বিভিন্ন সময় তাদের জনসভা ও বিবৃতিতে এই সংগঠনগুলো ছয়দফা কর্মসূচির সমালোচনা করে। বিবৃতি ও জনসভায় তাদের বক্তব্য দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় ছয়দফা দাবির সমালোচনার জবাবও দেন যা বিভিন্ন সময় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়।

দেশব্যাপী গণসংযোগঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন তৈরির লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণসংযোগ শুরু করেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান তিনি। জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে এ সময় প্রায় সাড়া দেশ ভ্রমণ করেন তিনি। ছয়দফার সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন জনসভা-পথসভায় বিপুল সাড়া পাওয়া যেতে থাকে। ছয়দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির মধ্যে তিনি ব্যাপক গণজাগরণ তৈরি করতে সক্ষম হন।

তিনি গণসংযোগের সূচনা করেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক জনসভার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। একে একে সারা দেশেই ছয়দফার মর্মবাণী পৌঁছে দেন তিনি।

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত লালদীঘি ময়দানের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু ছয়দফা কর্মসূচিকে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ছয়দফা কর্মসূচি নিয়ে এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামবাসীকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সুস্পষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে ৬-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

তিনি দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভায় ছয়দফার তাৎপর্য তুলে ধরেন। দেশের জনগণকে ছয়দফা কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করা এবং ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য সারা দেশের আনাচে কানাচে ছুটে বেড়ান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের জনসভায় ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন তিনি। তিনি জোরালোভাবে আশা ব্যক্ত করেন যে, ছয়দফা দাবি আদায়ের

নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রতিটি ইউনিয়ন যদি তিনজন করে কর্মী দেয়, তাহলে তিন বছরের মধ্যে ছয় দফা দাবি আদায় হবে ইনশাআল্লাহ। এরপর ১৯৬৬ সালের ১০ মার্চ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় দরিচারানী ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা প্রকাশ করার পর মুক্তাগাছায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এটিই ছিল প্রথম সফর। ১৪ মার্চ সিলেটে রেজিস্ট্রি অফিস ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফার সমর্থনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এ সময় তিনি বলেন, জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হলে নেতাদের ঐক্যে কোন লাভ হবে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে নেতাগণ বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস পাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় ছয়দফা কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম। চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও জনসভায় ছয়দফার সমর্থনে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর অধীর আগ্রহের জন্য সভাপতি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই রিপোর্ট ২১ মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধু ছয়দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। ছয়দফার পক্ষে ব্যাপক গণজাগরণ দেখে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ভীত হয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ওপর নানা রকম ষড়যন্ত্র ও নির্যাতন চালাতে থাকে। বিভিন্ন জনসভায় এসব নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাহস যোগাতে থাকেন তিনি । ১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুলনার মিউনিসিপ্যাল পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ছয়দফা দাবি আদায়ে যে কোন প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। এই জনসভায় তিনি বলেন, ছয়দফা বঞ্চনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ, এটি আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্যারান্টি, ছয়দফা সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই ম্যাগনাকার্টা বা বড় সনদ। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সফরকালীন সর্বশেষ জনসভা ছিল এটি। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় ছয়দফার দফাওয়ারি বিশ্লেষণ করেন।

ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন তৈরির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার মূল বক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে রেখেই এই জনসভার কাজ শুরু করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে সেদিন ময়মনসিংহ কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম জনসভা যে

জনসভায় সভাপতির আসন শূন্য রেখে সভা করতে হয়েছিল। সভায় বক্তারা ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন এবং শাসনকর্তৃপক্ষকে ছয়দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করে এ দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

১৯৬৬ সালের ৬ মে ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিলেট পৌঁছলে বিপুল জনতা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং ছয়দফা জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় তিনি জনতার উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জনসাধারণকে ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

পরদিন ৮ মে নারায়ণগঞ্জে জনসভা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নারায়ণগঞ্জ থেকে জনসভা করে ঢাকায় ফেরার পর ১৯৬৬ সালের ৮মে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন তিনি। এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুক্তি পান তিনি।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও হয়রানি:

ছয়দফা আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়।

ইত্তেফাক পত্রিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুকে একের পর এক বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে নাজেহাল করা শুরু হয়। দিনের পর দিন এসব মামলা চলতে থাকে। নতুন নতুন মামলায় জড়ানো হয় তাঁকে। বারবার গ্রেফতার করা হয়। আবার জামিনও লাভ করেন তিনি। গ্রেফতার করে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। হয়রানি করার জন্য জামিন দেয়া নিয়েও নানা নাটকীয় ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেফতার ও হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে সারা দেশ। ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার এবং হয়রানির প্রতিবাদে চট্টগ্রাম শহরে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে অহেতুক হয়রানি করায় পথসভায় বক্তারা সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা জানান। পরদিন ১৯৬৬ সালের ২৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ ও পথসভা হয়। আগের দিনের মতো এদিনও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ঢাকার পথসভাগুলোতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানি বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১০ মে সারা প্রদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়ে যুক্তভাবে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবি করে বলা হয়,

ছয়দফা আওয়ামী লীগের একার কোন সংগ্রাম নয়, এটা সমগ্র পাকিস্তানবাসীর বাঁচা মরার সংগ্রাম। হয়রানির প্রতিবাদ হয় পশ্চিম পাকিস্তানেও।

ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের ১৩ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর পল্টন ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও তাঁর মুক্তির দাবিতে হরতালও পালিত হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন হরতাল সফল করার জন্য আগের দিন ৬ জুন গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তৎপর থাকে। মশাল মিছিল, শোভাযাত্রা, পোস্টারিং করে। অপর দিকে সরকারের পক্ষ থেকে মাইকযোগে এবং প্রচারপত্র বিলি করে হরতাল পালন না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। লরিতে করে সশস্ত্র পুলিশ ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে টহল দেয়। হরতালের প্রচার কাজে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারও করা হয়। ৭ জুনের হরতালে ব্যাপক গোলযোগ হয়। হতাহতের ঘটনায় দশ ব্যক্তি নিহত হন।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেও ছয়দফার আন্দোলন অব্যাহত:

বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকলেও ছয়দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। সেই সময়ের খবরের কাগজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ছয়দফার সমর্থনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেও সারাদেশে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের বিভিন্ন শাখা জনসভার আয়োজন করে। এসব জনসভায় ছয়দফার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয় এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। জনসাধারণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সাড়া দিতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয়দফা কর্মসূচি জনসমক্ষে নিয়ে আসার বিষয়টিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে সারা দেশের নানা স্থানে ১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছয়দফা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও ওইদিন ছয়দফা দিবস পালিত হয়। ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এ সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়। তবে এ সময় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ ছিল।

বন্ধ হয়ে গেলো দৈনিক ইত্তেফাক

১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ গুরুত্বের সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিফলিত হতো। ঘটনার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যেতো

ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা থেকে শুরু করে ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন, নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, ছয়দফা দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামকে জোরালো সমর্থন জানায় দৈনিক ইত্তেফাক। ছয়দফর ইতিবাচক ব্যাখ্যা ও খবর প্রচার করে দৈনিক ইত্তেফাক ছয়দফার মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের জনপ্রিয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চ'। 'মোসাফির' ছদ্মনামে কলামটি লিখতেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। ছয়দফা কর্মসূচির সপক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়ার কারণে স্বৈরাচারি আইয়ুব সরকারের রোষানলে পড়তে হয় দৈনিক ইত্তেফাককে। ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয় আইয়ুব সরকার। শুধু তাই না, মানিক মিয়াকেও কারাবন্দী হতে হয়। আইয়ুব সরকার দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে রাখে। ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক। প্রকাশনা শুরু করেই দৈনিক ইত্তেফাক আবারও ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে সমর্থন যোগাতে থাকে। তাই বলা যায়, ছয়দফা আন্দোলন ও পরবর্তী স্বাধীনতা অভিমুখী আন্দোলনে দৈনিক ইত্তেফাক পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হয়ে উঠেছিল।

উপসংহার:

'দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি : ছয়দফা আন্দোলন' শীর্ষক গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। উদ্দেশ্যগুলো হলো: এক. ছয়দফা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা। দুই. ছয়দফা আন্দোলনের খবর উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করা। তিন. ছয়দফা আন্দোলনের সময় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি-পত্র বিশ্লেষণ করা।

তিনটি গবেষণা প্রশ্নকে সামনে রেখে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়। গবেষণার প্রশ্নগুলো হলো: এক. সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে কি? দুই. রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয় কি? তিন. কোন রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সে বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠি প্রকাশিত হয় কি?

এই গবেষণাকর্মটি পদ্ধতিগত দিক থেকে একটি গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে এই গবেষণায় ছয়দফা আন্দোলন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয়কেই ব্যবহার করা হয়েছে। (বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রধানত বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বেশিরভাগ প্রতিবেদনেই বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কখনও সরাসরি বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি না থাকলেও পরোক্ষভাবে ঘটনার পেছনে ছিলেন তিনি।

এই গবেষণাকর্মে দেখা গেছে, ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা থেকে ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রায় সব রিপোর্টই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছু রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক রিপোর্ট লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন তারিখে এমনও দেখা গিয়েছে যে ঘটনা ঘটার এক সপ্তাহ পরেও খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।

■■■